

Volume-III, Issue-I, July 2021

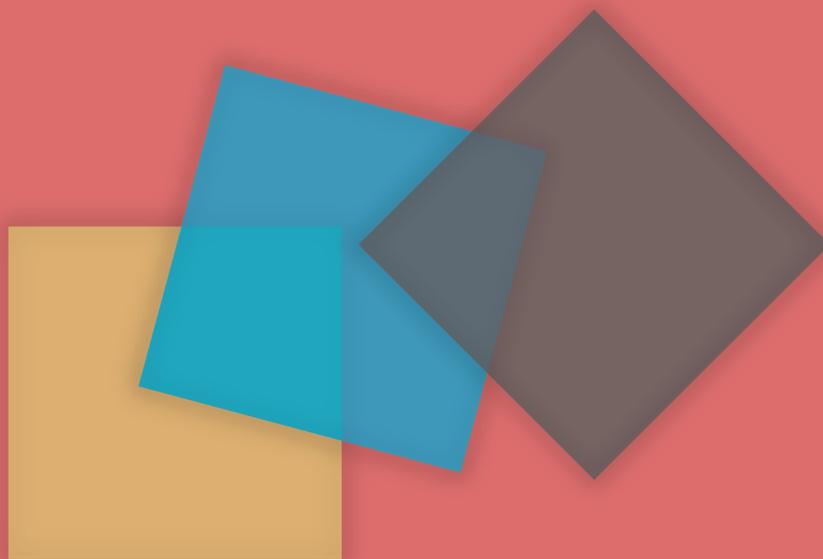


ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)



BL College Journal

A Peer Reviewed Journal



Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh

ISSN

ISSN 2664-228X (Print)

ISSN 2710-3684 (Online)

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Volume -III, Issue-I, July 2021



Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh



BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal

Half Yearly Publication of Government Brajalal College

Editor

Professor Sharif Atiquzzaman Principal-in-charge, Government Brajalal College

Review Committee

- Professor Dr. Khandakar Hamidul Islam** Head, Department of Islamic History & Culture
Professor Dr. Khandakar Ahsanul Kabir Head, Department of Physics
Dr. Md. Mizanur Rahman Head, Associate Professor, Department of Social Work
Dr. Hosne Ara Associate Professor, Department of Zoology
Shankar Kumar Mallick Associate Professor, Department of Bangla
Roxana Khanam Associate Professor, Department of English
Dr. Emanul Haque Associate Professor, Department of Bangla
Goenka College of Commerce & Business
Administration, Kolkata, India
Amal Kumar Gain Assistant Professor, Department of History
Rami Chakraborty Assistant Professor, Department of Bangla
Assam University, India
Dr. Md. Sarwar Hossain Lecturer, Department of Mathematics



Mailing Address

Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna-9200, Bangladesh

Phone : 0088-041-762944, 0088-041-2852708 email : infoblcollege@gmail.com

Website : www.blcollege.edu.bd

Printed by

Rabi Printing Press

27, Samsur Rahman Road, Khulna-9100, Bangladesh

© Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh

ISSN : 2664-228X (Print)

ISSN 2710-3684 (Online)



Contents

বাংলা অংশ

- ◆ মায়ের কাছে লেখা একাত্তরের চিঠি : পাঠ ও বিশ্লেষণ
শংকর কুমার মল্লিক ০৭-২৭
- ◆ *বিষাদবৃক্ষ* : ফিরে দেখার বিষাদগাথা
রামী চক্রবর্তী ২৮-৩৭
- ◆ দেশভাগের কবিতা : দাঙ্গা ও সম্প্রীতি প্রসঙ্গ
বিভূতিভূষণ মঞ্জল ৩৮-৪৯
- ◆ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত নারী নাট্যকার রচিত নাটক : বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিশ্লেষণ
সুস্মিতা বণিক ৫০-৬০
- ◆ দলিত সাহিত্য ও দলিতের সামাজিক অবস্থান ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত
রাজা তালুকদার ৬১-৬৭
- ◆ প্রফুল্লরঞ্জনের শাক্তপদাবলি : সাধনতন্ত্র, ইতিহাস ও বিশ্ববোধ
সুরঞ্জন রায় ৬৮-৮২
- ◆ বিপণনের বিশ্বে মুখ থেকে যায় বিজ্ঞাপনে : প্রসঙ্গ অমর মিত্রের ক'টি গল্প
শ্রাবন্তী মজুমদার ৮৩-৯৩
- ◆ জীবনানন্দের গল্প : অস্তিত্ববাদী চেতনা ও নাগরিক জীবনের সংকট
শরীফ আতিক-উজ-জামান ৯৪-১০২

English Section

- ◆ Studies on Ecological Aspects and Polluting Effects on Biodiversity with Special Reference to Shellfish and Finfish Fauna in Wetlands of Southwestern Bangladesh
Dr. Bidhan Chandra Biswas, Neetish Chandra Shil & Dr. Ashis Kumar Panigrahi 105-118
- ◆ Lurie's Transformation in *Disgrace* : Conversion of a Predator into a Philosopher
Bam Dev Adhikari (Ph.D.) 119-134
- ◆ Teachers' and Learners' Perception of Feedback Strategies in Classroom Teaching
Mahadi Hasan Bappy 135-147
- ◆ Searching the "I" through the Female Characters in selected Novels (Translated) of Sangeeta Bandyopadhyay
Rupsa Mukherjee Banerjee 148-158
- ◆ The Changing Pattern of Social Relationship for COVID-19 in India and Bangladesh
Dr. K. M. Rezaul Karim & Dr. Samita Manna 159-172
- ◆ Water-Logging in *Bhabadaha* : A Search for the Cause of Its Persistence
Sankar Biswas 173-185
- ◆ Impact of COVID-19 Pandemic on Adolescent Mental Health : A Brief Review
Dr. Mrinal Mukherjee 186-195
- ◆ Sustainable Development Goals and Socially Excluded Groups : End of Poverty and Inequalities in Marginalised People
Dr. Dilip Kumar Bhuyan 196-212

ISSN : 2664-228X (Print)

ISSN 2710-3684 (Online)

Volume -III Issue-I

July 2021

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal
Half Yearly Publication of Government Brajalal College
July 2021

Published by
Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh



Disclaimer

The opinions expressed in the articles published in this journal are the opinions of the authors. The members of the review committee, the editor or the publisher of the *BL College Journal* are in no way responsible for the opinions expressed by the authors or the conclusions deduced by them.



BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

বাংলা অংশ

Contents



Government
Brajlal College
Khulna
Bangladesh

BL College Journal

ISSN

ISSN : 2664-228X (Print)

ISSN 2710-3684 (Online)

Volume -III Issue-I

July 2021

- ◆ মায়ের কাছে লেখা একাত্তরের চিঠি : পাঠ ও বিশ্লেষণ
শংকর কুমার মল্লিক ০৭-২৭
- ◆ বিষাদবৃক্ষ : ফিরে দেখার বিষাদগাথা
রামী চক্রবর্তী ২৮-৩৭
- ◆ দেশভাগের কবিতা : দাসা ও সম্প্রীতি প্রসঙ্গ
বিভূতিভূষণ মঞ্জল ৩৮-৪৯
- ◆ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত নারী নাট্যকার রচিত নাটক :
বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিশ্লেষণ
সুস্মিতা বণিক ৫০-৬০
- ◆ দলিত সাহিত্য ও দলিতের সামাজিক অবস্থান ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত
রাজা তালুকদার ৬১-৬৭
- ◆ প্রযুক্তিরঞ্জনের শাক্তপদাবলি : সাধনতত্ত্ব, ইতিহাস ও বিশ্ববোধ
সুরঞ্জন রায় ৬৮-৮২
- ◆ বিপণনের বিশ্বে মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে : প্রসঙ্গ
অমর মিত্রের ক'টি গল্প
শ্রাবন্তী মজুমদার ৮৩-৯৩
- ◆ জীবনানন্দের গল্প : অস্তিত্ববাদী চেতনা ও নাগরিক জীবনের সংকট
শরীফ আতিক-উজ-জামান ৯৪-১০২



Volume -III, Issue-I, July 2021

মায়ের কাছে লেখা একাত্তরের চিঠি : পাঠ ও বিশ্লেষণ

শংকর কুমার মল্লিক

সারসংক্ষেপ

শংকর কুমার মল্লিক

সহযোগী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

সরকারি ব্রজলাল কলেজ

খুলনা, বাংলাদেশ

e-mail : mallickhluna@gmail.com

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। শুধুমাত্র দেশের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসার জন্যে সেদিন ন্যূনতম যুদ্ধবিদ্যা না জানা সাধারণ মানুষ যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কেউ গিয়েছিলেন পরিবার পরিজন ছেড়ে, কেউ গিয়েছিলেন তার কর্মস্থল থেকেই। অনেকে গিয়েছিলেন পরিবারের কাউকে না জানিয়ে। তাঁরা জানতেন না এ যুদ্ধের শেষ কোথায়, কী তার পরিণতি। কিন্তু শুধুমাত্র হানাদার মুক্ত করে দেশ স্বাধীন করাই ছিল তাঁদের সেদিনের একমাত্র স্বপ্ন। একাত্তরে রণাঙ্গন থেকে অনেক মুক্তিযোদ্ধা তাদের পরিবার-পরিজন অর্থাৎ মা, বাবা, স্ত্রী, ভাই, বোন বন্ধুসহ নানাজনের কাছে বিভিন্ন সময়ে চিঠি লিখেছিলেন। যুদ্ধকালে রণাঙ্গন থেকে প্রেরিত সে সব চিঠি নানারকম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পেয়েছিলেন প্রাপকরা। এসব চিঠিতে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের কথা, তাঁদের নানা সংকটের কথা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বীভৎস নির্মম অত্যাচার-নির্যাতনের চিত্র, মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো কোনো যুদ্ধ বা অপারেশনে সাফল্য বা ব্যর্থতার কথা, যুদ্ধরত অবস্থায় সহযোদ্ধার আহত বা শহিদ হওয়ার বেদনার্ত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। আবার অনেক চিঠিতে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত এবং হত্যা করার গৌরবের কথাও রয়েছে। দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে প্রায় সকল চিঠিতে। একাত্তরের রণাঙ্গন থেকে লেখা মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠির একটি সংকলন 'একাত্তরের চিঠি' প্রথম প্রকাশিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ৩৮ বছর পরে ২০০৯ সালে। সেই গ্রন্থের মধ্যে মাত্র ৮৪টি চিঠি রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চিঠি (২৩টি) লিখেছেন মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের মায়ের কাছে। দেশমাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে যুদ্ধে যাওয়া সন্তানরা রণাঙ্গনে যুদ্ধকালে তাঁদের মায়ের কথা বেশি মনে পড়েছে। মনের মুকুরে ভেসে উঠেছে মায়ের মুখচ্ছবি। মায়ের কাছে লেখা সেই ২৩টি চিঠিকে অবলম্বন করে লেখা হয়েছে এই গবেষণা নিবন্ধটি। রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের জন্মদাত্রী মা এবং দেশমাতৃকার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা কিভাবে উঠে এসেছে চিঠিগুলিতে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মূলশব্দ

মুক্তিযুদ্ধ, মা, দেশমাতৃকা, মুক্তিযোদ্ধা, চিঠি, শহিদ, স্বাধীনতা

গবেষণার উদ্দেশ্য

রণাঙ্গন থেকে লেখা মুক্তিযোদ্ধাদের এ চিঠিগুলি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক দলিল। মায়ের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে আবেগের কথা আছে, স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে শত্রু মুক্ত করে মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার সুতীত্র ব্যাকুলতা আছে। তার পাশাপাশি রয়েছে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির কথা। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে যার ধারা এখনো চলমান। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানামাত্রিক গবেষণা হচ্ছে। কিন্তু এ চিঠিগুলি তাঁরাই লিখেছেন যাঁরা তখন রণাঙ্গনে থেকে যুদ্ধ করেছেন। ফলে দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার মরণপণ লড়াইয়ের সময় তাঁদের জন্মদাত্রী মায়ের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে প্রবল আবেগ, দেশমাতা এবং জন্মদাত্রীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভালবাসা, সেই প্রতিকূল অবস্থায় যুদ্ধের চিত্র, কঠিন মনোবল, দুর্জয় সাহস কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করাই এ গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য।

পদ্ধতি

গবেষণাটিতে বিশ্লেষণাত্মক ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

‘একাত্তরের চিঠি’ সংকলন গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে। প্রকাশের পরপরই গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নানা শ্রেণির মানুষের কাছে দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। ৮৪টি চিঠির এ সংকলন প্রকাশের পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনান্নাত মানুষের কাছে অমর দলিল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তবে গ্রন্থভুক্ত চিঠিগুলি বহুল পঠিত হলেও তা নিয়ে তেমন লেখালেখি বা

প্রকাশনা চোখে পড়ে না। দু’একটি পাঠ-প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় অন্তর্জালে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

বিশ্লেষণ

‘জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরীয়সী’ বহুশ্রুত প্রবাদস্বরূপ সংস্কৃত ভাষার এই শ্লোকাংশটির সরল অর্থ-জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। স্বর্গের সুখশ্চৈর্যের চেয়ে মা ও জন্মভূমির মাটি অনেক বেশি মূল্যবান এবং পবিত্র। তাই কবি গেয়েছেন- ‘ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।’ মায়ের কোল আর দেশের মাটি প্রত্যেক মানুষের কাছে সবচেয়ে আনন্দের ও পরম শান্তির স্থান। তাই জন্মদাত্রী জননী এবং জন্মভূমি আমাদের কাছে হয়ে ওঠে সমার্থক। কবি তখন সবিনয়ে স্কৃতজ্ঞচিত্তে উচ্চারণ করেন-

‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে

সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে।’^২

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে ভালোবেসে দেশের সূর্য সন্তানরা শৃঙ্খলিত নিপীড়িত নির্যাতিত স্বদেশকে মুক্ত করার জন্যে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ‘একাত্তরের চিঠি’ গ্রন্থে সংকলিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের লেখা ৮৪টি চিঠির মধ্যে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে বসে সেই অগ্নিগর্ভ সময়ে তাঁরা এসব চিঠি তাঁদের আত্মীয়, বন্ধু পরিচিত ও প্রিয়জনের কাছে লিখেছিলেন। গ্রন্থাবদ্ধ চিঠিগুলির মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা সবচেয়ে বেশি (২৩টি) চিঠি লিখেছিলেন তাঁদের পরমপ্রিয় মায়ের কাছে। সহৃদয় পাঠক গভীর অভিনিবেশ ও আন্তরিকতার সাথে পাঠ করলে দেখতে পাবেন এই চিঠিগুলির মধ্যে তথ্যের চেয়ে আবেগ বেশি। জন্মদাত্রী মা আর দেশমাতৃকা

একই রূপে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের কাছে। কখনও কখনও জন্মদাত্রী মাকে অতিক্রম করে দেশমাতা তাঁদের কাছে হয়েছে মহোত্তম। জীবন-মৃত্যুর সমকূলে বসে মায়ের কাছে লেখা প্রতিটি চিঠির রক্তাক্ত অক্ষরে তারই স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

‘একাত্তরের চিঠি’ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত চিঠিগুলির মধ্যে প্রথমটি শহিদ কাজী নুরুল্লাহী বাবুল এর লেখা। চিঠিতে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী গ্রন্থভুক্ত চিঠিগুলিকে সাজানো হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কাজী নুরুল্লাহী তাঁর মায়ের কাছে চিঠিটি লিখেছিলেন ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ। ২৫ মার্চে পাকিস্তানি বাহিনী মধ্যরাতে ঢাকায় ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ নামে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য, বর্বরোচিত ও ন্যাক্কারজনক গণহত্যা শুরু করে। হাজার হাজার ঘুমন্ত অসহায় নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, সর্বস্তরের মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ২৬ মার্চ, ১৯৭১-এ স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্যদিয়ে এদেশের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসময় যে যেখান থেকে পেরেছে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে ভূমিকা পালন করেছে। ফলে বিভিন্ন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার কারণে একে অন্যের খোঁজ রাখার চেষ্টা করেছে। প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় দিন কাটিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কাজী নুরুল্লাহীর চিঠির প্রথমদিকে তারই উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে তিনি লিখেছেন—

“যেভাবে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, সেখানে আমাদের বেঁচে থাকাটাই লজ্জার। আপনাদের দোয়ার জোরে হয়তো মরবো না। কিন্তু মরলে গৌরবের মতু্যই হতো। ঘরে শুয়ে মরার মানে কি? এবার জিতলে যেমন করে হোক একবার নওগাঁ যেতাম। কিন্তু জিততেই পারলাম না। হেরে বাড়ি যাওয়া তো পালিয়ে যাওয়া। পালাতে বড্ড অপমান বোধ হয়।”^৩

মুক্তিযোদ্ধা কাজী নুরুল্লাহী ১৯৭১ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের শেষবর্ষের ছাত্র এবং কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি রাজশাহী অঞ্চলের মুজিব বাহিনীর প্রধান ছিলেন। দেশমাতৃকার প্রতি অগাধ ভালোবাসার কারণে যুদ্ধের প্রারম্ভিককালেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১লা অক্টোবর ১৯৭১ সালে কাজী নুরুল্লাহীকে পাকিস্তানি বাহিনী আটক করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ জোহা হলে নিয়ে হত্যা করে।^৪ নুরুল্লাহী মাকে লিখেছিলেন, ‘মরলে গৌরবের মতু্যই হতো’। কাজী নুরুল্লাহী শহিদ হয়েছিলেন। যুদ্ধের প্রাঙ্গণে একজন মুক্তিযোদ্ধার মতু্য সত্যিই গৌরবের।

স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই বাংলার দামাল ছেলেরা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ১৯৭১ এর মার্চের গোড়া থেকেই এদেশের মানুষ প্রস্তুত হচ্ছিল এবং ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে তারা সকল দিকনির্দেশনা পেয়ে যায়। ফলে ২৫ মার্চের গণহত্যার প্রেক্ষিতে মানুষের মনে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। তখন থেকেই তাঁরা নিজের পরিবারের, স্বজনের কথা উপেক্ষা করে দেশের মাটির প্রতি গভীর টানে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধা এ বি এম মাহাবুবুর রহমান তাই লিখেছেন—

“মাগো, তুমি যখন এ পত্র পাবে, আমি তখন তোমার থেকে অনেক অনেক দূরে থাকবো। মা, জানি তুমি আমাকে যেতে দিবে না, তাই তোমাকে না বলে চলে যাচ্ছি। তবে যেদিন মা-বোনের ইজ্জতের প্রতিশোধ এবং এই মাতৃভূমি সোনার বাংলাকে শত্রুমুক্ত করতে পারবো, সেদিন তোমার ছেলে তোমার কোলে ফিরে আসবে। দোয়া করবে মা, আমার আশা যেন পূর্ণ হয়।”^৫

মুক্তিযোদ্ধা নৌকমাভো জিন্নাত আলী খান তাঁর মাকে চিঠি লিখেছিলেন ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শুরুর দিকে এই চিঠি তিনি তাঁর মায়ের কাছে লিখেছিলেন। চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায় আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কতটা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মা আর মাতৃভূমি যে সমার্থক তা জিন্নাত আলীর চিঠিতে উল্লেখ আছে। আর সেই মাতৃভূমির জন্য অকুণ্ঠিতভাবে দ্বিধাহীন চিন্তে জীবন উৎসর্গ করার প্রদীপ্ত উচ্চারণ আমরা চিঠির মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদ বধ কাব্যে’ দেখি প্রিয়তম সন্তান বীরবাহু দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলে মহাশোকে শোকাকুল হয়ে রাবণ বলেছিলেন-

“যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছো, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?”^৬

রাবণের এ দৃঢ় উচ্চারণ বীর মুক্তিযোদ্ধা জিন্নাত আলী খানের চিঠিতেও উচ্চারিত হতে দেখি-

“বাংলা মাকে বাঁচাতে যে ভূমিতে আপনি আমাকে
জন্ম দিয়েছেন, যে ভাষায় কথা শিখিয়েছেন, সেই
ভাষাকে, সেই জন্মভূমিকে রক্ষা করতে হলে আমার
মতো অনেক জিন্নার প্রাণ দিতে হবে। দুঃখ করবেন
না, মা। আপনার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে যদি
আপনার এই নগণ্য ছেলের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত
হয়, সে রক্ত ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্য দেবে যে
বাঙালি এখনো মাতৃভূমি রক্ষা করতে নিজের জীবন
পর্যন্ত বুলেটের সামনে পেতে দিতে দ্বিধা বোধ করে
না। ...মা, যদি সত্যি আমরা এই পবিত্র জন্মভূমি
থেকে ইংরেজ বেনিয়াদের মতো পাঞ্জাবি গুণ্ডাদের
তাড়িয়ে দিয়ে এ দেশকে মুক্ত করতে পারি, তবে
হয়তো আবার আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে।

বিদায় নিচ্ছি মা। ক্ষুদিরামের মতো বিদায় দাও।
যাবার বেলায় ছালাম। মা ... মা... মা... যাচ্ছি।”^৭

চিঠির একবারে শেষে মায়ের কাছ থেকে তিনি
এমনভাবে বিদায় নিচ্ছেন যা আমাদের প্রত্যেকের
হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। মা যেন তাঁর
সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন আর ‘মা... মা... মা...
যাচ্ছি’, বলে মুক্তিযোদ্ধা জিন্না চিরদিনের জন্যে বিদায়
নিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত তিনি গৌরবের
মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করেছিলেন।

আমরা পূর্বেই বলেছি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে
অনেকেই বাড়িতে না বলে, মা-বাবা কাউকেই না
জানিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে চিঠি
লিখে তাঁরা যুদ্ধে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।
মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল্লাহ হিল বাকী তাঁদেরই মতো
একজন। তাঁর মায়ের কাছে লেখা চিঠিতে তারই
প্রমাণ পাওয়া যায়-

“মা, আপনি এবং বাসার সবাইকে সালাম জানিয়ে
বলছি, দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে আমি ঘরে বসে
থাকতে পারি না। তাই ঢাকার আরও ২০টা যুবকের
সাথে আমিও পথ ধরেছি ওপার বাংলায়। মা, তুমি
কেঁদো না, দেশের জন্য এটা খুব ন্যূনতম চেষ্টা।
মা, তুমি এদেশ স্বাধীনের জন্য দোয়া করো। চিন্তা
করো না, আমি ইনশাআল্লাহ বেঁচে আসবো। আমি
৭ দিনের মধ্যেই ফিরে আসতে পারি কি বেশিও
লাগতে পারে। তোমার চরণ মা, করিব স্মরণ।”^৮

মায়ের কাছে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেও
মুক্তিযোদ্ধা বাকী আর ফিরতে পারেন নি। যুদ্ধে তিনি
শহিদ হয়েছিলেন। বাকীর মতো অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা
তাঁদের মায়ের কোলে ফেরার কথা বলে ঘুমিয়ে
আছেন দেশমাতৃকার কোলে।

প্রতিশোধের আশুনে পুড়ে পুড়ে খাঁটি সোনার মতো
তৈরি হয়েছিল আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা। মৃত্যু তাঁদের

কাছে তখন তুচ্ছতম বিষয়। পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে এ আশায় অঙ্গীকারাবদ্ধ মোঃ খোরশেদ আলম। চিঠির একেবারে শেষে লিখেছেন ‘যদি জয়ের গৌরব নিয়ে না ফিরতে পারি তাহলে বিদায়’-অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধারা সুনিশ্চিত জয়ের আশা নিয়েই যুদ্ধ করেছিলেন। খোরশেদ আলম লিখেছেন—

“তোমার ছেলে আজ তোমার সন্তানদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে চলেছে। বর্বর পাকিস্তানি জঙ্গীগোষ্ঠী আজ তোমার সন্তানদের ওপর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানে তোমার সন্তানদের ইজ্জতের উপর আঘাত করেছে সেখানে তো আর তোমার সন্তানরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই আজ তোমার হাজার হাজার বীর সন্তান বাঁচার দাবী নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ‘তোমার নগণ্য ছেলে তাদের মধ্যে একজন।’ পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে দু’হাত তুলে দোয়া করি তোমার সন্তানরা যেন বর্বর পাকিস্তানি জঙ্গীগোষ্ঠীকে কতল করে এদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। ‘এদেশের নাম হবে বাংলাদেশ’, সোনার বাংলাদেশ। এদেশের জন্য তোমার কত বীর সন্তান শহীদ হয়ে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ইনশাআল্লাহ শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। দেশকে স্বাধীন করে ছাড়বোই। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। দোয়া কর যেন জয়ের গৌরব নিয়ে ফিরে আসতে পারি, নচেৎ-বিদায়।”^৯

শহিদ মুক্তিযোদ্ধা বাকীর মতো মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুকও বাড়িতে কাউকে না বলে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপর মাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশে ফিরে এসে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন। তিনি চিঠিতে লিখেছেন—

“আমি বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আসিয়াছি। আশাকরি বাংলায় স্বাধীনতা আসিলেই আমি আপনাদের কোলে ফিরিয়া আসিবো।”^{১০}

মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক মার কাছে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেও আর কোনোদিন ফিরতে পারেন নি। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে গাইবান্ধার নান্দিনায় সংঘটিত যুদ্ধে তিনি শহিদ হন।

আমাদের দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ইতিহাস স্বীকৃত। ‘৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ‘৫৮-এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ‘৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ‘৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, ‘৬৯-এর অবিস্মরণীয় গণঅভ্যুত্থান- প্রত্যেকটি আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রসমাজ নেতৃত্ব দিয়েছে সম্মুখ সারিতে থেকে। কোনো কোনো আন্দোলন তারাই সৃষ্টি করে সফল সমাপ্তি ঘটিয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধেও ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল অপরাপর শ্রেণি-পেশার মানুষের মতো গৌরবদীপ্ত। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্ররা মাতৃভূমিকে রক্ষায় সেদিন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মৃত্যুকে দুহাতে তালুবন্দী করে। সেই প্রাণময় তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বিপ্লব। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিপ্লব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। চিঠির ভিতরে তার উল্লেখ আছে। অনেক পরিবারে বাবা-মা-ভাই-বোন-স্ত্রী-পুত্র পরিজন তাদের স্বজনদের যুদ্ধে যাওয়ার পথে বাধ সেধেছিলেন অনিশ্চিত জীবনের কথা ভেবে, মৃত্যুর কথা ভেবে। আবার এর বিপরীত ঘটনাও ঘটেছিল। মা তাঁর পুত্রকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন দেশ স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। মুক্তিযোদ্ধা বিপ্লবের চিঠিতে তারই উল্লেখ পাওয়া যায়—

“মাগো, আজ মনে পড়ছে বিদায় বেলায় তোমার হাসি মুখ। সাদা ধবধবে শাড়িটায় বেশ মানিয়েছিল তোমায়। বর্ষার সকাল। আকাশে খণ্ড

খণ্ড সাদা মেঘের ভেলা ভাসছিল। মেঘের ফাঁকে সেদিনকার পূর্ব দিগন্তের সূর্যটা বেশ লাল মনে হয়েছিল। সেদিন কি মনে হয়েছিল জানো মা, অসংখ্য রক্তবীজের লাল উত্তপ্ত রক্তে ছেয়ে গেছে সূর্যটা। ওর এক একটা কিরণছটা পৃথিবীতে জন্ম দিয়েছে এক একটি বাঙালি। অগ্নিশপথে বলীয়ান, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত। মাগো, তোমার কোলে জন্মে আমি গর্বিত। শহীদের রক্ত রাঙ্গা পথে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছেলেকে তুমি এগিয়ে দিয়েছো। ক্ষণিকের জন্যেও তোমার বুক কাঁপেনি, স্নেহের বন্ধন দেশমাতৃকার ডাককে উপেক্ষা করতে পারেনি। বরং তুমিই আমাকে মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের জন্য প্রেরণা দিয়েছো। দেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছো। মা, তুমি শুনে খুশি হবে তোমারাই মত অসংখ্য জননী তাঁদের স্নেহ ও ভালোবাসার সম্পদ পুত্র-সন্তান, স্বামী, আত্মীয়, ঘরবাড়ি সর্বস্ব হারিয়ে শোকে মুহাম্মান হয়নি; বরং ইস্পাতকঠিন মনোবল নিয়ে আজ অগ্নিশপথে বলীয়ান। মাগো, বাংলার প্রতিটি জননী কি তাঁদের ছেলেকে দেশের তরে দান করতে পারে না? পারে না এদেশের মা-বোনেরা ছেলে ও ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াতে? মা, তুমিতো একদিন বলেছিলে, ‘সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন এদেশের মায়ের কোলে শিশুরা মা-বাবার কাছে বিস্কুট-চকলেট চাইবেনা জেনো, চাইবে রিভলবার পিস্তল।’^{১১}

মুক্তিযোদ্ধা বিপ্লবের মা যেমন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন তেমনি জাহানারা ইমাম^{১২} তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলে রুমীকেও^{১৩} যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। রুমী যুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্পকিছুদিন পর থেকেই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাঁর মাকে বলে আসছিল। কিন্তু তাঁর মা তাঁকে অনুমতি দিচ্ছিলেন না। অথচ জাহানারা ইমাম নিজেই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ঢাকা শহরে থেকে নিজে, তাঁর স্বামী শরীফ সাহেব সবাই মিলে যুদ্ধের পক্ষে কাজ

করেছেন। নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিয়ত সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। রুমীর বন্ধুরা ততদিনে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের আগরতলায় চলে গেছে। রুমী তখনও ঢাকায় রয়ে গেছে। প্রতিদিন মায়ের কাছে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু জাহানারা ইমাম ছেলেকে পরীক্ষা করেছেন যে, রুমী বন্ধুদের সাথে হুজুগে অথবা আবেগের বশে যুদ্ধে যেতে চাইছে নাকি সত্যিই দুঃখ-কষ্ট বেদনা সহ্য করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে চাইছে। কিন্তু দেখা গেল সত্যিই রুমী দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে মা-ছেলের কথোপোকথন ছিল এরকম—

“রুমী বলল, ‘তোমার জন্মদিনে একটি সুখবর দিই আম্মা।’ সে একটু খামল, আমি আগ্রহে তাকিয়ে রইলাম, ‘আমার যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে। ঠিকমত যোগাযোগ হয়েছে। তুমি যদি প্রথম দিকে অত বাধা না দিতে, তাহলে একমাস আগে চলে যেতে পারতাম।’

আমি বললাম, ‘তুই আমার ওপর রাগ করিস নে। আমি দেখতে চেয়েছিলাম, তুই হুজুগে পড়ে যেতে চাচ্ছিস, না, সত্যি সত্যি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যেতে চাচ্ছিস।’

‘হুজুগে পড়ে?’ রুমীর ভুরু কুঁচকে গেল, ‘বাঁচা-মরার লড়াই, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে যেতে চাওয়া হুজুগ?’

‘না, না, তা বলি নি। ভুল বুঝিস নে। বন্ধুরা সবাই যাচ্ছে বলেই যেতে চাচ্ছিস কি না, যুদ্ধক্ষেত্রের কষ্ট ও ভয়াবহ অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পেরেছিস কি না সেসব যাচাই করবার জন্যই তোকে নানাভাবে বাধা দিচ্ছিলাম। তুই-ই তো বলেছিস, তোর কোন কোন বন্ধু যুদ্ধের কষ্ট সহ্যেতে না পেরে পালিয়ে এসেছে।’

‘তা এসেছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম।
কোটিতে দু’জনার বেশি হবে না।’

‘কবে যাবি ? কাদের সঙ্গে ?’

‘তিন-চারদিনের মধ্যেই। কাদের সঙ্গে-নাম জানতে
চেও না, বলা নিষেধ।’

লোহার সাঁড়াশি দিয়ে কেউ যেন পাঁজরের সবগুলো
হাড় ছেপে ধরেছে। নিশ্চিদ্ৰ অন্ধকারে, চোখের
বাইরে, নিঃশর্তভাবে ছেড়ে দিতে হবে। জানতে
চাওয়াও চলবে না-কোন পথে যাবে, কাদের সঙ্গে
যাবে।”^{২৪}

রুমীকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মা জাহানারা ইমাম
আর নিষেধ করতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া
মেধাবী ছাত্র রুমী যথেষ্ট প্রতিভাবান। প্রগতিশীল ছাত্র
রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। প্রবল প্রতিকূল
পরিবেশে চরম কষ্ট স্বীকার করে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য
তিনি বদ্ধপরিকর। কিন্তু মায়ের মন চায় না সন্তানকে
নিঃশর্তভাবে যুদ্ধের মাঠে মৃত্যুর কাছে ঠেলে দিতে।
কিন্তু প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন। তার চিন্তা চেতনা ভাবনা
কল্পনাও স্বাধীন। একটা সময় পরে সন্তানও স্বাধীন
চিন্তা করতে শেখে। জাহানারা ইমামের কণ্ঠে সে
কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়- “রুমী এখন তার
নিজের জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তার একান্ত
নিজস্ব ভুবন, সেখানে তার জন্মদাত্রীরও প্রবেশাধিকার
নেই।”^{২৫} বিশ্বখ্যাত লেবানিজ লেখক কাহলিল
জিবরান তাঁর ‘প্রফেট’ গ্রন্থে লিখেছেন-

“তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের নয়,

... ..

তারা জীবনের সন্তানসন্ততি

জীবনের জন্যই তাদের আকৃতি।

তারা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছে

তবু তারা তোমাদের নয়।

তারা তোমাদের ভালোবাসা নিয়েছে

কিন্তু নেয় নি তোমাদের ধ্যান-ধারণা,

কেননা তারা গড়ে নিয়েছে

তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা।

তাদের শরীর তোমাদের আয়ত্তের ভেতর

কিন্তু তাদের আত্মা কখনই নয়

কেননা, তাদের আত্মা বাস করে

ভবিষ্যতের ঘরে,

যে ঘরে তোমরা কখনই পারবে না যেতে

এমনকি তোমাদের স্বপ্নেও না।

... ..

তাদেরকে চেয়ো না তোমাদের মত করতে

কারণ তাদের জীবন কখনই ফিরবে না

পেছনের পানে।”^{২৬}

জাহানারা ইমাম তাঁর পুত্র রুমীকে শুধু যুদ্ধে যাওয়ার
অনুমতিই দেননি। তাঁকে নিজের হাতে গুছিয়ে
দিয়েছেন। বাড়ি থেকে নিজেই গাড়ি চালিয়ে ছেলেকে
পৌঁছে দিয়েছেন তার পূর্ব নির্ধারিত জায়গায়।
জাহানারা ইমাম লিখেছেন-

“জামীকে পাশে বসিয়ে আমি স্টিয়ারিং হুইল
ধরলাম। ড্রাইভারকে গতকালই বলে দেওয়া
হয়েছে, আজ তাকে লাগবে না। পেছনে শরীফ
আর রুমী বসল। শরীফের হাতে খবরের কাগজ।
খুলে পড়ার ভান করছে।

রুমী বলল, ‘সেকেন্ড গেটের সামনে আমি নেমে
যাওয়া মাত্র তোমরা চলে যাবে। পেছন ফিরে
তাকাবে না।’

তাই করলাম। ইগলু আইসক্রিমের দোকানের
সামনে গাড়ি থামলাম। রুমী আধাভর্তি পাতলা
ছোট্ট এয়ারব্যাগটা কাঁধে ফেলে নেমে সামনের
দিকে হেঁটে চলে গেল। যেন একটা কলেজের ছেলে
বইখাতা নিয়ে পড়তে যাচ্ছে। আমি হুঁস করে এগিয়ে
যেতে যেতে রিয়ারভিউ -এর আয়নায় চোখ রেখে
রুমীকে একনজর দেখার চেষ্টা করলাম। দেখতে

পেলাম না, সে ফুটপাতের চলমান জনশ্রোতের মধ্যে মিশে গেছে।”^{১৭}

অসীম আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আমাদের প্রিয়তম মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন যুদ্ধে গিয়েছিলেন। অপরিসীম স্বপ্ন আঁকা ছিলো তাঁদের চোখে। আর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনীর প্রতি তীব্র ঘৃণা আর প্রতিশোধের অদম্য স্পৃহা। বিপ্লব লিখেছেন—

“যেদিন বাংলার স্বাধীনতা সূর্যে প্রতিফলিত হবে অধিকারবঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত বুভুক্ষু সাড়ে সাত কোটি জাগ্রত বাঙালির আশা, আকাঙ্ক্ষা। যে মনোবল নিয়ে প্রথম তোমা থেকে বিদায় নিয়েছিলাম তা আজ শতগুণে বেড়ে গেছে, মা। রক্তের প্রবাহে আজ খুনের নেশা টগবগিয়ে ফুটছে। এশুধু আমার নয়, প্রতিটি বাঙালি পাঞ্জাবি হানাদার লাল কুণ্ডাদের দেখলে খুনের নেশায় মাতেয়ারা হয়ে ওঠে। তাইতো বাংলার প্রতিটি আনাচে-কানাচে এক মহাশক্তি ও দুর্জয় শপথে বলীয়ান মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা অনেক বেড়ে গেছে। তোমাদের এ অবুঝ শিশুগুলি আজ হানাদার বাহিনীকে চরম আঘাত হানছে। পান করছে হানাদার পশুশক্তির রক্ত। ওরা মানুষ হত্যা করে। আমরা পশু (ওদের) হত্যা করছি। ...মা, তোমার ছোট্টছেলে বিপ্লবের হাতেই লেগে আছে বেশ কয়টা পশুর রক্ত। এমনি করে বাংলার প্রতিটি আনাচে-কানাচে মার খাচ্ছে ওরা।”^{১৮}

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-শিক্ষকসহ নানা পেশাজীবী মানুষের সশস্ত্র যুদ্ধের বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি সুসজ্জিত প্রশিক্ষিত নিয়মিত সেনাবাহিনী যুদ্ধ করেছে। অথচ একটি নিয়মিত সেনাবাহিনীর যুদ্ধনীতি তারা মানেনি মুক্তিযুদ্ধে। প্রবল হিংসার শিকার হয়েছে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে নারী-শিশু-বৃদ্ধসহ অসহায় বে-সামরিক মানুষকে তারা

নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বিপ্লবের চিঠিতে তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়—

“যুদ্ধনীতি ওদের নেই, তাই বাংলার নিরীহ অস্ত্রহীন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, বৃদ্ধ, শিশু ও নারীর ওপর হত্যাকাণ্ডের মই চালাচ্ছে। এ হত্যাকাণ্ড ভিয়েতনামের একাধিক ‘মাইলাইয়ের’ হত্যাকাণ্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে।”^{১৯}

বিপ্লবের চিঠির শেষপ্রান্তে একজন গর্ভবতী ধর্ষিতা মৃত নারীর বর্ণনা আছে। পাকিস্তানি পশুদের নির্মম পাশবিক অত্যাচারের চিহ্ন ছিলো সেই নারীর শরীরের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে। সেই বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখে বিপ্লবের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলেছে। তখন তিনি তাঁর মাকে বলেছেন, হানাদার বাহিনীর এই নির্মম অত্যাচারের কাহিনী শুনে বা জেনে কোনো মা কি তার ছেলেকে প্রতিশোধের জন্য যুদ্ধে পাঠাবে না? বিপ্লব তাঁর ছোট ভাই ও বোনকেও যুদ্ধে পাঠাবার জন্য তাঁর মায়ের কাছে অনুরোধ জানিয়ে লিখেছেন—

“মাগো, বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর এমন অত্যাচারের কাহিনী শুনে ও দেখে কি কোন জননী তার ছেলেকে প্রতিশোধের দীক্ষা না দিয়ে স্নেহের বন্ধনে নিজের কাছে আটকে রাখতে পারে? পারে না। প্রতিটি জননী আজ তার ছেলেকে দেবে মুক্তিবাহিনীতে, যাতে রক্তের প্রতিশোধ, নারী নির্যাতনের প্রতিশোধ শুধু রক্তেই নেওয়া যায়। মা, আমার ছোট্টভাই তীতু ও বোন প্রীতিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। পারবে না আমাদের তিন ভাই-বোনকে ছেড়ে একা থাকতে? মা, মাগো। দুটি পায়ে পড়ি, মা। তোমার ছেলে ও মেয়েকে দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে ঘরে আটকে রেখো না। ছেড়ে দাও স্বাধীনতার উত্তপ্ত রক্তপথে। শহীদ হবে, অমর হবে, গাজী হয়ে তোমারই কোলে ফিরে আসবে, মা। মাগো, জয়ী আমরা হবোই। দোয়া রেখো।”^{২০}

মুক্তিযোদ্ধা বিপ্লব যথার্থ বলেছেন যে, দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বাঙালিদের ওপর এরকম নির্মম নির্যাতন-অত্যাচারের কথা শুনে কোনো মা তাঁর সন্তানকে ঘরে রাখতে পারেন না। তাকে অবশ্যই যুদ্ধে পাঠানো উচিত দেশের এই সংকটকালে। জাহানারা ইমামকে দেখেছি তার বড় ছেলে গেরিলাদলের সদস্য রুমী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পর তাঁর আর কোনোদিন খোঁজ পাননি। রুমীকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি সেনারা। সে সময় জাহানারা ইমামের ছোটছেলে জামী এবং তাঁর স্বামী শরীফ সাহেবকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাদেরকে নির্মম শারীরিক নির্যাতন করে ছেড়ে দিয়েছিল। বিজয়ের মাত্র ৪/৫ দিন আগে শরীফ সাহেব হার্ট এ্যাটাকে মারা যান। এরপরও জাহানারা ইমাম তার ছোট ছেলে জামীকে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিয়েছেন দেশের জন্য, মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য। তিনি লিখেছেন—

“আমি ওদেরকে হাতে ধরে এনে ডিভানে বসলাম। আমি শাহাদতের হাত থেকে চাইনিজ স্টেনগানটা আমার হাতে তুলে নিলাম। চুল্লু মাটিতে হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসল। আমার দুই হাত টেনে তার চোখ ঢেকে আমার কোলে মাথা গুঁজল। আমি হায়দারের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘জামী পারিবারিক অসুবিধার কারণে মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারে নি। ও একেবারে পাগল হয়ে আছে। ওকে কাজে লাগাও।’”^{২১}

মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রউফ ববিন তাঁর মায়ের কাছে যে চিঠিটি লিখেছেন, সেটিকে চিঠি না বলে একটা চমৎকার কবিতা বলা যেতে পারে। সুন্দর শব্দচয়ন, প্রাকৃতিক দৃশ্যকল্পের বর্ণনা এবং রূপক-প্রতীকের ব্যবহারে চিঠিটি অনবদ্য সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে। চিঠির শুরুটা চমৎকার নাটকীয়তায় ভরা। প্রতিপর্বে আবেগ, স্মৃতি- বিশেষ

করে শৈশবের স্মৃতি, সেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধা ববিন কিভাবে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, মা তাঁকে কখন কিভাবে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিলেন তার চমৎকার বর্ণনা আছে—

“মা, মুক্তিসেনাদের ক্যাম্প থেকে লিখছি। এখন বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সমস্ত দিগন্ত মেঘলা মেঘলা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকচ্ছে। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে কিনা, তাই মনটা ভালো না। আচ্ছা মা, সারা রাত এমনি চলার পর পূর্বাকাশে যে লাল সূর্য ওঠে, তার কাঁচা আলো খুব উজ্জ্বল হয়, তাইনা? এই মুহূর্তে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। বর্ষা এলে তুমি বাইরে যেতে দিতে না, একদিন তোমার অজান্তে বাইরে আসতেই পিছলে পড়ে পায়ে চোট লাগে। তখন তুমি চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলে। ...কিন্তু আজ! আজ আমার অনেক সাহস হয়েছে, রাইফেল ধরতে শিখেছি। বাস্কারে রাতের পর রাত কাটাতে হচ্ছে তবুও ভয় পাই না। শত্রুর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে শিরায়-উপশিরায় রক্তের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। মা, সত্যিই তোমাকে বোঝাতে পারবো না। ছোটবেলার কথা মনে পড়লে কেমন জানি লাগে। কিন্তু আমার একি আশ্চর্য পরিবর্তন, কারণ আমি আমার স্বদেশ, আমার বাংলাকে ভালোবাসি। ...অথচ সেদিন তুমি তো কাঁদলে না মা! আমি রণাঙ্গনে চলে এলাম। গুলি, শেল, মর্টার নিয়ে আমার জীবন। ইয়াহিয়ার জঘন্যতম অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য দুর্জয় শপথ নিলাম। ...মাগো, সেদিনের সন্ধ্যাটাকে আমার বেশ মনে পড়ছে। আজকের মতো মেঘলা মেঘলা আকাশ সেদিন ছিল না। সমস্ত আকাশটা তারায় ভর্তি ছিল। তুমি রান্নাঘরে বসে তরকারি কুটছিলে। আমি তোমাকে বললাম— মা, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি মুখের দিকে তাকালে। আমি

বলেছিলাম, ‘মা, আমি মুক্তিবাহিনীতে চলে যাচ্ছি।’
উনুনের আলোতে তোমার মুখটা স্পষ্ট দেখতে
পেলাম। তোমার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
তুমি দাঁড়িয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তাকালে। আমার
ঘরের পেছনে বেল গাছটার কিছু পাতা বাতাসে দোল
খেয়ে আবার স্থির হয়ে গেল। মা, সেদিন সন্ধ্যাতেই
তুমি আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিয়েছিলে। মা, মনে
হচ্ছে কত যুগ পেরিয়ে গেছে, এক একটি দিন
ইতিহাসের পাতার মত রয়ে গেছে। কত আশা,
কত আকাঙ্ক্ষা অন্যান্যের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে
গেছে। কিন্তু মা, দিনান্তের ক্লাস্তিতে নিত্যকার মত
সেই সন্ধ্যাটা আবার আসবে তো?”^{২২}

এমন কোমল পেলব আবার প্রয়োজনে নির্মম সাহসী
উচ্চারণ একজন মুক্তিযোদ্ধাই করতে পারে যার মধ্যে
মা এবং মাতৃভূমির প্রতি অসীম ভালবাসা এবং বর্বর
শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে।

মুক্তিযোদ্ধা দুদু মিয়া তাঁর মায়ের কাছে চিঠি
লিখেছিলেন ২১ জুলাই, ১৯৭১-এ। খুবই সাধারণ
ভাষায় শুরু করেছিলেন চিঠি লেখা। বক্তব্যের
কোনো বাহুল্য নেই। অতি সাধারণ ভাষায় অসামান্য
কথাগুলো গুছিয়ে লিখিছেন তিনি। চিঠির ভাষ্যমতে
নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় ছেলে ছিলেন দুদু মিয়া।
মা-বাবার কষ্ট ক্লান্ত জীবনের ভবিষ্যৎ ভরসার স্থল
ছিলেন তিনি। দুদু মিয়া সেটা জানতেন বুঝতেন এবং
অন্তর দিয়ে অনুভবও করতেন-চিঠিতে তার উল্লেখ
আছে—

“আমার প্রতি কোন দাবী রাখবেন না। কারণ
আমার মৃত্যু যদি এসে থাকে, তবে আপনারা আমায়
বেঁধে রাখতে পারবেন না। মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের
সংগ্রাম করতে হবে। মৃত্যুর জন্য আমরা সব সময়
প্রস্তুত। গ্রামে বসে শিয়াল-কুকুরের মত মরার
চেয়ে যোদ্ধাবেশে আমি মরতে চাই। মরণ একদিন
আছে। আজ যদি আমার মরণ আসে, তাহলে

আমাকে আপনারা মরণ থেকে ফেরাতে পারবেন
না। মরণকে বরণ করে আমার যাত্রা শুরু করলাম।
আমার জন্য দুঃখ করবেন না। মনে করবেন, আমি
মরে গেছি। দোয়া করবেন, আমি যাতে আমার
গন্তব্যস্থানে ভালোভাবে পৌঁছতে পারি।”^{২৩}

মুক্তিযোদ্ধা দুদু মিয়া তাঁর এক আত্মীয়ের ট্রাক থেকে
গোপনে টাকা নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ
করেন প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য। বেঁচে থাকলে সে টাকা
যথারীতি ফেরত দেওয়ার কথা জানিয়ে তিনি মাকে
লিখেছিলেন—

“আর আমার কোন খোঁজ বা কারো উপর
দোষারোপ করবেন না। এটা আমার নিজের ইচ্ছায়
গেলাম। আমি টাকা কোথায় পেলাম সে কথা
জানতে চাইলে আমি বলব, বাবুলের মায়ের ট্রাক
থেকে আমি ৬০ টাকা নিলাম এবং তার টাকা আমি
বাঁচলে কয়েকদিনের ভেতর দিয়ে দেবো। বাবুলের
মায়ের টাকার কথা কারও কাছে বলবেন না। আর
বাবুলের মাকে বলবেন, সে যেন কয়েকটাদিন
অপেক্ষা করে।”^{২৪}

মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক মাকে স্বপ্নে দেখেছেন। মা যেন
তঁাকে ডাকছে আর মায়ের অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে তাঁর
বুক। মা তঁাকে কতক্ষণ ধরে ডাকলেন, কিন্তু মায়ের
ডাকে ইসহাক সাড়া দিতে পারলেন না, পারলেন
না মাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে। কারণ সবটাই
ঘটেছে স্বপ্নের মধ্যে। অসামান্য এক স্বপ্নের কথা
দিয়েই মুক্তিযোদ্ধা ইসহাকের চিঠিটি শুরু হয়েছে।
কিছু চিঠিতে আমরা দেখেছি মা তাঁর সন্তানকে যুদ্ধে
পাঠাচ্ছেন হাসি মুখে অথবা কান্নাকাটি না করে খুবই
দৃঢ় চিন্তে। আবার কিছু মা সন্তানের মুক্তিযুদ্ধে যাবার
প্রাক্কালে এবং পরবর্তীকালে প্রচুর ক্রন্দন করেছেন।
ইসহাকের মায়ের ক্ষেত্রে শেষোক্ত অবস্থাটাই ঘটেছে।
যুদ্ধে যাওয়ার সময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে এক
গভীর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হতে হয়।

সেজন্যে কোনো কোনো মায়ের ক্ষেত্রে সন্তানকে যুদ্ধে পাঠানোর সময় স্বাভাবিক আচরণ করা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, আবার কোনো কোনো মায়ের কান্নাকাটি করা এবং করতে থাকাটাও স্বাভাবিক। একাত্তরের চিঠিগুলোর মধ্যে বেশকিছু চিঠি আছে যেগুলো পড়তে পড়তে চোখের জল ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইসহাকের চিঠিটি তার মধ্যে অন্যতম। আমাদের বহু বীর মুক্তিযোদ্ধা তাঁদের মাকে কাঁদিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মায়ের সে ক্রন্দন তাঁদের অন্তরকে স্পর্শ করেছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সে ক্রন্দন তাঁরা কান দিয়ে শুনতে না পেলেও হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন প্রতি মুহূর্তে। ব্যক্তি মা থেকে তাঁদের কাছে তখন দেশমাতৃকা অনেক বড় এবং মহীয়সীরূপে দৃশ্যমান হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা ইসহাকের চিঠিতে তারই উল্লেখ দেখা যায়—

“মাগো, তুমি আমায় ডাকছিলে? আমার মনে হলো তুমি আমার শিয়রে বসে কেবলি আমার নাম ধরে ডাকছ, তোমার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে, তুমি এতো কাঁদছো? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না। তাই আমায় ডেকে ডেকে হররান হয়ে গেলে। স্বপ্নে একবার তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম, তুমি আমার বড় আবদারের, ছেলের আবদার রক্ষা করতে এসেছিলে। কিন্তু মা, আমি তোমার সঙ্গে একটি কথাও বললাম না। দু’চোখ মেলে কেবল তোমার অশ্রুজলই দেখলাম। তোমার জল মুছাতে এতোটুকু চেষ্টা করলাম না। ...আমি স্বদেশ জননীর চোখের জল মুছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। একটিবার তোমাকে দেখে যেতে পারলাম না। সেজন্য আমার হৃদয়কে ভুল বুঝা তুমি। তোমার কথা আমি এক মুহূর্তের জন্য ভুলিনি, মা।”^{২৫}

দেশের জন্য মৃত্যু যে গৌরবের, আনন্দের সেকথা স্পষ্ট দেখা যায় মুক্তিযোদ্ধা ইসহাকের চিঠিতে।

শৃঙ্খলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্যে অপরাপর মুক্তিযোদ্ধার মতো তিনিও বদ্ধপরিকর। তাই লিখেছেন—

“মাগো, তুমি অমন করে আর কেঁদো না। আমি সত্যের জন্য স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি তাতে আনন্দ পাওনা? কি করবো মা? দেশ যে পরাধীন। দেশবাসী যে বিদেশীর অত্যাচারে জর্জরিত। দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলাভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা? তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলি কাঁদবে?”^{২৬}

সন্তানের জন্য মায়ের এ ক্রন্দন সত্যিই খুবই কষ্টের, বেদনার। তারপরও সন্তানকে মায়ের অশ্রু অতিক্রম করতে হয়েছে, কারণ দেশমাতা এখন অশ্রুসজল। নির্যাতনে হতমানে লাঞ্ছিতা দেশমায়ের সম্মান রক্ষা করে তার মুখে হাসি ফোটতে পারলে, জন্মদাত্রী মায়ের কান্না সেদিন থেমে যাবে— মুক্তিযোদ্ধা ইসহাকের মতো লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা সে কথা ভালোভাবেই জানতেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রহিম ২২ জুলাই ১৯৭১-এ রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ভারতের বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতাল থেকে ০২ আগস্ট ১৯৭১-এ তাঁর মার কাছে চিঠি লিখেছিলেন। বেশ বড় চিঠি জুড়েই সেদিনের যুদ্ধপূর্ব বেদনাময়, মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। আব্দুর রহিমের সে বর্ণনা এ রকম—

“...এরপর আমাদের দুটো রুমকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো গুলি বর্ষণ শুরু হলো। আমাদের রুমের দরজাটা ব্রাশ ফায়ারে বাঁঝরা করে দিল। এক পর্যায়ে একটা গ্রেনেড নিষ্ক্ষেপ করলো, বিস্ফোরিত হয়ে আমিসহ কয়েকজন রক্তাক্ত জখম হলাম। আমার তলপেটে, দুই উরু ও পায়ে মোট

৮টি স্প্লিনটার বিদ্ধ হয়ে যখন মৃত্যুর কাছাকাছি তখন, পেছনের জানালার কথা মনে পড়লো। রাইফেলের বাট দিয়ে জানালার ৪টি শিক ভেঙ্গে ঘরের পেছনের গোবরের পাংগোছের মাইটিলে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে ধপাস করে পড়ে মনে হলো, আমি যেন গোবরের মধ্যে আটকে যাচ্ছি। প্রচণ্ড শীত, অবিরাম রক্তক্ষরণ, বৃষ্টির ন্যায় গোলাবর্ষণ আর অন্ধকার ভুতুড়ে পরিবেশে আমি কোনমতে হামাণ্ডি দিয়ে একটি পুকুরের ঢালুতে ঢোলকলমি আর দাঁতছোলা গাছের ঘন ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। এরপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সকাল ১০টার দিকে কয়েকজন লোক আমাকে খুঁজে পায়। এরপর কলার ভেলাতে করে হাইলি নদী ও তারপর নৌকায় শিকারপুর। সেখান থেকে বহরমপুর হাসপাতালে আসার একদিন পর আমার জ্ঞান ফেরে। ...জানো মা, আমাদের আশ্রয়দাতা তোফায়েল উদ্দিন ভাইয়ের পুরা পরিবার সেদিন কিভাবে চোখের পলকে নিঃশেষ হয়ে গেল।”^{২৭}

মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুর রহিম সেদিন ২৫ সদস্যের উচ্চ প্রশিক্ষিত একটি প্লাটুন নিয়ে অবস্থান নিয়েছিলেন জনৈক তোফায়েল উদ্দিনের বাড়িতে। উদ্দেশ্য ছিল দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ৪০-৫০ জন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারসহ ১০০ জনের একটি দলকে নিশিহ্ন করা। কিন্তু তোফায়েল উদ্দিনের বাড়ির চাকর গভীর রাতে আক্রমণের আগেই পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান জানিয়ে আসে। ফলে পাকিস্তানি বাহিনী উল্টো তোফায়েল উদ্দিনের বাড়ি আক্রমণ করে। তারই প্রেক্ষিতে সেদিন তোফায়েল উদ্দিনের বাড়ির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য বাদে সকলেই শহিদ হন। আব্দুর রহিম লিখেছেন—

“কিন্তু জানো মা, আমাদের উভয়পক্ষের গোলাগুলির মাঝে দৌড়াদৌড়ির কারণে বাড়িওয়ালা তোফায়েল

উদ্দিন, তাঁর শাওড়ি, তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়েসহ আমাদের এক বীরসহযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী ঘটনাস্থলেই শহিদ হলেন এবং আরেক সহযোদ্ধা মমিন চরম আহত ও মুমূর্ষু ও অজ্ঞান অবস্থায় বহরমপুরের এই হাসপাতালে আমার চোখের সামনেই মৃত্যুর কোমল স্পর্শে মিশে গেল চিরদিনের মতো। ...সবচেয়ে মর্মান্তিক এই যে ওয়াজেদ ছিল বাবা-মার একমাত্র সন্তান। দেশ স্বাধীন হবে ঠিকই কিন্তু ওয়াজেদ মমিনদের সেই স্বাধীন দেশে কোনোদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। জানো মা, আল্লাহর কী লীলাখেলা! তোফায়েল উদ্দিন ভাইয়ের ৪ মাসের একটি ছেলে কী অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিল সেদিনের যুদ্ধে। উভয়পক্ষের ব্রাশফায়ারের মধ্যে পড়ে তাঁর পরিবারের সবাই মারা গেল ঠিকই কিন্তু ৪ মাসের নিষ্পাপ অবুঝ শিশুটি লেপ-কম্বলের নিচে থাকায় কোন এলএমজির গুলি তাকে স্পর্শ করেনি। মা, তুমি আমার জন্য দোয়া করো। আমি যেন সুস্থ হয়ে আবার স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ও দেশকে শত্রুমুক্ত করতে পারি। মা, তোফায়েল উদ্দিনের ৪ মাসের শিশু মুক্তিকে কে লালন-পালন করবে? কে বুকের দুধ খাওয়াবে? তার বাড়ির চাকরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব সিরাজের মতো অবস্থা হলো তোফায়েল উদ্দিন ভাইয়ের। শহীদ হলো ওয়াজেদ, মমিন আর আহত হলো আমরা ক’জন।”^{২৮}

মুক্তিযুদ্ধে যে অসংখ্য প্রাণময় যুবক জীবন বাজি রেখে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যেমন মাতৃভূমিকে স্বাধীন, শৃঙ্খলমুক্ত করা তেমনি হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার এবং নানামাত্রিক নির্মম নির্যাতনের প্রবল প্রতিশোধ নেওয়া। মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌস কামাল উদ্দিন মাহমুদের মায়ের কাছে লেখা চিঠিতে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

“মা, আমার সালাম নিয়ে। অনেক পাহাড় পর্বত, নদী প্রান্তর পেরিয়ে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তোমার ছেলে তার অনেক আকাঙ্ক্ষার শেষ ঠিকানা আজ খুঁজে পেয়েছে। হ্যাঁ মা, আমি পৌঁছে গেছি আমার ইচ্ছার কেন্দ্রবিন্দুতে। নিজেকে এবার প্রস্তুত করবো প্রতিশোধ নেওয়ার এক বিশাল শক্তি হিসাবে। আমার প্রতিশ্রুতি আমি কখনও ভুলবো না। ওদের উপযুক্ত জবাব আমাদের দিতেই হবে। মা, তুমি এই মুহূর্তে আমাকে দেখলে চিনতে পারবে না। বিশাল বাবরি চুল, মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ। যদিও আমি নিজের চেহারাটা বহুদিন দেখিনা কারণ এখানে কোন আয়না নেই। মিহির বলে, আমাকে নাকি আফ্রিকার জংলিদের মতো লাগে। মিহির ঠিকই বলে, কারণ, এখন আমি নিজেই বুঝি আমার মাঝে একটি জংলি ভাব এসে গেছে। সেই আগের আমি আর নেই। তোমার মনে আছে মা, মুরগি জবাই করা আমি দেখতে পারতাম না। আর সেই আমি আজ রক্তের নদীতে সাঁতার কাটি। ...কত ঘটনা মনে জমা হয়ে আছে তোমাদের বলার জন্য! হয়তো অনেক বছর লেগে যাবে শেষ করতে। মনু চিঠি নিয়ে যাচ্ছে। পারলে ওকে একটু ভাল কিছু খাবার-দাবার দিও। অনেকদিন ও ভাল কিছু খায়নি।”^{২৯}

চিঠির উদ্ধৃতাংশের শেষ বাক্য দুটি আমাদের গভীরভাবে স্পর্শ করে। বহু সম্পন্ন পরিবারের সন্তানরা এ রকম ঠিক মতো না খেয়ে অনাহারে অর্ধাহারে বনে-জঙ্গলে-বাঙ্কারে থেকে যুদ্ধ করেছে। প্রতিপক্ষ বিভিন্নরকম- পাকিস্তানি বর্বর সৈনিক আর দেশীয় দালাল রাজাকার তো আছেই, তার সঙ্গে পরিবার পরিজনের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, খাবার-দাবারের সঙ্কট আরও অনেক কিছুই।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া তরুণেরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তারা বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে

তাৎপর্যপূর্ণ নানা শ্লোগানের মধ্যে অন্যতম একটি শ্লোগান ছিল-

‘বাংলার হিন্দু
বাংলার বৌদ্ধ
বাংলার খ্রিস্টান
বাংলার মুসলমান
আমরা সবাই বাঙালি।’

তঁারা সবাই ছিলেন দেশমাতৃকার সন্তান। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অজানা-অচেনা তরুণ যুদ্ধের মাঠে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের সাথে পরিচিত হচ্ছেন- জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একে অপরকে আপন করে নিচ্ছেন। মুক্তিযোদ্ধা ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ মন্টুর চিঠিতেও তাই আমরা প্রত্যক্ষ করি- ‘বাংলাদেশের কত ছেলের সাথে পরিচয় হয়েছে। কত ছেলের পরিচয় নিয়েছি! কত ছেলেকে পরিচয় দিয়েছি।’ জননাদাত্রী জননীকে অতিক্রম করে দেশই তখন তাঁদের জননী। একজন মুক্তিযোদ্ধার মা তখন এদেশের সকল মুক্তিযোদ্ধার মা হয়ে ওঠেন। শহিদ মুক্তিযোদ্ধা মুসী আবু হাসমত রশিদ এর চিঠিতে সেই কথাই অভিব্যক্ত হয়েছে-

“...কিন্তু মা, আপনার পুত্র হয়ে জন্ম নিয়ে মাতৃভূমির এই দুর্দিনে কি চুপ করে বসে থাকতে পারি? আর আপনিই বা আমার মতো এক পুত্রের জন্য কেন চিন্তা করবেন? পূর্ব বাংলার সব যুবকই তো আপনার পুত্র। সবার কথা চিন্তা করুন। আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন, যেন আমরা যে কাজে নেমেছি তাতে সাফল্য লাভ করতে পারি। তবেই না আপনার পুত্র হয়ে জন্ম নেওয়া সার্থক হবে। আমাদের বিজয়েই না আপনার এবং শত শত জননীর গৌরব। শুনতে পেলাম আপনার শরীর খুব খারাপ। শরীরের দিকে নজর দেন। কেননা বিজয়ের পর যে উৎসব হবে, সেই উৎসবে আপনাকেই তো আমাদের গলায় মালা পরিয়ে

দিতে হবে। আপনি তো শুধু আমার জননীই নন,
শত শত বিপ্লবী যুবকের মা।”^{৩০}

মুক্তিযোদ্ধা মুঙ্গী আবু হাসমত রশিদ ঢাকার সাভারের কাছে শিমুলতলীতে ২৫ অথবা ২৭ আগস্ট শহীদ হন।^{৩১} ২৫ আগস্টের চিঠিতে তিনি মাকে লিখেছিলেন, “আপনি আমাকে বাড়ি আসতে লিখেছেন। এই মুহূর্তে তা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আশা করি সামনের মাসের প্রথমদিকে বাড়ি আসতে পারবো।”^{৩২} কিন্তু মায়ের কাছে দেওয়া সে কথা তিনি রাখতে পারেন নি। আর ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল ঠিকই। লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাসহ কোটি কোটি বাঙালি সেদিন বিজয়ের উৎসবে লাল সবুজ পতাকা হাতে সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু সে উৎসবে ছিলেন না মুক্তিযোদ্ধা মুঙ্গী আবু হাসমত রশিদ। মা তহমিনা বেগম নিজের বীর সন্তানের গলায় হয়তো সেদিন বিজয়ের মালা পরাতে পারেন নি, কিন্তু বিজয়ের মালা পরিয়েছিলেন শত সহস্র বিপ্লবী বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধার গলায় আর যে দেশের জন্য নিঃশঙ্কচিত্তে প্রাণ দিয়েছেন তাঁর সন্তান সেই দেশমাতৃকার গলায়। মুক্তিযোদ্ধা মুঙ্গী আবু হাসমত রশিদের মতো অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা তাঁদের নিজের মাকে লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার মা হিসেবেই মনে করেছিলেন। ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে জনৈক মুক্তিযোদ্ধা (চিঠিতে নাম উল্লেখ নেই) তাঁর মাকেও একই রকম কথা লিখেছিলেন। চিঠির শেষে লেখা আছে- ‘ইতি তোমার ছেলে’। চিঠির নিচেও কোনো সুনির্দিষ্ট বিবরণ নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র থেকে চিঠিটি পাওয়া গেছে। অমিত সাহসী এই মুক্তিযোদ্ধা তাঁর মায়ের কাছে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। অনিশ্চিত যুদ্ধ জীবনের পিচ্ছিল পথে হাঁটতে হাঁটতে হয়তো নিশ্চিত মৃত্যুর গন্ধ বুকে নিয়ে তিনি মায়ের কাছে রেখে যাচ্ছেন তাঁর যোদ্ধা জীবনের ডায়েরি আর লক্ষ লক্ষ সহযোদ্ধা। তিনি লিখেছেন-

“মা, তুমি আজ কোথায় জানি না। তোমার মতো শত শত মায়ের চোখের জল মুছে ফেলার জন্য বাংলার বুকে জন্ম নিয়েছে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা। আমি যদি মরে যাই তুমি দুঃখ কোরো না, মা। তোমার জন্য আমার যোদ্ধাজীবনের ডায়েরি রেখে গেলাম আর রেখে গেলাম লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা সবাই তোমার ছেলে। আজ হাসপাতালে শুয়ে তোমার স্নেহমাখা মুখখানি বার বার মনে পড়ছে। আমার ডায়েরিটা তোমার হাতে গেলে তোমার সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। দেখবে, তোমার ছেলে শত্রুকে পেছনে রেখে কোনদিন পালায়নি। যেদিন তুমি আমাকে বিদায় দিয়েছিলে আর বলেছিলে, শত্রু দেখে কোনদিন পেছনে আসিসনে, বাবা। তুমি বিশ্বাস করো মা, শত্রু দেখে আমি কোনদিন পালাইনি। শত্রুর বুলেট যেদিন আমার বুকের বাঁ দিকে বিঁধল সেদিনও তোমার কথা স্মরণে রেখেছিলাম।”^{৩৩}

দেশই সবার চেয়ে বড়, দেশই সবার চেয়ে মহান। এই কথা বিবেচনায় রেখে আমরা দেখেছি সন্তান মাকে না বলে যুদ্ধে গেছে আবার যুদ্ধে যাওয়ার সময় মায়ের শতবন্ধন-ক্রন্দনকে উপেক্ষা করেছে। অন্যদিকে অনেক মা তাঁদের নাড়ি ছেঁড়া ধন নিজের পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন দেশের জন্য। যে মা ‘শত্রু দেখে কোনদিন পেছনে আসিসনে, বাবা’ বলে নিজের পুত্রকে শত্রুর বুলেটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিতে দ্বিতীয়বার চিন্তা করেন নি, সে মা কোনোদিনই একজন সন্তানের মা হতে পারেন না। লক্ষ-কোটি মুক্তিকামী মানুষের মা তখন রক্তমাংশের মা এবং দেশ-মা একাকার হয়ে যান। সেই মায়ের কাছে প্রিয় সন্তানের মুখ তাঁর যোদ্ধাজীবনের ডায়েরির পাতায় প্রতিফলিত হবে- এ এক অভাবনীয় নির্মম সত্য। মুক্তিযোদ্ধা দুলাল তাঁর মায়ের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলেন ১৯৭১ সালের ৪ অক্টোবর। ‘মাগো

সম্বোধন করে লেখা চিঠিতে ‘মাগো’ শব্দটি তাঁরই হাতে আঁকা বাংলাদেশের মানচিত্রের মধ্যে উৎকীর্ণ। যেখানে মা এবং দেশ একাকার হয়ে গেছে। যেন দেশের মধ্যেই মা আর মায়ের মধ্যেই দেশ। দুলাল ফুলবাড়িয়ার সম্মুখ যুদ্ধে আহত হন এবং পরে মৃত্যুবরণ করেন। আহত হওয়ার সময় চিঠিটি তাঁর পকেটেই ছিল।^{৩৪} মায়ের কাছে লেখা চিঠি আর মায়ের হাতে পৌঁছেনি। দুলালের লেখা অতি চমৎকার চিঠিটি যেমন সাহিত্যগুণে ভরা তেমনি অসম্ভব আশা জাগানিয়া—

“মাগো, সবমাত্র রণাঙ্গন থেকে ফিরে এসে শিবিরে বিশ্রাম নিচ্ছি। একটা বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত করতে পেরে স্বস্তির নিঃস্বাস ফেলছি। মনটা তাই বেশ উৎফুল্ল। হঠাৎ মনে পড়লো তোমাকে। বাড়ি থেকে আসার পরই প্রথম তোমাকে লিখছি। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তোমায় লিখতে পারিনি। বাঙ্কারে বসে আছি। বাইরে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দ মিলে একটা চাপা আতর্নাদ ভেসে আসছে।”^{৩৫}

চিঠির একেবারে শেষে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার মতো তিনিও মায়ের কোলে ফিরে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে লিখেছেন— “শহীদ হয়ে অমর হবো; গাজী হয়ে তোমারই কোলে ফিরে আসবো মা।” মুক্তিযোদ্ধা দুলাল ‘গাজী’ হয়ে মায়ের কোলে ফিরে আসার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেও রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে করতে না ফেরার দেশে চলে যান। সত্যি শহিদ হয়ে তিনি অমর হয়ে আছেন লক্ষ কোটি মুক্তিকামী বাঙালির চৈতন্যের গভীরে।

১৯৭১ সালের ১লা নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা কামাল (পূর্ণ নাম মোস্তফা আনোয়ার কামাল) তাঁর মাকে চিঠি লিখেছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলখানা থেকে। ছোট ছোট আটটি বাক্যে তিন লাইনের এটি শুধুই একটি চিঠি নয়, যেন অসমাপ্ত এক মহাকাব্য। চিঠি

পড়লে বোঝা যায় দেশের প্রতি কতটা ভালোবাসা থাকলে, শত্রুর জেলখানায় আটকে থেকে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে স্পর্শ করতে করতে সকল ভয়কে জয় করে এরকম জীবনবাদী কথা উচ্চারণ করা সম্ভব। কামাল লিখেছেন—

“আম্মা, সালাম নিবেন। আমরা জেলে আছি। জানিনা কবে ছুটবো। ভয় করবেন না। আমাদের ওপর তারা অকথ্য অত্যাচার করেছে। দোয়া করবেন। আমাদের জেলে অনেক দিন থাকতে হবে। ঈদ মোবারক।”^{৩৬}

মাকে লিখেছেন আমরা জেলে আছি। এখানে ‘আমরা’ বলতে অন্যসব সহযোদ্ধা তো বটেই তার সঙ্গে আছেন কামালের প্রিয়তম পিতা। কামাল আরও লিখেছেন, ‘ভয় করবেন না।’ তুরস্কের বিশ্বখ্যাত সংগ্রামী কবি নাজিম হিকমত তাঁর বিখ্যাত বহু পঠিত ও শ্রুত কবিতা ‘জেলখানার চিঠি’ তে প্রিয়তমা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন—

“কিন্তু প্রিয়তমা আমার, তুমি জেনো,
জন্মাদের লোমশ হাত
যদি কখনও আমার গলায়
ফাঁসির দড়ি পড়ায়
ওরা বৃথাই খুঁজবে
নাজিমের নীল চোখে
ভয়।”^{৩৭}

বিপ্লবী যোদ্ধার প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভয় পেতে নেই। কারণ তখন তাঁর একমাত্র সম্বল অমিত সাহস। সেই সাহসের কঠিন পাথরে পা রেখেই তাঁকে চলতে হয় জীবনের নির্মম পথে। ভয় পেলে তাঁর অন্তরাটার মৃত্যু ঘটে। প্রকৃত যোদ্ধা একবারই মৃত্যুবরণ করেন। তাই নাজিম হিকমতের সেই সাহসী প্রদীপ্ত উচ্চারণ আমরা শুনতে পাই মুক্তিযোদ্ধা কামালের মাকে লেখা চিঠিতে। চিঠি লেখার মাত্র ২০দিন পর নভেম্বরের ২১ তারিখ ঐ জেলখানাতেই

মুক্তিযোদ্ধা কামাল এবং তাঁর পিতাকে হত্যা করা হয়।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেরিলা যোদ্ধা আজাদের কথা। ঢাকা শহরে তরণ গেরিলা যোদ্ধাদের অন্যতম ছিলেন আজাদ। একান্তরে ২৯ আগস্ট ঢাকা শহরের বিভিন্ন বাড়িতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাপক তল্লাশী চালিয়ে বেশ কয়েকজন গেরিলা যোদ্ধা এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনকে গ্রেফতার করে। তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তেজগাঁও বিমানবন্দরের উল্টোদিকে ড্রাম ফ্যাক্টরির কাছে এমপি হোস্টেলে। তারপর চলে প্রত্যেকের ওপর অকথ্য নির্মম নির্যাতন। একইসঙ্গে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। অন্য গেরিলাদের নাম, আর্মস কোথায় ইত্যাদি সব প্রশ্ন। যথাযথ এবং প্রত্যাশিত উত্তর না পেয়ে চলে অবিরাম শারীরিক অত্যাচার-নির্যাতন। প্রথম রাতের নির্যাতনের পরও আজাদের মুখ থেকে কোনো কথা বের করতে পারেনা পাকিস্তানি সেনারা। কিন্তু নির্যাতনের পর ঐ ঘরের মধ্যে আজাদ দেখতে পান তাঁর সহযোদ্ধাসহ আরও অনেককে ধরে এনেছে এখানে। ঔপন্যাসিক আনিসুল হক লিখেছেন—

“সময় কীভাবে, কোথা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আজাদ টের পায় না। এক সময় দেখতে পায়-বদি, রুমী, চুল্লু ভাই, সামাদ ভাই, আলতফ মাহমুদ, আবুল বারক আলভী, বাশার, জুয়েল, সেকেন্দার, মনোয়ার দুলাভাই, আলতফ মাহমুদের শ্যালকেরা, রুমীর বাবা, ভাই, আরো অনেকের সঙ্গে সেও একই ঘরে। তার কী রকম একটা অভয় অভয় লাগে। একই সঙ্গে এতগুলো পরিচিত, অভিন্ন-লক্ষ্য মানুষ, সতীর্থ মানুষ।”^{৩৮}

পাকিস্তানি সেনারা আজাদকে প্রলোভন দেখিয়েছিল তাঁর সহযোদ্ধাদের নাম ঠিকানা এবং অস্ত্র কোথায় আছে তা জানালে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আজাদকে তারা রাজসাক্ষী করতে চায়। আজাদ

রাজসাক্ষী হয়ে সব গোপন কথা জানিয়ে দিলে, তাঁর সহযোদ্ধাদের ধরিয়ে দিলে তাঁর সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটবে। আজাদের মায়ের কাছেও এ প্রস্তাব নিয়ে আসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এক দালাল বাঙালি। পরদিন আজাদের মা গিয়েছিলেন ছেলের কাছে। কয়েকদিনের প্রচণ্ড নির্যাতন-অত্যাচারের ক্ষতচিহ্ন সমস্ত শরীরে। চোখমুখ ফোলা, চোখের ওপরে, ঠোঁটে কাটা দাগ। সমস্ত শরীরে মারের দাগ এবং কাটাদাগের জায়গাগুলোয় রক্ত জমাট বেঁধে এবং শুকিয়ে গেছে। বীভৎস চেহারা হয়েছে আজাদের। নিজের ছেলেকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে আজাদের মায়ের। সেই অবস্থার মধ্যেও তিনি ভাবছেন কিভাবে তিনি ছেলেকে বলবেন এতবড় বিশ্বাসঘাতক হতে। দেশের বিরুদ্ধে, দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, অকৃত্রিম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে তরণরা মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে অবিরাম যুদ্ধ করছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি কোনোক্রমেই সন্তানকে যেতে দিতে পারেন না। হয়তো তাতে তাঁর সন্তান আর কোনোদিন জীবিত বা মৃত ফিরে নাও আসতে পারেন। কিন্তু রাজসাক্ষী হয়ে এ জঘন্যতম কাজ তিনি তাঁর সন্তানকে করতে বলবেন না। এখানে মায়ের কাছে নিজের সন্তানের চেয়ে দেশ বড় হয়ে উঠেছে। মাতৃভূমির মুক্তি তথা স্বাধীনতাই সব চেয়ে কাম্য। শুধু একজন আজাদ নয়, বহুমানুষের সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে আসবে স্বাধীনতা। গরাদের ভেতরে আজাদ, আর তাঁর মা বাইরে। মুখোমুখি মা এবং সন্তানের সেই অবিনাশী হিরণ্য মুহূর্তের কথা তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক—

“না। তিনি আর যা-ই হন না কেন, বেইমান হতে পারবেন না। ছেলেকে যুদ্ধে যেতে তিনিই অনুমতি দিয়েছেন।

আজাদ বলে, ‘মা, কী করব ? এরা তো খুব মারে। স্বীকার করতে বলে। সবার নাম বলতে বলে।’
‘বাবা, তুমি কারো নাম বলোনি তো !’

‘না মা, বলি নাই। কিন্তু ভয় লাগে, যদি আরো মারে, যদি বলে ফেলি।’

‘বাবা রে, যখন মারবে, তুমি শক্ত হয়ে থেকো। সহ্য করো। কারো নাম যেন বলে দিও না’^{৩৯}

আজাদের সাথে একই রাতে ধরা পড়েছিলেন আর এক গেরিলা যোদ্ধা রুমী, তার ছোটভাই জামী এবং পিতা শরীফ ইমাম। রুমীর পিতা এবং ছোট ভাইকে নির্যাতনের পর ছেড়ে দিলেও রুমীকে পাকিস্তানি সেনারা ছাড়েনি। আজাদের মতো তাকেও বহু অত্যাচার-নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছিল। আজাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা বুঝতে পেরেও তাঁর মায়ের সন্তানের প্রতি নির্দেশের কথা (পূর্বে উদ্ধৃত) শুনে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন আর এক শহিদ-মাতা জাহানারা ইমাম। আজাদের মায়ের মুখে সরাসরি সেসব কথা শুনে জাহানারা ইমামের প্রতিক্রিয়ার কথা লিখেছেন ঔপন্যাসিক-

“জাহানারা ইমাম ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে যান। কী শুনছেন তিনি এই মহিলার কাছে? তাঁকে তিনি শক্তই ভেবেছিলেন, কিন্তু এত শক্ত! গভীর আবেগে জাহানারা ইমামের দু’চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। তিনি আবারও সাফিয়া বেগমকে জড়িয়ে ধরেন।”^{৪০}

পাকিস্তানি সৈন্যরা আজাদকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে অত্যাচার-নির্যাতন করে হত্যা করার পর তাঁর মা আরও ১৪ বছর বেঁচেছিলেন। ১৯৭১ সালের ৩০ আগস্ট আজাদ ধরা পড়েন এবং তাঁর মা মারা যান ঠিক ১৪ বছর পর ১৯৮৫ সালের ৩০ আগস্ট। এই চৌদ্দ বছর তিনি শারীরিকভাবে বেঁচেছিলেন কিন্তু তাঁর সমস্ত সত্তা জুড়ে ছিল শহিদ সন্তানের অস্তিত্ব। কয়েকদিন ধরে ভাত খেতে না পাওয়া আজাদ প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় মিলিটারি টর্চার সেলের গরাদের ভেতর থেকে মার কাছে ভাত খেতে চেয়েছিলেন। পরদিন মা তাঁর জন্যে ভাত নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু

তিনি তাঁর প্রিয়তম সন্তান আজাদের দেখা পাননি। আজাদ আর কোনোদিন ফিরে আসেননি। তাই আজাদের মা পরবর্তীকালে বেঁচে থাকা ১৪ বছর কোনোদিন ভাত খাননি। ঔপন্যাসিক আনিসুল হক লিখেছেন-

“১৪ বছর আগে, ১৯৭১ সালের ৩০ শে আগস্ট রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা আজাদকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আজাদ আর ফিরে আসেনি। এটা শহরের অনেক মুক্তিযোদ্ধারই জানা যে, এই ১৪টা বছর আজাদের মা একটা দানা ভাতও মুখে দেননি, কেবল একবেলা রুটি খেয়ে থেকেছেন; কারণ তাঁর একমাত্র ছেলে আজাদ তাঁর কাছে ১৪ বছর আগে একদিন ভাত খেতে চেয়েছিল; পরদিন তিনি ভাত নিয়ে গিয়েছিলেন রমনা থানায়, কিন্তু ছেলের দেখা আর পাননি। তিনি অপেক্ষা করেছেন। ১৪টা বছর তিনি কোনো দিন বিছানায় শোননি, শানের মেঝেতে শুয়েছেন, কী শীত কী গ্রীষ্ম, তাঁর ছিল একটাই পাষাণশয্যা, কারণ তাঁর ছেলে আজাদ শোয়ার জন্যে রমনা কি তেজগাঁ থানায়, কি তেজগাঁ ড্রাম ফ্যাক্টরি সংলগ্ন এমপি হোস্টেলের মিলিটারি টর্চার সেলে বিছানা পায়নি।”^{৪১}

নভেম্বরের ১১ তারিখ মাকে চিঠি লিখেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন। যুদ্ধক্ষেত্রের অপরিসীম দুর্দশা ও কষ্টের বর্ণনা আছে ছোট চিঠিটার মধ্যে। আর চিঠির শেষে আছে দেশ স্বাধীন করে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার মতো মায়ের বুক ফিরে আসার দৃঢ় প্রত্যয়।^{৪২} একই মাসের ১৯ তারিখ মুক্তিযোদ্ধা নূরুল হক তাঁর মায়ের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে মাকে ‘আমার মা’ সম্বোধন করে লেখা শুরু করেছেন। এর ভেতর দিয়ে মাকে ছেড়ে থাকার ফলে বুকভরা আবেগ উছলে পড়েছে। একই রকম আবেগ, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা প্রত্যেক পত্র লেখকের লেখার মধ্যে অনুভব করা যায়। নূরুল হক যেন যুদ্ধরত অবস্থায় ক্ষণিক অবসরে

মাকে চিঠি লিখেছেন। তাঁর চিঠিটি পড়লে সেরকম অনুভূতি প্রকাশ পায়—

“আমার মা, আশাকরি ভালোই আছে। কিন্তু আমি ভালো নেই। তোমায় ছাড়া কেমনে ভালো থাকি। তোমার কথা শুধুই মনে হয়। আমরা ১৭জন। তার মধ্যে ৬জন মারা গেছে, তবু যুদ্ধ চালাচ্ছি। শুধু তোমার কথা মনে হয়, তুমি বলেছিলে ‘খোকা মোরে দেশটা স্বাধীন আইনা দে’; তাই আমি পিছু পা হই নাই, হব না, দেশটাকে স্বাধীন করবোই। ‘রাত শেষে সকাল হইবো, নতুন সূর্য উঠবো, নতুন একটা বাংলাদেশ হইবো, যে দেশে সোনা ফলায়’ রক্তপাত বন্ধ হবে, নতুন রাত আসবে, মোরা শান্তিতে ঘুমাবো। আর যদি তার আগে আমি মরে যাই তবে তুমি দেখবে, গোটা দেশ দেখবে। ...আর বেশি দেরি নাই আমাদের দেশ আবার স্বাধীন হবে। আমি বাড়ি ফিরে যাবো। যাওয়ার দিন বাবার পাঞ্জাবি, মার শাড়ি, ময়নার চুড়ি, নয়নের পতাকা আনবো। শুধু আমার জন্য দোয়া করো না, সবার জন্য দোয়া করো, যাতে দেশটা স্বাধীন হয়। আর বেশিকিছু নয়। এখনই একটা যুদ্ধে যাবো।”^{৪০}

১৯৭১ এর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের শেষ দিকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির বিভিন্ন এলাকা শত্রুমুক্ত হচ্ছিল। নভেম্বরের ৩০ তারিখে শহিদ লেঃ সেলিম এর লেখা চিঠিতে তারই বিবরণ দেখা যায়—

“মা, ১লা নভেম্বর নোয়াখালীতে যাওয়ার হুকুম হলো। ফেনীর বেলোনিয়া ও পরশুরাম মুক্ত করার জন্য। ৬ই রাতে চুক চুক করে শত্রু এলাকার অন্তপুরে ঢুকলাম। পরদিন সকালে ওরা দেখলো ওদের আমরা ঘিরে ফেলেছি। ৮ই রাতে ঐ জায়গা সম্পূর্ণ মুক্ত হলো। শত্রুরা ভয়ে আরও কিছু ঘাঁটি ফেলে পালিয়ে গেল।”^{৪৪}

লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার প্রাণপণ লড়াই, লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে, কোটি কোটি মানুষের অপারিসীম ত্যাগ আর এক সাগর রক্তের মাধ্যমে বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতির হৃদয় বিদীর্ণ করে পূর্বাকাশে উঠেছিল স্বাধীনতার লাল সূর্য। ঐতিহাসিক ১৬ ডিসেম্বর আমাদের কাক্ষিত, প্রত্যাশিত আর গৌরবের বিজয় অর্জনের পরও শত্রুরা বিভিন্ন জায়গা দখল করে রেখেছিল। সেরকমই একটি এলাকা ছিল ঢাকার মিরপুর। ঐ এলাকা শত্রুমুক্ত করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা লেঃ সেলিম শহিদ হন।

নয় মাসের যুদ্ধের শেষপ্রান্তে বাংলার আকাশে অন্ধকারের রং ফিকে হয়ে পূর্বাকাশে লাল সূর্যের আবির্ভাব-বার্তা যখন ঘোষিত হচ্ছে, তখন আমাদের প্রিয়তম বীর মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর ডিফেন্স ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেসব এলাকা শত্রুমুক্ত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকারে চলে আসছে। চারপাশের চাপা কান্না আর বোবা চৈতন্যের মাঝে বর্ণাধারার মতো অপারিসীম আনন্দে উদ্বেলিত-প্রাণিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনা বীর মুক্তিযোদ্ধারা যেন তাঁদের নয়নের মণি। ১৯৭১ এর ৯ডিসেম্বরে লেখা মুক্তিযোদ্ধা তৌফিকুল ইসলামের মায়ের কাছে লেখা চিঠিতে তাঁরই অনুরণন শোনা যায়—

“শ্রদ্ধেয় মা, বাংলার রক্তরাঙ্গা উদয়াকাশে উদীয়মান সূর্যের তলে...বাংলার এহেন অবস্থায় স্বাধীনতা লাভের উৎসবরূপ প্রথম স্বাগত জানাই আপনাকে। মা, আমার অন্তরের অন্তরগুহা থেকে বারবার চেউ খেলে। বাংলার মুক্ত আকাশে আনন্দে তাল রেখে সবার মুখে মুখে স্বাধীনতার ছোঁয়াছ লাগিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিচ্ছে। আর জানাই পরম পূজনীয় শ্রদ্ধেয় ‘বাবা’ কে যার কথা মনে পড়ে প্রতি মুহূর্তে। যখন রাইফেলের ট্রিগার -এর ওপর আমার হাতের চাপ পড়ে, গর্জন করে

ওঠে আমার বাংলার দুলাল শেখ মুজিবের সিংহ গর্জন কণ্ঠের ন্যায়। ...মা, যখন শত্রুর 'ডিফেন্স' পেছনে ফেলে এগিয়ে আসছি, মনে বড় সংকোচ ছিলো- জানিনা লোকে আমাদের কীভাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর লোকের আনন্দ-ফুঁর্তি দেখে সব ভয়, সংকোচ, কালিমা মন থেকে নিমিষে মুছে গেল। কেবল তারা পারছে না আমাদের তাদের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে-এমন আনন্দ-উল্লাসে মত্ত তারা। আর কী লিখব! 'রক্ত ছালাম' দিয়ে সবার থেকে বিদায় নিচ্ছি।"^{৪৫}

মুক্তিযোদ্ধা তৌফিকুল ইসলামের মতো মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোস্তফার চিঠিতেও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল শত্রুমুক্ত করার কথা উচ্চারিত হয়েছে।^{৪৬} তবে ১৯৭১ এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী যখন বুঝতে পারলো তাদের দিন প্রায় শেষ, তখন তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ঘাঁটি, বাস্কার লক্ষ্য করে নিষ্ফেপ করতে লাগলো আর্টিলারি শেল। মোঃ মোস্তফার চিঠিতে তার উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। মোস্তফা চিঠি লিখেছেন ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে। উল্লেখ্য যে, ঐদিনটি 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস', আমাদের জীবনে চরম বেদনার আর কষ্টের দিন। কারণ পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী যেমন তাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করে তাদের শেষ অস্তিত্বটুকু জানান দিচ্ছিল, তেমনি ঐ একই সময়ে রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী আমাদের দেশের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম প্রজ্ঞাবান মানুষদের হত্যা করতে শুরু করেছিল।

'একাত্তরের চিঠি' সংকলন গ্রন্থে মাকে লেখা চিঠির মধ্যে সর্বশেষ চিঠিটি বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল আবু তাহেরের লেখা। চিঠিতে কোনো তারিখের উল্লেখ নেই। শুধু এই চিঠিতেই নয়। গ্রন্থের শেষ দিকের বেশকিছু চিঠিতে তারিখ নেই। কর্ণেল আবু তাহের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকুরি

করতেন। দেশের প্রতি অপরিসীম ভালবাসার কারণে তিনি ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।^{৪৭} ১১নং সেক্টরে তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং যুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। মায়ের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি যুদ্ধের বিষয়ে তেমন কিছু লেখেন নি। পারিবারিক খোঁজখবর নেওয়া- দেওয়ার বিষয়টি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। যুদ্ধের সময়ের নানামাত্রিক সংকট সম্পর্কে কিছু বক্তব্য সেখানে আছে। তবে চিঠির শেষপ্রান্তে এসে তিনি মায়ের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, 'আপনারা সাহস হারাবেন না।' একথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের দেশের লক্ষ্য-কোটি মানুষ শত সংকটের মধ্যেও সাহস হারান নি বলেই তাদের সংগ্রাম, সাহস মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

অসংখ্য শহীদের আত্মত্যাগ এবং ইতিহাসে লেখা না লেখা অসংখ্য মায়ের অশ্রুধারায় অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। মুক্ত হয়েছে প্রিয় স্বদেশ। এই বিপুল আত্মত্যাগ কখনোই বৃথা যেতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের রক্তসিঁড়ি বেয়ে মানুষের এবং মানবতার মুক্তি আসবেই। দুঃখের রাত্রির অন্ধকার কেটে আলো আসবেই। তাই তো কবি লিখেছেন-

“বীরের এ রক্তশ্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাগ্যরী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন
নিদারুণ দুঃখ রাতে
মুতুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?^{৪৮}

উপসংহার

১৯৭১ সালে বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধের প্রাঙ্গণ থেকে মায়ের কাছে লেখা এসব চিঠিতে পত্রলেখক মুক্তিযোদ্ধাদের জন্মভূমির প্রতি আবেগ, ভালোবাসা ও অনুভূতির স্বচ্ছ প্রকাশ ঘটেছে। প্রায় সব পত্রলেখক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধে গেছেন দেশমাতৃকার লাঞ্ছনা ও গ্লানি মোচনের লক্ষ্যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে। দেশমাতৃকার গ্লানি মোচন আর শৃঙ্খল ভাঙার অসম-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাঁরা রক্তের আখরে যেসব চিঠি লিখেছিলেন তার ভাষা ব্যক্তিগত মাকে ছাপিয়ে দেশমাতার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা হয়েছে— “অবিশ্বাস্য সত্য হচ্ছে ‘ভীরু, অলস, কর্মবিমুখ, কাপুরুষ, ভেতো, যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ’ এই বাঙালিই মাত্র নয়মাসে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। ... স্বাধীনতার জন্য প্রাণের আবেগ যখন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে, তখন পৃথিবীর যত ভয়ংকর মারণাস্ত্রই ব্যবহার করা হোক না কেন, সেই আবেগের কাছে তা তুচ্ছ হয়ে যায়।”^{৪৯} আধুনিক অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী প্রশিক্ষিত পাকিস্তানি সৈন্যরা যুদ্ধ করেছিল ধাতব অস্ত্র আর বারুদ দিয়ে, অন্যদিকে আমাদের দেশপ্রেমিক মুক্তিকামী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান অস্ত্র ছিল দেশের প্রতি অসীম ভালোবাসা আর আবেগে পূর্ণ তাঁদের প্রতিটি হৃদয়। অস্ত্র আর বারুদ এক সময় ফুরিয়ে যেতে পারে কিন্তু দেশপ্রেমিকের জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা অফুরন্ত, অনিঃশেষ।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৭৩
২. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৮২
৩. *একাত্তরের চিঠি*, সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩
৪. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩
৫. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৪

৬. *মেঘনাদবধ কাব্য*, মধুসূদন রচনাবলী, ডক্টর ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, পৃ. ৩৮-৩৯
৭. *একাত্তরের চিঠি*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৫
৮. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৮
৯. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৯
১০. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৯
১১. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৩
১২. জাহানারা ইমাম ৩ মে ১৯২৯ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রভাষকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিছুদিন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটেও খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। জাহানারা ইমামের বড় ছেলে শাফী ইমাম রুমী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ঢাকা শহরে বেশ কয়েকটি গেরিলা অপারেশন করার পর ধরা পড়েন এবং পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেন। রুমী শহিদ হলে স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পর রুমীর সহযোদ্ধারা তাঁকে শহিদ-মাতা হিসেবে গ্রহণ করেন। জাহানারা ইমাম এবং তাঁর স্বামী শরীফ ইমাম মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের নানারকম সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। গতশতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় একাত্তরের ঘাতকদের বিচারের দাবীতে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি ১০১ সদস্য বিশিষ্ট একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হয় জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে। পরবর্তীকালে ১১ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি’। তিনি এই কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ তাঁর নেতৃত্বে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণআদালতের মাধ্যমে

- যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের ঐতিহাসিক বিচার হয় এবং তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। জাহানারা ইমাম একজন লেখক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘একাত্তরের দিনগুলি’। তিনি শহিদ জননী হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন জাহানারা ইমাম দীর্ঘদিন ক্যান্সারে ভুগে মৃত্যুবরণ করেন।
১৩. শহিদ রুমীর পুরো নাম শাফী ইমাম রুমী। তাঁর জন্ম ২৯ মার্চ ১৯৫১। তাঁর পিতার নাম শরীফ ইমাম এবং মায়ের নাম জাহানারা ইমাম। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে রুমী ছিলেন একজন গেরিলা যোদ্ধা। ১৯৭১ সালের মার্চে রুমী ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের কর্মী এবং তুখোড় তর্কিক। ঢাকা শহরে বেশ কয়েকটি সফল গেরিলা অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ এর ৩০ আগস্ট তাঁদের বাড়ি থেকে তাঁকে পাকিস্তানি সেনারা তুলে নিয়ে যায়। তারপর রুমীর ওপর চালানো হয় অকথ্য নির্যম নির্যাতন। পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতনের ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
১৪. জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৭৮-৭৯
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
১৬. *কাহুলিল জিব্রান, দি প্রফেট*, চৌধুরী মুশতাক আহমদ এর বঙ্গানুবাদ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।
১৭. জাহানারা ইমাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
১৮. *একাত্তরের চিঠি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
২১. জাহানারা ইমাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
২২. *একাত্তরের চিঠি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৩৭. নাজিম হিকমত, *জেলখানার চিঠি*, নির্বাচিত নাজিম হিকমত, অনুবাদ- সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দে’জ ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৮ ও ২০
৩৮. আনিসুল হক, মা, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২২০
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৪২. *একাত্তরের চিঠি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী* (৬ষ্ঠ খণ্ড, বলাকা কাব্যের ৩৭নং কবিতা), জয় বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা, ১৪০৬, পৃ. ২৮৮
৪৯. *একাত্তরের চিঠি*, প্রাগুক্ত, ‘সবিনয় নিবেদন’ শিরোনামে ভূমিকায় উল্লিখিত।

বিষাদবৃক্ষ: ফিরে দেখার বিষাদগাথা

রামী চক্রবর্তী

সারসংক্ষেপ

রামী চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

শিলচর, আসাম, ভারত

e-mail : ramichakraborty12@gmail.com

‘দেশভাগ’-এই শব্দটির সাথে মিশে আছে হাজারো মনের মোহ-আবেগ-আর্তি-বিষণ্নতার মিশ্র অনুভূতি। কেউ একে দেশের তথা জাতির আদি পাপ বলতে চেয়েছেন। আবার কেউ এর নেপথ্যে রাজনৈতিক চুলচেরা বিশ্লেষণে নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন। আবার এমন কিছু স্মৃতিমূলক আখ্যানও রচিত হয়েছে যেখানে লেখকই কথকের চরিত্রায়নে অভিজ্ঞতাজাত স্মৃতির বাঁপিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এরকমই একটি স্মৃতিমূলক আখ্যান বলা যেতে পারে মিহির সেনগুপ্তের ‘বিষাদবৃক্ষ’ গ্রন্থটিকে, যা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে পিছারার খালের মতো একটি ছোট্ট অঞ্চলের লোকায়ত সাংস্কৃতিক পরিসরের ক্রমশ বদলে যাওয়া পরিস্থিতিকে একজন সংখ্যালঘুর দৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়েছে এখানে। এই আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মিশে গেছে কথকের নিজস্ব প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির অনুভবও। বিন্দুতে সিদ্ধ দর্শনের মতো ছোট্ট অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রচ্ছায়াকেও আংশিক চিত্রে আমরা উঠে আসতে দেখি।

মূলশব্দ

দেশভাগ, প্রব্রজন, পুনর্বাসন, সংখ্যালঘু, স্মৃতিকথন

উদ্দেশ্য

কোনো একটি বিষয়ে নানা সময়ে নানা মতবাদ তৈরি হয়। ‘দেশভাগ’-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এর বাইরে নয়। স্মৃতিমূলক কথনে কতটা ঐতিহাসিক সত্যতার নিরপেক্ষতা রক্ষিত হয় নাকি ব্যক্তিক অনুভবের একপেশে উপস্থাপনে তা কিছুটা হলেও প্রতিক্রিয়াশীল জনমতের জন্ম দেয়-এ প্রশ্নগুলোও দেশভাগকেন্দ্রিক বিষয়ে ইদানিংকালে নানা তাত্ত্বিক প্রস্তাবনার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্মৃতিনির্ভরতা কতটা জরুরি এধরনের ব্যক্তি অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত

তার একটি নিজস্ব পাঠ-প্রতিক্রিয়াই এ আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

পদ্ধতি

বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

‘দুটি মানুষ দুই পথে চলে গেল;

দুটি কঠিন পাথরের মুখ

খোদাই করা নিষ্প্রাণ দুই জোড়া ঘোলাটে চোখ
 অদৃশ্য রক্তের তোলপাড়ে একই অধিকারে মৃত
 পিতাকে স্মরণ করেছিল।
 আর এখন, এমন দিনে
 যদি সে- মুখ আবার মনে পড়ে, রক্তে বাজে
 না-দেখার কঠিন বার্থতা
 তখন কোথায় কোন রাস্তায় এসে দাঁড়াবে
 দুটি সৎভাই, সমস্ত আকাশটাই যেখানে দেয়াল
 দিয়ে আপাদমস্তক ঢাকা!^১

এ আলোচনাটিও এমন একটি আখ্যানকে ঘিরেই
 দেশভাগের রক্তাক্ত জমিতে যার বীজাধার তৈরি
 হয়েছিল। আর স্বভূমে পরবাসী হয়ে বেঁচে থাকা
 এক সংখ্যালঘুর অবরুদ্ধ মনের আলো-আঁধারিতে
 সেই বিষবৃক্ষের বেড়ে ওঠা। স্মৃতিভরানত সেই
 বৃক্ষের আশ্রয়ে বসে জীবনের চক্রবাক ঘূর্ণনের
 মুহূর্তগুলোকে রোমন্থন করা। দেশভাগ-দেশত্যাগ
 মানে যে শুধু আজন্মালিত ভূখণ্ড থেকে বিচ্যুতি নয়,
 শুধুমাত্র প্রব্রজন-পুনর্বাসন এর অস্তিত্ব সংকটই নয়,
 সেসঙ্গে স্বভূমে থেকেও চোখের সামনে আজন্মালিত
 অভ্যেস-পরিচিতজন-অভ্যস্ত বাস্তবতার ক্রমশ বদলে
 যাওয়ার অভ্যাসকে নিদারুণ যন্ত্রণায় সহ্য করে
 যাওয়ার আত্মিক সংকটও বটে। এই যন্ত্রণার কোনো
 মূল্য হয়না। তার ভাষিক প্রকাশের স্বীকৃতিই যথেষ্ট।
 এ যেন ইতিহাসের কাছে, নিজের সময়ের কাছে
 নিজের দায়বদ্ধতাটুকু তুলে ধরা। সেই দায়বদ্ধতার
 সত্যটুকুকেই লেখকের স্বীকারোক্তিতে তুলে ধরতে
 চাই যার লিখিত আখ্যানই এই আলোচনার উদ্দিষ্ট
 বিষয়। ‘বিষাদবৃক্ষ’ নামের স্মৃতি-আখ্যানটির রচয়িতা
 মিহির সেনগুপ্ত। ‘আনন্দ’ পুরস্কারপ্রাপ্ত এ গ্রন্থটি
 লেখকের জীবনের প্রথমার্ধের স্মৃতিমূলক ঘটনাকে
 ঘিরে রচিত। এছাড়াও ‘বিদুর’ (১৯৯৫), ‘ভাটিপুত্রের
 পত্র বাখোয়ার্জি’ (১৯৯৫), ‘সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম’
 (১৯৯৬) নামের অন্যান্য গ্রন্থও তাঁর রচনার তালিকায়
 রয়েছে। বরিশাল জেলার কেওড়া গ্রামে (অধুনা

বাংলাদেশের ঝালকাঠি জেলায়) জন্মগ্রহণ করেছিলেন
 তিনি। ওখানেই প্রথমে তারলি এবং পরে কীর্তিপাশা
 স্কুলে পাঠলাভ করেন এবং বরিশালের ব্রজমোহন
 কলেজে ভর্তি হয়েও শেষ পর্যন্ত তা সম্পন্ন হয়নি।
 ফলে ১৯৬৩ সালে কলকাতায় এসে স্কুল জীবন থেকে
 শুরু করে ১৯৬৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
 ইংরেজিতে স্নাতক হন। কলকাতা এবং কলকাতার
 সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ালেও মনের কোণে
 পূর্ব স্মৃতিটুকু যে ভাঙারে সঞ্চিত হয়ে পড়েছিল তাই
 যেন ঝাঁপিমুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে প্রকাশের পথ
 ধরে। তাই এ গ্রন্থের অবতরণিকা অংশে লেখক যা
 বলেন তাতে এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যের সাথে সাথে
 আলোচনার একটি অভিমুখও তৈরি হয়ে যায়।

‘যারা পঞ্চাশের ছিন্নমূল কাফেলা, তাদের জীবনভর
 দুঃখ সংগ্রাম, হারিয়ে ফুরিয়ে যাওয়ার কথা নিয়ে
 নির্মাণ হয়েছে কত লেখা, ছবি, ছায়াছবি। আজও
 উপমহাদেশ জুড়ে বন্ধ হয়নি হাহাকারি চর্চা,
 রোমন্থন।...

পঞ্চাশের সেই ক্যারাভানের শেষপ্রান্ত আজও
 চলমান। আরো কতকাল তার প্রবাহ চলবে কেউ
 জানেনা। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম
 যারা, যারা সেই পঞ্চাশ/একান্নর নরমেধের রক্ত,
 বসা, মেদের শ্রোত পেরিয়ে আসতে পারিনি,
 যাদের হতভাগ্য অভিাবকদের এপারে কোন
 সহায় সম্পদ ছিল না চলে এসে স্থায়ী হয়ে, থিতু
 হয়ে বসার মতো, তারা সেদিন কীভাবে তথাকার
 স্বাধীন ভূমিতে বেড়ে উঠেছিল বা কতটা নাগরিক
 অধিকার লাভ করেছিল, এই গ্রন্থ তারই একটি
 আলোচনার প্রচেষ্টা।... শুধুমাত্র রাষ্ট্র, সংখ্যাগরিষ্ঠ
 সম্প্রদায়ের একাংশের নির্যাতন, নৃশংসতা লোভ বা
 একচোখোমিই নয়, স্ব-সমাজ, স্ব-গোষ্ঠী এবং নিজ
 নিজ পরিবারে কর্তাদের অপদার্থতা, অকর্মণ্যতা
 অবক্ষয়ী মনোভাবের জন্য এই প্রজন্মকে চরম

মূল্য দিতে হয়েছিল, তার আলেখ্যও এই রচনা। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তার ইতিকথা ও রেখে যাওয়া প্রয়োজন যেহেতু শুধু সেদিনের পূর্বপ্রাণীয়া ভূখণ্ডই নয়, গোটা উপমহাদেশে তার কার্যকারণ এখনো দগদগে।^২

লেখক উত্তর-প্রজন্মের কাছে ইতিহাসকে তুলে ধরতে চান সময়ের কাছে দায়বদ্ধ থেকেই। এখানেও উপস্থাপনার আধার হয়ে ওঠে স্মৃতিকথন। যদিও ঘটনার পারস্পর্য রক্ষার ক্ষেত্রে স্মৃতি যে মাঝে মাঝে বিশ্বাসঘাতকতা করে লেখক সে কথা নানা সময়ে বলেছেন তার আখ্যানের ব্যাখ্যানে। তাছাড়া ইতিহাসে স্মৃতির অন্তর্ভুক্তি কতটা যুক্তিসঙ্গত এ নিয়ে ইদানিং তাত্ত্বিক বিতর্কেরও যথেষ্ট অবকাশ তৈরি হয়েছে।

‘আনন্দবাজার’ পত্রিকাকে দেওয়া রনজিৎ গুহের সাক্ষাৎকারে আমরা জেনেছি,

‘স্মৃতি তো একটা আর্কাইভ। সরকারি-বেসরকারি সব নথিখানার মতোই স্মৃতির আর্কাইভও বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতা অনুযায়ী বাছাই করা দলিলে ভর্তি থাকে। তাই তার থেকে কোনো সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষতা আশা করা যায় না।’^৩

তাই স্মৃতিমূলক লেখার সত্যতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠতে দেখা গেছে। স্মৃতি যেহেতু ব্যক্তির নিজস্ব ভাবনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সময়ান্তরে ভিন্নমুখী হতে পারে তাই এর উপর কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। তাছাড়াও স্মৃতিমূলক কখনো শুধুমাত্র সেই সব ঘটনাই স্থান পায় যেগুলো স্মৃতিতে রক্ষিত থাকে। আবার এ প্রশ্নটিও পাশাপাশি উঠে আসতে দেখা যাচ্ছে যে সেই স্মৃতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচকের নিজস্ব অভিমত প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমর্থনযোগ্য একপেশে যুক্তিগুলোই শুধু উঠে আসে। আবার অনেকের ধারণা দুঃসময়ের স্মৃতিকে কেউই ‘হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে চান না’ বলে বিস্মৃতিকেই গুরুত্ব দেন যা ইতিহাসের সত্যতা

প্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত ঘটায়। তাই এক কথায় স্মৃতির পরিপন্থী বিষয়ই ইতিহাসের পক্ষে যোগ্য প্রেক্ষাপট তৈরি করতে পারে। এসব প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন যত সময় যাচ্ছে উঠে আসছে, বিশেষ করে দেশভাগের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ঘিরে। তবুও দেশভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আখ্যান রচনায় এতকিছুর পরও স্মৃতির ভূমিকা অস্বীকার করতে পারছেন না অনেকেই। কেননা তাদের মতে,

‘স্মৃতির ব্যাপ্ত আপেক্ষিকতা ও আত্মপ্রবঞ্চনা সত্ত্বেও তা দিয়ে কিন্তু এক বৃহত্তর সামাজিক চেতনা তৈরি হয়ে উঠছে, আর স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে হেঁচট খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরাও সেই বৃহত্তর সমাজ চেতনার একটা আদল খুঁজে পাচ্ছি।...

‘দেশভাগের ঘটনার’ থেকে ‘দেশভাগের স্মৃতি’ যেন আমাদের ভাবনা ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ একটি আলাদা বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। দেশভাগের ‘ঘটনা’র পাশাপাশি দেশভাগের ‘স্মৃতি’ (বা যুথ-স্মৃতি, ‘collective memory’) পৃথকভাবে দুই বাংলার মানুষকে তাড়িত করে বেড়ায়। দুই সমাজ এর নতুন নির্মাণে অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। সুতরাং কেবল ‘Partition as an event’-র জন্যই আমাদের কাছে স্মৃতির সন্ধান জরুরি নয়, আলোচ্য ‘category’ হিসেবেই ‘memory of partition’, আমাদের আলোচনা ও অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়।^৪

মোটামুটিভাবে এই তাত্ত্বিক অবস্থানের কথা মাথায় রেখেই ‘বিষাদবৃক্ষ’-র নিজস্ব পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় যেতে চাই। স্মৃতি গোপনে বাসা বাঁধে। আর তাই স্বাধীনতার এত বছর পরও আমাদের কথক বনাম লেখককে স্মৃতির অতীতে ডুব দিতে হয়। গুরুত্বই লেখক তাঁর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন ‘পিছারার খাল’-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনবসতি এবং তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির নানাবিধ বর্ণনার মধ্য দিয়ে-

‘পিছারার খালের মহিমা অনেক। যখনকার কথা বলছি তখন পঞ্চাশের কাল। সদ্য ‘আভাফাটা’ রাষ্ট্রটি অথবা বলা ভালো রাষ্ট্র দুটি নেহাত নাবালক। কথাটি বললাম বটে, তবে এই রাষ্ট্র দুটি আদৌ অগুজ নয় জরায়ুজই। কারণেই পাঁচ-ছ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাদের নাড়ী কাটার রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না।’^৫

এই পিছারার খালের স্মৃতি বেয়ে উঠে আসে দেশভাগোত্তর উত্তর-পূর্ব বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রান্তিক জনগণের অসাম্প্রদায়িক জীবনযাপনের দলিলচিত্র। ভিন্ন ধর্মের মানুষগুলো যতটা না দূরবর্তী রাজনৈতিক অধিকারের কথা শুনে অবাধ হয় তার চেয়ে পারস্পরিক অনন্যসম্পৃক্ততায় বেশি মুগ্ধ হয়। তাই এই অঞ্চল ধরেই লেখকের স্মৃতিকোঠায় গ্রামীণ জীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের ছবি জাগ্রত হয়। নদীতীরস্থ দুই বৃক্ষকে সাক্ষী রেখেই বিষাদগাথা এগিয়ে চলে। আমরা যেমন নয়া বউ সোনা বউদের অন্তর্জীবনের নানা সাংস্কৃতিক আবহের সঙ্গে পরিচিত হই তেমন সুন্দরবন থেকে আগত রহমান সর্দার, ছনু মির্খাদের মতো বার্তা বাহকদের কথাও শুনি। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই ছোট্ট অঞ্চলটি তখন এদের আনীত খবরে বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে। এ আখ্যান শুধুমাত্র গড়পড়তা কিছু ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষের স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান নয়, স্ব-ভূমে বসে একটি ঘোষিত রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু হিসেবে তিনি দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে দেশভাগ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনের বাস্তবতাকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। একসময়ের শিক্ষিত সচ্ছল শ্রেণির অধঃপতনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত মানসিকতায় নতুন শ্রেণি-সমাজ তথা মানুষ উঠে এসেছে, তৈরি হয়েছে নতুন ধর্মীয় এবং সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাস যা এই আখ্যানের মূল সুর। জমিদারি প্রথা বিলুপ্তিকরণ আইন মধ্যস্বত্বভোগীদের জীবনে করুণ অবস্থার সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়ে যে পাকিস্তানের জন্ম

হলো তা এই ‘অপবর্ণী’ বা ‘অপবর্ণী’ দের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মগজ ধোলাই করা স্বপ্নের আলোয়ই তৈরি করেছিল। যারা সমাজের নিম্নস্তরের তাদের জীবনে যে পরিস্থিতিগত অবস্থান্তর কোনো সুফল প্রদান করেনা এই সামাজিক সত্যটিকে লেখক নির্দিধায় তুলে ধরেছেন। দেশভাগজনিত দেশত্যাগ দুদেশেই প্রতিষ্ঠিত মানুষের ভিতকে উনুল করেছিল এবং সেই সঙ্গে তাদের ভাগীদার জুটেছিল দুদেশেই। কিন্তু কাদের ভাগ্যে জুটে ছিল এসব; আমাদের ধারণা যদি হয়ে থাকে এতে একদল নিম্নশ্রেণির লোক রাতারাতি ধনী হয়ে গিয়েছিল তা যে সর্বৈব ভুল তথ্য তা আমরা দেখি লেখকের স্মৃতিচারণায়—

‘হিন্দুদের জমি-জিরেত বাগান পেয়েছিল তারা ই যাদের কিছু ছিল। যারা ভূমিহীন, তারা পায়নি, তারা তাদের শ্রম ব্যয় করেছিল যেমন বহু আগের কাল থেকে তারা করে এসেছিল এখানে ভূমি হাসিল করার জন্য। ভূমি আবাদ করার কাজও তাদেরই করতে হয়েছে তবে মালিক তারা হতে পারেনি। এরা সাময়িকভাবে কিছুটা বখরা পেয়েছিল, কায়েমিস্বত্ব কিছুই পায়নি।’^৬

এই একই ঘটনার বাস্তবতাকে তুলে ধরেন প্রফুল্ল রায় তাঁর ‘রাজা আসে রাজা যায়’ গল্পে। যেখানে রাজেকের জীবনের রাতারাতি অবস্থান্তরের দুঃখজনক পরিণতিতে লেখক দেশভাগজনিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জ্বলন্ত সত্যকে তুলে ধরেন। মিহির সেনগুপ্তের ‘বিষাদবৃক্ষ’ গ্রন্থটি যেহেতু স্মৃতিমূলক আখ্যান, ঔপন্যাসিকরণের আরোপিত নিরপেক্ষতা, দূরত্ব বজায় রাখা ইত্যাদি শর্তাবলী মেনে চলার প্রয়োজন পড়েনি লেখককে। তাই তাঁর দৃষ্টির সীমানায় যে বাস্তবতার কথকতা ভিড় করে এসেছে সেখানে স্মৃতি হাতড়ে তিনি সেইসব মুগ্ধতার-যন্ত্রণার-বিষাদের বাস্তবতাকে কুণ্ডলীনেভাবে তুলে ধরেছেন। এসবের বর্ণনার মধ্য দিয়ে তার পিছারার খালকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আংশিক

বাস্তবতাই সামূহিক বাস্তবতার খণ্ডিত উপস্থাপনায় যৌবনের কোঠায় এসে কড়া নাড়ে। জানকী নামের এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা শৈশবের সারণি বেয়ে চলা জীবনের ক্রমপরিণতিতে লেখক প্রত্যক্ষ করেন কীভাবে দেশভাগোত্তর পরিস্থিতি তার চারপাশের মানুষজন, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস, আর্থিক কাঠামো তথা সামাজিক অবস্থানের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে। যারা এতদিন জমিদারি প্রথা ভোগ করছিলেন অন্যকে শোষণ এর মাধ্যমে ঠাটবাট বজায় রেখে, মধ্যস্বত্বভোগীলোপ আইনের ফলে এদের অবস্থান তলানীতে এসে ঠেকে। বংশ এবং বিন্দু কৌলিন্যের মর্যাদা মুছে গিয়ে সমাজের অপবর্ণী এবং অপবর্ণীদের সঙ্গে একই পর্জিতে নেমে এসে জীবন ধারণ করতে হয়। ‘বড় বাড়ি’-র ‘বড় বাড়ইয়া’ বলে খ্যাত সেসব বাসিন্দাদের এতদিনকার ‘দোল-দুগাচোছব-মোছবের’ দীয়াতং ভূজ্যতাং-এর দেড়শ বছরের রীতি একদিন দীনতায় এসে ঠেকেছিল। একসময় যারা পারিবারিক পরম্পরায় পিছারার খালের জনবসতির পত্তনদার ছিলেন, তালুকদারি ব্যবসার প্রহর শেষে দেশভাগের প্রেক্ষিতে তাদেরই একে একে বাস্তব ত্যাগ করতে হয়েছিল। এই যন্ত্রণার বুকভরা আর্তি দেশভাগের বিষাদময় প্রাপ্তি।

আমরা লিখিত ঘটনার পরম্পরাকে শুধুমাত্র ইতিহাসে পাঠ করি কিন্তু পাশাপাশি এমন অনেক কিছুই ঘটে চলে আমাদের অন্তর্জগতে তথা অন্তর্ভাববে, ইতিহাসে তার ব্যাখ্যা মেলে না যদিও তা অপ্রকাশিত চরম সত্য। কথাকারের ভাবনায় তা স্পষ্ট:

‘লোকেরা শুধু গোদা কথায় দেশভাগ আর তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে। সেই ব্যাখ্যাই ইতিহাস হয় কিন্তু আমাদের অনুভবের দুঃখের স্থান সে ইতিহাসে কোথায়?’^১

দেশভাগের বহুমুখী প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ করি বিবিধ চিন্তন-মননে প্রত্যয়ী মানুষের ক্ষেত্রে। যারা ধর্মীয়

পরিচয় ভুলে ভাষিক তথা সাংস্কৃতিক সূত্রে বাঙালির উত্তরাধিকার বহন করে নিতে চেয়েছিল উভয় ধর্মের সেইসব ব্যক্তির অর্জনে শুধু হতাশাই জুটেছিল। উভয় ধর্মের উচ্চবর্গের কিছু ব্যক্তি যারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন, তাদের কারও ক্ষেত্রে স্বপ্নের ফসল ফলেছে আবার কারো ক্ষেত্রে অঙ্কুরেই তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জেরে যাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি সেইসব শ্রমজীবী মানুষের ক্ষেত্রে দেশভাগ শুধু স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের আরো বেশি করে লাগামহীন হতাশা এবং অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল।

আখ্যানকার যেভাবে তাঁর বর্ণনায় পিছারার খালকে কেন্দ্র করে সমাজের একটি অংশের জনবসতির উত্থান-পতনের, তাদের সংস্কৃতি-কৃষ্টির পরিচয় দেন; ঠিক তার পাশাপাশি ক্রান্তিকালীন সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বক্ষে জন্ম নেওয়া সাম্প্রদায়িক মৌলবাদের মদতপুষ্ট ঘটনাবলী কীভাবে দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের ভিতকে টলিয়ে দিয়ে বন্ধুত্বের পরম্পরাকে শত্রুতায় বদলে দেয়, তার কার্যকারণ সূত্র ব্যাখ্যা করেছেন সাবলীল ভঙ্গিতে। এ প্রসঙ্গে আখ্যানে উল্লিখিত গাজির ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেছেন:

‘পিছারার খালের ঐ অঞ্চলের বিনষ্ট হওয়ার পেছনে দাঙ্গা, লুঠ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ব্যাপারের কোনও ভূমিকা ছিলনা। ছিল এইসব সংঘটনের বিতীক্ষিকা। গাজির কাজটি এ ব্যাপারে একদল স্বার্থান্বেষীর কাজেই লেগেছিল শুধু। আতঙ্কের কারণে দেশ ছেড়ে সবাই তখন পলায়মান। তাদের মনে ভীতি শুধু প্রাণের জন্যে নয়, যদি মেয়েদের বেইজ্জত হতে হয়।... পঞ্চাশ একান্নর দাঙ্গাই এখানে এক বীভৎস কাঁপন ধরিয়ে দিলে। প্রায় পাঁচশ বছরের পুরোনো সামাজিক ভিত্তি ফাটল ধরল। এতকাল

ভেদ-বিভেদ নিয়ে আমরা একটা বিকাশের স্তরে ছিলাম। হয়তো সেটা একটা সময় স্বাভাবিকক্রমে সাম্যে আসতেও পারত। কিন্তু দেশভাগের দুর্মর প্রহারে, তা স্তব্ধ হয়ে গেল।^{১৮}

দেশভাগ-দেশত্যাগের মধ্যে যতোটা ঘটনার ঘটমানতা কাজ করে তার চেয়েও বেশি উৎক্রান্তিময় মনের প্রতিটি মুহূর্তে কাজ করে সেসব ঘটনার বিতীষিকা। লেখক গাজির ঘটনার উল্লেখ করে বলেন তার বাবার সাথে গাজির গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল, দেশত্যাগের সময় সেই রাতে হাজারো টর্চের আলোয় ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি সহযোগে তাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই সে সংকটমুহূর্তে শুধুমাত্র লেখকের বাবা ছাড়া কারো পক্ষেই গাজির এই কর্মকাণ্ডের পেছনে যে কোনো সুউদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকতে পারে অর্থাৎ তারা সাহায্যের জন্যে এসেছিল, একথা কারো মনেই স্থান পায়নি। এ ঘটনা তাদের আজন্ম ভূমি-সংলগ্নতাকে শিথিল করে দিয়েছিল। আমরা দেখি লেখক এই ঘটনার প্রত্যক্ষতাকে ছাড়িয়ে এই সামাজিক মাৎস্যন্যায়ের আরো গভীরে ঢুকে যান এবং সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের সামন্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি বলে দাবি করেন।

‘বাবা গাজির আন্তরিকতায় এবং সদিচ্ছায় সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তথাপি তাঁর অহমিকায় আঘাত লেগেছিল। একদিন যাদের রক্ষা করেছেন, শাসন করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন, আজ যদি তাদেরই ভরসায় প্রাণ, মান, ইজ্জত রক্ষা করার কথা ভাবতে হয় তবে তার থেকে অসম্মানের আর কিবা থাকে।...

সবাই সামন্ত সংস্কৃতির মানুষ। অতএব কি মুসলমান, কি নমস্কন্দ সকলকেই উচ্চবর্ণীয় হিন্দুসমাজ সমবিচারে নিয়েছিল। আমাদের ওখানের মুসলমান

এবং নিম্নবর্ণীয় মানুষেরা উচ্চবর্ণীয়দের কাছে কোনো দিনই ভাল ব্যবহার পায়নি।^{১৯}

লেখক এই সামাজিক সংঘাতের যে কারণগুলো উল্লেখ করেন তার সূত্রগুলো ইতিহাস সমর্থিত। আমরা নানা সময়ে দেখেছি যখন সমাজের একশ্রেণি কৌলিন্য, আজ্ঞা ও নিষেধাজ্ঞার প্রাচীর গড়ে অন্য বর্গকে শোষণ করতে উদ্যত হয়েছে তখনই সেই সামাজিক গঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে অপর বর্গ অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। দেশভাগের প্রাক্কালে হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতার দুর্বলতাকে অনুঘটকের মতো কাজে লাগিয়েছিল শাসক শক্তি দেশকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ধর্মীয় সাম্যের মাদকতাটুকু ছাড়া অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। তবে দেশভাগকেন্দ্রিক এই আখ্যানিটিতে লেখক স্মৃতিকথা থেকে এমন কিছু ব্যক্তির পরিচয়কে তুলে ধরেন যাদের ব্যক্তি-পরিচয়ের নিরিখে উঠে আসে ক্রান্তিকালীন সময়ের স্বপ্ন-নির্মাণের কথা, আবার কিছু কিছু ঘটনাকে তাঁর মনে হয় এইসব অনুদার ব্যবহার বা ঔদাসীন্য পুরোটা না হলেও অনেকটাই এই সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে ত্বরান্বিত করেছে। লেখকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল তাঁর দাদীআম্মার কথা। তাঁর স্মৃতিকথা থেকেই জানা যায় তাঁর বাবার মাত্রাতিরিক্ত দাদার উপর নির্ভরশীলতা এবং জ্যাঠামশাই এর মতো পরিবারের কর্তা ব্যক্তিদের উদাসীনতায় তাদের পড়াশোনার প্রাথমিক পাঠটুকুর প্রয়োজনীয়তা সেদিন কেউ অনুভব করেননি; যে প্রয়োজনীয়তাটুকু অনুভব করেছিলেন গ্রামের নিরক্ষর এক মুসলমান নারী। যার ‘পরণ-কথা’-য় উঠে আসে এক জাতিসত্তার ভাসমান জীবনের পাঁচালি কথা। সেই প্রগাঢ় কথনের সূত্র ধরেই উঠে আসে ইতিহাসের কেতাবি ব্যাখ্যার অন্তঃসারশূন্যতার কথাও। আর সেসঙ্গে উঠে আসে দেশত্যাগ মানেই শেকড় ছিঁড়ে যাওয়া-ইতিহাস

হারিয়ে যাওয়ার ছিন্ন সময়ের কথা। দাদীআম্মা চরিত্রটি সেই কথকসত্তা যার এক বুক অভিমানে সঞ্চিত থাকে উনূল জীবনের কথকতা, সাম্প্রদায়িক জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে জীবনের মহামিলনের কথা। লেখকের সেই যাপিত জীবনের শূন্যতায় দাদীআম্মার উপস্থিতি ছিল গভীর উষ্ণতায় মোড়া।

‘এরকম বিন্যাসে দাদীআম্মার কথন। বুড়ি পিসিমাদের ব্রতকথার কিলিবিলি বাওনজির গল্পের, তাদের স্বপ্ন দেখার এবং স্বপ্ন নষ্ট হওয়ার এক অলিখিত প্রতিবিনির্মাণ পাই যেন দাদীআম্মার কথনে। বুড়ির তহজিব তমুদ্দুন বড় গভীরে প্রোথিত। দাদীআম্মার মানস জগত আমার বুড়ি পিসিমাদের আচরিত পার্বণের তথা আকাজ্জার জগত থেকে যেন অনেক প্রগাঢ়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই একটা মিল সেখানে পাই।’^{১০}

এই দাদীআম্মার প্রচেষ্টাতেই লেখকের প্রাথমিক পড়াশোনার ব্যবস্থা হয়েছিল।

আখ্যানের সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে আরেকটি চরিত্র ‘জ্যাঠামশাই’-এর কথা। যেহেতু স্মৃতিকথাই লিখেছেন তাই লেখায় নির্দিধায় তার চোখে দেখা চরিত্রগুলোকে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ডে রেখেই বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। ‘জ্যাঠামশাই’ চরিত্রটির মাধ্যমে তৎকালীন প্রবীণ মনোভাবাপন্ন মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কর্তব্যাক্তির অধীনস্থ থাকা সংসারে আর্থিক থেকে পারিবারিক সমস্ত ক্ষেত্রেই গোপন রাশিটি সেই কর্তব্যাক্তির হাতেই থাকে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও তারই থাকে। কথক চরিত্রের বিবৃতিতেই আমরা লক্ষ করেছি কীভাবে পরিবারের আর্থিক ভিতটি যেভাবে ক্রমশ দিনের-পর-দিন ভেঙে পড়ছিল এবং সেসব মুহূর্তে জ্যাঠামশাইয়ের গৃহীত সিদ্ধান্ত শেষকথা রূপে গণ্য হয়েছে। কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেনি। তারপরেও ব্যক্তিটির সামান্যতম উদার মানসিকতাকে

কীভাবে পরিবারের প্রতিটি সদস্য মর্যাদার চোখেই দেখেছে তাও লেখক আমাদের দেখিয়েছেন। তুখোড় বুদ্ধি এবং ধীমত্তার সঙ্গে কীভাবে প্রতিটি জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয় তা জ্যাঠামশাই চরিত্রটির অন্যতম গুণ। পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত দায়সারা গোছের মনোভাব নিয়েও এই প্রবীণ ব্যক্তিটি পরিবারের তথা সমাজের সকল স্তরে শীর্ষের অবস্থানটিকে ধরে রাখতে সক্ষম হন নিজস্ব কর্তৃত্ব এবং কূটবুদ্ধির জোরে। তবে এই লাগামহীন কর্তৃত্ব যে সামাজিক বৈষম্যের পিরামিড তৈরি করে ভেদাভেদের রেখাটিকে আরও শক্ত করে ছিল এবং একদিন ক্ষমতার মেরুকরণের চিত্রটি পাল্টে গেলে সেই পিছিয়ে পড়া শক্তিই ক্ষমতার বাহু বিস্তার করে এগিয়ে এসেছিল, কথকের স্বরে সেই শাপমোচনের বিষয়টিও নানা সূত্রে উঠে এসেছে :

‘উৎসবের স্মৃতি, ভালোবাসার, প্রাচুর্যের এবং সামাজিক সুস্থিতিজনিত আনন্দের স্মৃতিগুলো যদি জীবনের ধ্রুবপদ হয় তবে তখনকার বীভৎসতা ধ্বংস অবিশ্বাস এবং রক্তের স্মৃতিও কি ধ্রুবপদ নয়? ... এমন কি সে সময়কার নানাবিধ অসম্মানকর সামাজিক আচরণ যা তখন প্রতিমুহূর্তে দংশন করে বলত,- এদেশটা তোমাদের আর এখন নয়। তোমরা এবার চলে যাও এখন থেকে- সেসবও আজ ধ্রুবপদ বলে যেন মনে হয়। যেন সেসবও স্বাভাবিক নিবন্ধেই এসেছিল। সেসব আসার কার্যকারণ ছিল বলেই।

বাপ-পিতামো এই ভূমির আবাদকালে যে সহজতায় আবাদকারী মানুষদের মধ্যে একাত্ম ছিলেন, এক সময়ের সেই অবস্থান থেকে সরে গিয়ে তারা আবাদি ভূমির মালিক হলেন। ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছানোর পর তারা যে সামাজিক অন্যায় পুরুষানুক্রমে আবাদকারীদের বংশধরদের উপর করেছেন, আমরা ঐ পিছারার খালের সোঁতা বিলুপ্ত হবার সময় থেকে তার ফল ভোগ করেছি। এরকম

দায়ভাগ আমাদের হয়তো বহু বহু যুগ ধরে বহন করতে হবে।... সেইসব অন্যায়ের পরম্পরা তো আমাদেরকেও অবশ্যই বহন করতে হবে। তার অংশী যে আমি নিজেও তা জ্ঞানে হোক অথবা অজ্ঞানে।... এক্ষেত্রে পরম্পরা লব্ধ আচরণের দায় আমরা বহন করছি যা সাম্প্রদায়িকতা নামক এক পিশাচযজ্ঞের ফল হিসেবে সম্প্রদায়গতভাবে আমাদের ওই পিছারার খালে চৌহদ্দি থেকে উচ্ছেদ করে এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যৎ-এ নিষ্ক্ষেপ করল।”^{১১}

সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের ফসল এই চরিত্রদের এমত আচরণের ব্যক্তিক দায় কার ওপর বর্তায়? তবুও এই পিসিমারা কিন্তু আজীবন স্বপ্ন লালন করে গেছেন মনের কোণের অনড় প্রত্যয় থেকে :

‘বোজজনি বৌ, কাইল রান্তিরে সপপন দ্যাখলাম। দেখলাম কি হিন্দুস্তান পাকিস্তান বেয়াক ভাগাভাগি মিডইয়া গেছে। বেয়াক কিছুই আবার আগের ল্যাহান, গোলায় ধান, পুহইরে মাছ, গাছে ফল ফলাদি, কদম আলি আবার আগের ল্যাহান খাডি দুদ দেওয়া আরম্ভ করছে। কোনো দিকেই কোনো উদ্বেগ নাই।’^{১২}

ক্ষমতাভোগীদের কাছে যখন উষ্ণ জীবনই ঘটনাচক্রে শাসনের উল্টোরথে দুর্বিষহভাবে অভ্যাসে পরিণত হয় তখন তাদের মধ্যেও অসহায়ের প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে। এই ভয়ঙ্কর সত্যটিকে লেখক দেখিয়েছেন ‘হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগী উচ্চবর্ণীয় মানুষের’ প্রতিনিধিমূলক চরিত্র জ্যাঠামশাইয়ের মাধ্যমে। মানসিকভাবে স্বভূমে পরবাসী হয়ে বেঁচে থাকার হীনমন্যতা থেকেই তাদের মনে এভাবে প্রতিশোধের আশুর্ন জেগে উঠেছে। যদিও তা গ্রামীণ রাজনীতিরই অঙ্গ তবুও তাতে জাতীয় রাজনীতির প্রচ্ছায়া স্পষ্টই প্রতিফলিত। তাই জ্যাঠামশাইয়ের মুখে বলতে শোনা যায় :

‘আমি জানি দেশের অবস্থা কী এবং বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ যে কী তাও বেশ ভালো করেই বুঝে নিয়েছি। ... তবে আমার উদ্দেশ্য এই যে অন্যভাবে যখন পারছি না তখন বুদ্ধির জোরে যতটা পারি এদের সর্বনাশ করে যাব।’^{১৩}

এরই প্রেক্ষিতে সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় সৌমিত্র দস্তিদারের লেখা প্রবন্ধে বিবৃত ঘটনায়। বিভিন্ন উৎসবে সম্মিলিত আনন্দ প্রকাশের প্রসঙ্গে বলেন যে রহিম একদিন মাছ এনে মা ঠাকরণের পায়ের কাছে রেখে দিত আর মা ঠাকরণও রহিমের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অবেলায় নাইতে না যাওয়ার কর্তব্যকর্মে অবিচল থাকতে পারতেন ‘সেই রহিম যখন মাছের ভাগ চাইল তখন বিরোধ তো বাধবেই। মাছ খাওয়াটায় আমার চিরকালের অধিকার প্রাপ্য। অন্য কিছু হলে সংঘাত হবেই।’^{১৪}

দেশভাগ-দেশত্যাগকেন্দ্রিক লেখা মানেই যে শুধু রাজনৈতিক হর্তা-কর্তা ব্যক্তিদের ছুঁতে নেওয়া সিদ্ধান্তের নিষ্প্রাণ মানচিত্রে টেনে দেওয়া লালদাগ নিয়ে বিস্তর বাগবিতণ্ডা নয়, পক্ষ-প্রতিপক্ষের জনমত বিশ্লেষণই নয়, পূর্বজন্মের বুক চাপড়ানো হা-ছতাশ কিংবা নবীন প্রজন্মের অসম্ভব রকমের নির্বাক উদাসীনতার সরলীকৃত ব্যাখ্যাও নয়। দেশভাগের সাহিত্য মানেই কিছু অবসিত স্মৃতির গানের মহড়া যা ছিঁড়ে যাওয়া সুরভ্রষ্ট মনে বাজতে থাকে। দেশভাগের স্মৃতি মানে আত্মসমীক্ষার পরতে পরতে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে ইতিহাসের তথা সময়ের সখাত-সলিলে ডুবে গিয়ে আত্মপ্রক্ষেপের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। দেশভাগের বলী হয় উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গীয়দের নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারক লোকায়ত সংস্কৃতির ধারাটি যা কিনা একটি দেশের সাংস্কৃতিক তথা কৃষ্টির পরম্পরাকে বহন করে চলে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনে মোল্লাতন্ত্রের হাত শক্ত করতে

গিয়ে ফলুধারার চোরাবালিতে বিলুপ্তির পথে চলে যায় বাঙালির আবহমানকাল থেকে চলে আসা জারি-সারি-মারফতি-রামযাত্রা-কিসসা ইত্যাদি লোকরঞ্জক সংস্কৃতির ধারা। তুর্কি আমলে যা শুধুমাত্র ধর্মান্তরকরণ এবং নিছক নিষ্পেষিতদের আশ্রয়দানেই সীমাবদ্ধ ছিল, জঙ্গী আমলে তাই সাংস্কৃতিক বিভাজনে সচেষ্টিত হয়। জঙ্গিবাদের আমল পেরিয়ে যখন সেখানকার বাঙালি স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান তৎপর হয়ে উঠেছিল সেই মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে কথকের ঠিকানা তখন ভারতবর্ষে।

দেশভাগের কথকতা করতে গিয়ে লেখক আসলে জীবনের এক বিশেষ প্রহরের জবানবন্দি দিয়ে যান। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তই যেখানে সম্ভাব্য সময়ের দলিল নির্মাণে যোগ্য উপকরণ তখন লেখককেও এই আক্ষেপই করতে হয় :

‘কিন্তু এই স্থানের অবক্ষয় এবং তজ্জনিত সন্তাপের কার্যকারণ সূত্র এত জটিল যে খুব সাধারণ রেখায় তাকে অবয়বে আনা যায় না। এই অবক্ষয়ের কোনও বিধ্বংসী মাতৃবর্ণ নেই, নেই কোনো ধ্রুপদী সুর। কিংবা কোনো স্বাভাবিক গ্রামীণ লোক-পরম্পরায়, ছন্দে বা পটের চিত্রেও তা এতাবৎ কোনও পটুয়া, ভাটিয়াল অথবা ভাওয়াইয়া রমণী বা পুরুষের কোনও রোদসী চিত্র বা সুর সৃষ্টি করেছেন, এরকম অভিজ্ঞতাও আমার নেই। এ এক অভিশাপ মুখর সময় সম্ভবত, ... এ যে স্বদেহ কণ্ঠয়ন করে পায়ের আঙ্গুল থেকে শুরু করে স্বদেহ ভক্ষণের চিত্র। এ নিয়ে কিছু সৃজন করাতো অবক্ষয় নিয়ে নির্মাণ। অবক্ষয়ের রূপকল্প কি জীবনধর্মী শিল্পীরা করতে পারেন?’^{১৫}

দেশভাগজনিত বাস্তবতার আরেকটি চরম সত্য কিন্তু নারী নিগ্রহ। যা মোটামুটিভাবে বাস্তব ছেড়ে পরবাসী হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে

এ নিগ্রহ কোনো কাঁটাতারের সীমানা মানেনি। আমরা দেশভাগ এবং দেশভাগোত্তর সময়ে দেখেছি যেমন বাস্তবীভেতে ঘরের মেয়েদের লুপ্তিত লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে গৃহস্বামীরা অনেকেই রাতের অন্ধকারে ভিটে ত্যাগ করেছেন, আবার উদ্বাস্তু হয়ে আসা মেয়েদেরও ক্যাম্পের অনিশ্চিত জীবন, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের মৌলিক দাবি পূরণের শর্তও তাদের বেআব্রু করেছে।

দীর্ঘ ছেচল্লিশ পরিচ্ছেদে তিন শতাধিক পৃষ্ঠাজুড়ে লেখক তার স্মৃতিচারণায় তুলে এনেছেন জীবনের প্রথমার্ধের দুঃখ-সুখ-প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মুহূর্তগুলোকে। আখ্যান যত এগিয়েছে রাজনৈতিক সালতামামির হিসেবে পারিবারিক তথা সামাজিক ঘটনার বিস্তারে কথক তথা লেখক ও তাঁর পিছারার খালের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে বিনি সুতোর টান তার বাঁধন আপাত শিথিল করে বাস্তবতাকে মূল্য দিয়ে দেশ ছেড়েছেন। কিন্তু মনের বাঁধনকে আজীবন পৃথক করতে পারেননি। তাই শুরুতেই পিছারার খাল, বড় খাল এবং তার তীরস্থ মহাবক্ষকে ঘিরে নির্মিত বিশ্বাসে যে স্মৃতির নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছিলেন শেষ মুহূর্তেও অহল্যার পাষণ মুক্তির মতো উত্তর প্রজন্মের উপস্থিতিতেই ইতি টেনেছেন এক সম্ভাব্য স্বপ্নের নির্মাণে:

‘এই বিষণ্ণ ব্রতকথা যদিও ব্যক্তিক পতনের কথায় অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু এই বিষাদবক্ষ এবং বিষাদিনী নদীর সন্তানেরা সবাই তার অংশী। আমি শুধু কথক মাত্র। এই ব্রতকথা শেষ হয়েও শেষ হবে না যতদিন না এই মহা বিষাদবক্ষের অভিশাপ কাল শেষ হয়।

হয়তো একদিন আমাদের এই জনপদের কারোর কোনো উত্তর পুরুষ কোনদিন এই মহাবক্ষের যে শিকড়ে নৌকাগুলো বাঁধা ছিল তার সন্ধান পাবার জন্য আকুল হয়ে, খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে

পৌঁছোবে যেমন সগর রাজার উত্তর পুরুষেরা যুগ যুগ প্রচেষ্টার পর পৌঁছাতে পেরে শাপমুক্ত করেছিল তাদের পূর্বপুরুষদের, তেমনি। আর সেদিনই হয়তো এই অভিশাপের কাল শেষ হয়ে বুড়ি পিসিমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। বাস্তু ঠাকুর আবার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবেন এক জ্যোতির্ময় বিকাশে।^{১৬}

উপসংহার

সবশেষে এটুকু বলা যায় দেশভাগ নিয়ে লেখার এক সিংহভাগ জুড়ে সবসময় স্মৃতিই মূল কাণ্ডারী থাকবে। তবে সেসব লেখায় যুক্তিহীনতার ফলে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভাবজনিত যেসব অভিযোগ উঠে এসেছে তার দায় কিন্তু পাঠকের-বিশ্লেষকের-গবেষকের। যিনি ব্রতকথা বলতে বসেছেন অর্থাৎ লেখক বা কথক, তাঁর কাছে একমাত্র ভালো-মন্দের দগদগে স্মৃতিই সম্বল। সে যাই হোক, মিহির সেনগুপ্তের ‘বিষাদবৃক্ষ’ নামে যে গ্রন্থটি এ আলোচনার বিষয়, ব্যক্তিগত পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় মনে হয়েছে এতে বর্ণিত আখ্যান শুধু নস্টালজিয়ার পালে হাওয়া লাগিয়ে ভেসে যায় নি। বরং কুণ্ঠাহীনভাবেই সামাজিক ভেদাভেদ, সমাজের উত্থান-পতনের দৃশ্য তুলে ধরেছে। হয়তো এতে অনেকেই আবেগ খুঁজে পাবেন। আর সেটাই তো স্বাভাবিক। কেননা তিনি তো মনের অগোছালো কথাগুলোকে বিনিসুতোয় গেঁথে আখ্যানের আদল দিয়েছেন; যাতে চোখের জলের আবেগ ঢাকতে বৃষ্টিতে ভেজা চোখের বাস্তবতা যতটা সত্য ঠিক ততটাই সত্য কিন্তু চোখের জলে লুকিয়ে থাকা ভাবনার চিত্রায়ন। কথকের সেই স্মৃতিই তো আমাদের একমাত্র পথের ইশারা যা আমাদের অর্থাৎ উত্তর প্রজন্মের কাছে সেই ভালবাসার দেশটির অস্তিত্বকে উজ্জ্বল রাখবে।

তথ্যসূত্র :

১. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *ভিসা অফিসের সামনে*, বীরেন্দ্র সমগ্র, (প্রথম খণ্ড) অনুষ্টিপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৯৫
২. মিহির সেনগুপ্ত, *বিষাদবৃক্ষ*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৭
৩. সেমন্তী ঘোষ (সম্পা.), *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, গাণ্ডচিল, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৩
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০
৫. মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০
১৪. সৌমিত্র দস্তিদার, *দেশভাগের আখ্যান*, ‘এবং অন্যকথা’, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও জলধি হালদার (সম্পা.) দেশভাগ (একবিংশ বর্ষ) বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, ২০১৯, পৃ. ৫৯
১৫. মিহির সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০

দেশভাগের কবিতা : দাস্তা ও সম্প্রীতি প্রসঙ্গ

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

সারসংক্ষেপ

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক

ইংরেজি বিভাগ

শহীদ আবুল কাশেম কলেজ

কৈয়াবাজার, হরিণটানা, খুলনা

বাংলাদেশ

e-mail : bibhutim7@gmail.com

দেশভাগ তথা বাংলাভাগের কারণে বাঙালির ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্য তথা কবিতাও নতুন একটি মাত্রা পেয়েছে। মানুষের জীবনের ক্রান্তিকাল একটি সৃষ্টিকালও বটে। একদিকে ক্ষত ও ক্ষতির হাহাকার, আরেকদিকে সৃষ্টির যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণাবোধ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলা কবিতার একটি বিশেষ ধারা- যাকে বলা যেতে পারে বাংলাভাগের কবিতা, বৃহদার্থে দেশভাগের কবিতা। দেশভাগের পূর্বাপর যে-সকল কবির জীবনকাল, তাদের অনেকেই দেশভাগ নিয়ে কবিতা লিখেছেন। আবার বাংলাভাষায় এমন গুরুত্বপূর্ণ কবিও আছেন দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তারা এই বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন বলে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। আবার অর্বাচীন কবির নামও পাওয়া যায় যারা দেশভাগ নিয়ে কবিতা লিখেছেন। দেশভাগের প্রথম প্রজন্ম তো বটেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের কবিরাও দেশভাগ নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তিন প্রজন্মের কবির চোখে দেশভাগ দেখার পার্থক্যও রয়েছে। প্রথম প্রজন্ম দেশভাগের প্রত্যক্ষ শিকার এবং প্রত্যক্ষদষ্টা হলেও দ্বিতীয় প্রজন্মের দু-একজনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তৃতীয় প্রজন্মের কেউই প্রত্যক্ষদর্শী নন। প্রথম প্রজন্ম প্রায় অপসূয়মান। প্রথম প্রজন্মের অন্তরে যে দ্রোহ এবং দাহ, ক্ষোভ এবং কষ্ট, বিরাগ ও কাতরতা ছিল সময়ের সাথে সাথে, সঙ্গত কারণেই, দ্বিতীয় প্রজন্মে এসে সেগুলোর তীব্রতা কমে এসেছে। তৃতীয় প্রজন্মের কাছে দেশভাগ গল্প এবং অনেকটা রূপকথার মতোই। দেশভাগ বিষয়ক কবিতাগুলো ব্যবচ্ছেদ করলে যে প্রসঙ্গগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেগুলো হলো: (ক) সাম্প্রদায়িক দাস্তা, (খ) উদ্বাস্তুজীবনের দুঃখ-দুর্দশা, (গ) উদ্বাস্তুদের স্মৃতিকাতরতা, (ঘ) পাল্টাপাল্টি মান-অভিমান, (ঙ) দেশত্যাগীদের বিরত রাখার প্রয়াস, (চ) ভাঙা বাংলার ঐক্যসূত্র সন্ধান প্রভৃতি। দুঃখের বিষয়, দেশভাগ নিয়ে যে-সকল বাঙালি কবি কবিতা লিখেছেন তারা ধর্মীয় পরিচয়ে অধিকাংশই হিন্দু। এদের কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গীয় আবার কেউ কেউ পূর্ববঙ্গ থেকে দেশান্তরী। কেউ বা পূর্বাপর পূর্ববাংলারই। ভারত থেকে পাকিস্তানে কিংবা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে এসেছেন এমন কোনো মুসলিম কবির কবিতায় দেশভাগের উপস্থিতি তেমন চোখে পড়ে না। তারা যেন সচেতনভাবেই এই বিষয়টি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন। এমনকী পূর্ববাংলার মুসলিম কবিদের মধ্যেও একেবারেই অঙ্গুলিমেয় সংখ্যক কবি দেশভাগ নিয়ে কবিতা লিখেছেন। দেশভাগের কবিতায় বিধুত বিভিন্ন অনুসঙ্গ থেকে দাস্তা এবং সম্প্রীতি প্রসঙ্গের ওপর আলোকপাত করাই এই প্রবন্ধের প্রয়াস।

মূলশব্দ

দাস্কা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু, সীমান্ত, কাঁটাতার, সম্প্রীতি

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্পের মতো কবিতাও দেশভাগকে ধারণ করেছে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে। দেশভাগের কবিতাগুলো লেখা হয়েছে দেশভাগের পর পরই, কোনো কোনোটি আবার অনেক পরে। যারা এই কবিতাগুলো লিখেছেন তাদের অনেকেই দেশভাগের শিকার। কেউ কেউ দেশভাগের সময় অপরিণত বয়স্ক এবং অপরিণতমনস্ক ছিলেন। শিশুমনে দেশভাগের যে ক্ষত তৈরি হয়েছিল সময়ের সাথে সাথে তার বিস্তার ঘটেছিল তাদের চেতনায়। আবার কেউ কেউ দেশভাগে দেশহারা ও দিশেহারা হয়ে নতুন দেশে এসে বিদ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন ন্যূনতম একটু শেকড় গাড়ার লক্ষ্যে। একটু থিতু হয়ে বসার পর পরবাসী হয়ে স্বদেশিদের সঙ্গে অবস্থানগত নানান ব্যবধান, তাদের দেশহারানোর বেদনা ও ক্ষতকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই যন্ত্রণার অনুভূতি তীব্র থেকে ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ফলে কোনো কোনো কবিতার জন্ম হয়েছে কবির পরিণত মানসে, তাৎক্ষণিক আবেগ বা হাহাকার থেকে নয়। এসব আবেগ, হাহাকার, আর্তি আর ব্যক্তিগত থাকেনি, তা হয়ে উঠেছে দেশভাগের শিকার আপামর মানুষের, যাদের রোদন ও হাহাকার বংশানুক্রমে ধ্বনিত হতে থাকবে বহুদিন। দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায় এক পক্ষের হিংসা-ক্রোধের রোষানলে পড়ে আরেক পক্ষকে দেশ মাটি বাস্তুভিটে ছাড়তে হয়েছে সত্যি, আবার সেই বিরোধীপক্ষেরই কেউ কেউ তাদের রক্ষা করার মানসে প্রাণপাত করেছে, নির্ভরতা দিয়ে আগলে রাখতে চেষ্টা করেছে। যখন একেবারেই তা অসম্ভব হয়ে উঠেছে তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিরাপদে তাদের দেশত্যাগে সাহায্য করেছে। সীমান্তে দাঁড়িয়ে প্রিয়জন বিদায়ের দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করেছে। যারা

দেশ ছেড়ে গেছেন বিদায় বেলায় তাদের জলভরা চোখে বার বার ভেসে উঠেছে শুধুই সুখস্মৃতি ভালোলাগার অনুভূতি। সেই স্মৃতিকাতরতায় হিংসা-ঘৃণার জায়গাটি খুব কম। তবে দেশত্যাগের পূর্বে বা দেশত্যাগের প্রধান কারণ হিসেবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ স্মৃতি কখনও কখনও তাদের দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে ফিরেছে। দেশভাগের কারণে মানবতা লাঞ্ছিত হয়েছে, বিবেক অপসৃত হয়েছে, তারপরও কোথায় যেন সূক্ষ্ম একটি আলোকরেখা সততই মানুষের দিশারী হয়েছে, মানুষকে সম্পূর্ণরূপে অমানুষ হতে দেয়নি। দেশভাগের কবিতাগুলি দাঙ্গার পাশাপাশি সম্প্রীতির কথাও বলতে চেয়েছে।

উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ যথার্থ গভীরতা, ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব নিয়ে উপস্থাপিত হয়নি বলে এক ধরনের খেদ ও ক্ষোভের কথা শোনা যায়। আরও বলা হয়ে থাকে যে, বাংলা উপন্যাস এবং ছোটগল্প দেশভাগ বিষয়ে যতটা মুখর বাংলা কবিতা সেই তুলনায় অধিকতর নীরব। এই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। দেশভাগের পূর্বাপর জন্মগ্রহণকারী গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রগণ্য কোনো কোনো কবি দেশভাগ নিয়ে কবিতা লেখেননি, অন্তত অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। এঁদের মধ্যে আছেন অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭), অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-১৯৯০), আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), পূর্ণেন্দু পত্নী (১৯৩১-১৯৯৭), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪),

বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-১৯৭৯), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০, সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), বিনয় মজুমদার (১৯৩৪-২০০৬) প্রমুখ। এঁদের মধ্যে, বিশেষত ধর্মীয় পরিচয়ে যারা মুসলমান তাঁদের অন্তরে পাকিস্তান-চেতনা এত বেশি ক্রিয়াশীল ছিল যে দেশভাগকে তারা ইতিবাচক অর্থে দেখেছিলেন এবং সেই কারণে দেশভাগের অভিঘাত তাদেরকে তেমন বিচলিত করেনি। এমন কি পাকিস্তান-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা পাকিস্তান এবং জিন্নাহর প্রশস্তিমূলক কবিতা লিখেছেন। পাকিস্তানি ভাবাবেগে আক্রান্ত হবার কারণে বাঙালি মুসলমান কবিদের কবিতায় দেশভাগ প্রায় অনুপস্থিত। দেশভাগের পূর্বাপর জনগ্রহণকারী অগ্রগণ্য হিন্দু কবিদের অনেকেই কেন দেশভাগ নিয়ে কবিতা লেখেননি তারও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। অনেক কবির নীরবতা সত্ত্বেও বাংলা কবিতায় দেশভাগের উপস্থিতি স্নান হয়ে যায় নি। অনেকেই যে তাঁদের কবিতায় দেশভাগের অভিঘাতকে ধারণ করেছেন, দেশভাগের পূর্বাপর দাঙ্গা ও সম্প্রীতির ওপর আলোকপাত করেছেন এবং বাংলা কবিতাকে দেশভাগচর্চাহীনতার অভিযোগ থেকে দায়মুক্ত করেছেন, সেই সত্যটি প্রমাণ করাও এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

দেশভাগ বিষয়ক বাংলা কবিতা বা বাংলা কবিতায় দেশভাগের প্রভাব ও প্রসঙ্গ সম্পর্কিত আলোচনা বা গবেষণামূলক রচনার ব্যাপক তথ্য আমাদের কাছে নেই। অতিসম্প্রতি অংশুমান কর-সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের

কাব্যসাহিত্যে দেশভাগ সম্পর্কিত বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ ‘কাঁটাতার ও কবিতা’ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া দেশভাগ সংশ্লিষ্ট কবিতা নিয়ে শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘দেশভাগের কবিতা’ (২০১০) এবং বিভূতিভূষণ মণ্ডল সম্পাদিত ‘ভাঙা বাংলার পদাবলী’ (২০২০) নামে দুইটি কবিতা সংকলনের তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া সেমন্তী ঘোষ সম্পাদিত ‘দেশভাগ স্মৃতি আর স্তম্ভতা’ (২০০৯) গ্রন্থে এবং ‘এবং অন্যকথা’ (২০১৯) পত্রিকার দেশভাগ বিষয়ক সংখ্যায় দেশভাগ সংশ্লিষ্ট কিছু সংখ্যক কবিতা সংকলিত হয়েছে। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের ‘উজানতলির উপকথা’ (২০২০) উপন্যাসে দেশভাগ বিষয়ক কবিতার কিছু কিছু উদ্ধৃতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

পদ্ধতি

গবেষণাপত্রটিতে বর্ণনাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

সংকলনগ্রন্থ, কাব্যগ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা মিলিয়ে দেশভাগ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু কবিতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সে হিসেবে দেখা যায় যে, কোনো কোনো কবি দুইটি^১ বা ততোধিক^২ কবিতাও লিখেছেন দেশভাগের প্রতিক্রিয়া নিয়ে। এই তালিকায় বিখ্যাত অগ্রজ কবি যেমন আছেন তেমনি আছেন স্বল্পখ্যাত নতুন কবিও। শিল্পবিচারে সকল কবির কবিতা নিশ্চয়ই শিল্পোত্তীর্ণ বা সার্থক নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। তবে সকলেই সাধ্যমতো নিজের আবেগ, উচ্ছ্বাস, ক্ষোভ, অভিযোগ ও অভিমান প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। সেক্ষেত্রে তারা যে সফল তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। মূলত কবি নন, গদ্যশিল্পী, এমনও কেউ কেউ দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।^৩ দেশভাগ বিষয়ক সংগৃহীত কবিতাগুলো

পাঠ ও পর্যালোচনা করলে দেশভাগের পূর্বাপর ইতিহাসের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় ইতিহাসে না-লেখা এমন কিছু বিষয় যা মূলত কবির চোখেই দেখা সম্ভব। ইতিহাস দেখে ঘটে যাওয়া ঘটনা, কবি দেখেন সম্ভাব্য পরিণতি, পরবর্তীকালে যা ইতিহাসে লেখা হয়। তবে দেশভাগের কবিতাগুলিতে ইতিহাসের উপাদানই বেশি অর্থাৎ কবিতাগুলো মূলত ইতিহাসের ঘটনাশ্রয়ী। তার সাথে যুক্ত হয়েছে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং জীবনদর্শন।

সাতচল্লিশে দেশভাগের আগে থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ-হিন্দু এবং মুসলমান বিভিন্ন কারণে পরস্পরের প্রতি বিরূপ, সংশয়ী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এই সকল অসন্তোষের আঙুনে জ্বালানি যোগান দেয় বৃটিশ সরকার। তারপর কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ দাবি-অধিকারের দড়ি টানাটানি খেলায় এতটাই উন্মত্ত হয়ে ওঠে যে, প্রকাশ্যেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ছেচল্লিশের দাস্তা। বিশেষত বিহার এবং নোয়াখালীর দাস্তা দেশভাগের অপরিহার্যতাকে প্রকট করে তোলে। এই দাস্তা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, ভারত-পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের আর কোনো বিকল্প পথ খোলা রইল না। এই দাস্তা হিন্দু-মুসলমানকে কতখানি শত্রুভাবাপন্ন করে তুলেছিল, কত ধ্বংস এবং মৃত্যু ঘটিয়েছিল, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসী করে তুলেছিল সেসব চিত্র পাওয়া যায় বিভিন্ন কবিতায়। অথচ দীর্ঘকাল ধরে বংশ পরস্পরায় হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি নিয়ে। ভালোবাসার পাত্রটি বিষাক্ত হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক ভেদভঙ্গনে। নোয়াখালীতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পরবর্তীকালের হিংসা-বিদ্বেষের চিত্র পাওয়া যায় 'নোয়াখালী' নামক কবিতায়।

হিংস্র নোয়াখালী
সারা ভারতের মুখে মাখায়েছো ঘোর কলঙ্ক -কালি।
হাজারো বছর গলাগলি ধরি হিন্দু-মুসলমান,
কাকা, চাচা, চাচি, দাদা, নানা, নানী সম্ভাষ
প্রতিদান।
সুখে ও দুঃখে শ্মশানে ও গোরে ভোজে আর
জিয়াফতে
আমোদৎসবে আড়ৎ-এ মেলায় মিলিমিশি কত
মতে।
পুরুষ-পরস্পরায় যাহারা প্রতিবেশি আত্মীয়,
ধর্মে-সমাজে পৃথক হলেও দেহে-প্রাণে সব প্রিয়,
আল্লাহ থাকেন মসজিদে আর শ্রীহরি মন্দিরে
পূজা ও মানতে শিরনি দিয়েছে ধূলা মাখিয়াছে
শিরে-
তাহাদের মাঝে কেমনে আসিল হিংসার দুঃমন,
আত্মীয়তার অমৃত তাদের কে করিল লুপ্তন? ৪

বাংলা কবিতায় বিহারের দাস্তার চিত্র বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে বিহার এবং নোয়াখালীর দাস্তা ছিল মূলত একতরফা হামলা ও আক্রমণ। বিহারে হিন্দুর হাতে মুসলমান এবং নোয়াখালীতে মুসলমানের হাতে হিন্দু নিধনের যে ঘটনা ঘটেছিল তা গোটা ভারতবর্ষের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই দাস্তার স্রোত বিভিন্ন চেহারা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

দেশজুড়ে হলো হানাহানি, মারামারি-
একে একে সব বন্ধু-স্বজন ছেড়ে চলে গেল বাড়ি।
জ্বলিল আগুন দাউ দাউ দাউ, রক্ত-গঙ্গা চলে;
যারা না পালালো, প্রাণ দিল দলে দলে।
মানুষ সে হলো শয়তান যেন, বন্ধু- হইল খুনি
একই দুর্দশা বরণ করিল জ্ঞানী, ধনী, মানী, গুণী।
অজাতশত্রু কানুর পিতাও শেষে
ঘাতকের হাতে প্রাণ দিল নিজ দেশে।
সোনার স্বদেশ হইল শ্মশান, স্বর্গ নরক হোলো
প্রেত-পিশাচের প্রলয় নৃত্যে দেশ করে টলোমলো। ৫

দাঙ্গার তাণ্ডব থেকে পালিয়ে বাঁচতে গিয়েও ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছে অনেকে। চোখ বন্ধ করে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে দাঙ্গার ভয়াবহতা, হত্যা, ধ্বংস, লাশ, রক্ত। কিন্তু পালাতে গিয়েও বাধা আসে। সাময়িকভাবে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করতে হয় পলাতককে। প্রিয়জনের মৃত্যু দেখেও প্রতিবাদ তো দূরের কথা সামান্য অনুশোচনার শব্দ উচ্চারণের সাহস ও পরিস্থিতিও থাকে না। আত্মরক্ষার্থে পালাতে গিয়ে ধর্মিতা নিহত মেয়ের মাকে সাত্ত্বনা দিতে গিয়ে কোনো পিতা বলেন- ‘ধইর্যা নেওলা যমুনারে কুমইরে নিছে’।^৬ হয়তো কোনো পরিবারের কোনো মতে বেঁচে যাওয়া কিশোরটি ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে দেখছে তার আত্মজনের নিগ্রহ।

একটি কিশোর ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে দেখছিল
মা ও বোনের ধর্মিত হওয়া
তখনও একটু একটু নড়ছিল বাবার ধড়
একটি বউ দেখছিল তার এক বছরের বাচ্চাকে
একজন
ছুঁড়ে দিল খোড়ো ঘরের দাউ দাউ আগুনে
একের পর এক বৃকে উঠছে গাঁয়ের পরিচিত ছেলে
বুড়ো
তাকে অপলক দেখছে স্বামীর কাটামুগুর চোখ।^৭

একটি দাঙ্গা রাতারাতি বন্ধুকে শত্রু করে দিল। প্রতিবেশিকে প্রতিদ্বন্দ্বী করে দিল। মানুষকে অন্ধ-মূক ও বধির করে দিল। বিপদে সাহায্যের হাত বাড়ালো না কেউ, ঘরের আগুন নেভাতে এলো না কোনো বন্ধু, নিরাপত্তার বরাভয় নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো না কোনো সুহৃদ। স্বদেশ এবং স্বদেশের চিরচেনা মানুষগুলো কেন এমন হয়ে গেল?

কঠিন জন্মসি দেখে মায়ের আঁচলে
মুখ লুকায় শিশু।
একি ভ্রান্তি! একি অহোরাত্র শুধু অর্থহীন বিসর্জন

স্বদেশে আমার!

কোনোদিকে বোধনের চিহ্ন নেই, কোনো
ঘরে নেই আমন্ত্রণ;
কেউ এসে দাঁড়ায় না কারও পাশে।^৮

ধর্মের ভিত্তিতে, দ্বিজাতিতত্ত্বের নিরিখে হিন্দু-মুসলমানের জন্য আলাদা আলাদা ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে যে রক্ত এবং মৃত্যুর স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, সেই স্রোত মানুষের অন্তর্গত পুঞ্জীভূত ক্রোধ এবং জঞ্জালকে ভাসিয়ে দিতে পারে নি। ছেচল্লিশের দাঙ্গা থেকে কোনো শিক্ষাও নেয়নি ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ। ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেপ্টে আছে দাঙ্গার রক্ত আর কলঙ্কের দাগ।

ধর্মান্ধতা মানুষকে কীভাবে অমানুষ ক’রে তোলে,
একে অন্যের গলায় ছুরি চালায়, সন্ত্রম লুট করে
সস্তা পণ্যের মতো, ভাই ভায়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে
উল্লাসে ফেটে পড়ে, এ-কথা আমরা এই
উপমহাদেশের
অসহায় মানুষ জেনেছি চড়া দামের বিনিময়ে। দাঙ্গা
অসংখ্য মানুষের ঘর ভাঙার কলংকিত ইতিহাসই
শুধু নয়,
মানবতার কুৎসিত হস্তারকও বটে।^৯

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিরায়ত বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নীল বিষে জর্জরিত হয়েছে। ‘মন যখন মরুভূমি, সে দন্ধ দিন, দুপুর/আগুন, ঘরে আগুন দেহে আগুন প্রাণ চিতায়/জীবন ফণিমনসা, তার বিষ, বিষের কাঁটায় রক্ত’।^{১০} তখনও হয়তো সমন্বয়বাদীরা বলেন, দেশভাগ হলেও মানুষ ও মানুষের মন ভাগ হয়নি। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, প্রথমে মানুষ ভাগ হয়েছে। তারপর ভাগ হয়েছে তাদের মন। এবং সবশেষে ভাগ হয়েছে দেশ। ‘আমরা দেখলাম/প্রথমেই মানুষের রক্তে একটা নদী হলো। সেই নদীর দু’পারে দু’টো দেশ হলো’।^{১১} শুধু যে দু’টো দেশই

গড়ে উঠলো তাই নয়, সেই নদী দিয়ে প্রবাহিত হলো
লাশের ভেলা। নদীর পাড়ে জ্বলে উঠলো শ্মশানের
চিতা। সেই চিতা কেবল শ্মশানেই জ্বললো না 'এই
সমস্ত বুক অসংখ্য শ্মশান জ্বলে রাখে'।^{১২} শ্মশান
বিস্তৃত হতে থাকে নদীর পাড় জুড়ে। চিতার আগুন
ছড়িয়ে পড়তে থাকে এক বুক থেকে আরেক বুক।
তারপর ভাগাভাগির নির্মম খেলা। 'চিতাভস্ম থেকে
আঁতুড় পর্যন্ত লেগে আছে দেশভাগের ছোবল'।^{১৩} কাল
কেউটের মতো বিষাক্ত ছোবল হানে দেশভাগ। সেই
ছোবলে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয় দেশের শরীর। গণেশ
বসুর ভাষায় দেশভাগ 'হাস্রের দাঁতের জাজিম'।^{১৪}
গণেশ বসুর হাস্রের প্রসঙ্গ ধরেই যেন সাগর চক্রবর্তী
লিখেছেন, 'নখ আর দাঁতের ধারালো নদী হয়ে
দু'ভাগে ভাগ করে দিল তাবৎ মানুষকে'।^{১৫} সেই ভাগ
হয়ে যাওয়া মানুষগুলো যেন আর মানুষ রইল না।
তারা হয়ে গেল 'পচা গলা মাংস মানুষের'^{১৬} 'মুগ্ধহীন
.... হাড়ের ফ্রেম'^{১৭} আর মেয়েগুলো হয়ে গেল
'থেতলে যাওয়া উচ্ছিত পলাশ, খুবেড়ে পড়া চাঁদ'।^{১৮}
মেয়েদের ফুলের মতো কিংবা ফসলের মতো দলিত
মথিত হওয়ার আখ্যান উর্দু কবিতায়ও বর্ণিত হয়েছে
মর্মস্পর্শী ভাষায়। অমৃতা প্রীতমের 'ক্ষতচিহ্ন'^{১৯}
কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

হিন্দু-মুসলমান এক গাঁয়ে, এক দেশে একদা সহোদর
প্রতিম প্রতিবেশি ছিল। রাজনীতির জটিল কূটচালে
তাদের মধ্যে উঠলো দেয়াল। অন্তরে সৃষ্টি হলো
বিষের ধোঁয়া। অন্ধকার হয়ে গেল পরিপার্শ্ব। কেউ
কাউকে আর ভাই বলে দেখতে পেল না। বিষের
কালো ধোঁয়ায় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল, আবছা হয়ে
গেল ভাইয়ের মুখাচ্ছবি। এক ভাই আরেক ভাইকে
হনন করার উন্মত্ত বাসনায় হন্যে হয়ে উঠল।

মানুষ মেরেছি আমি- তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার

ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ ক'রে গেল,

একদিন দাস্কা থেমে গেল। দাস্কাই বিধ্বস্ত হলো গ্রাম,
জনপদ। চারিদিকে সুনসান নীরবতা। কে কোথায়
হারিয়ে গেল কে জানে? কেবল অবশিষ্ট স্মৃতির
মৃত মানুষের মতো পড়ে রইল। জীবনানন্দ দাশ
লিখেছেন-

হাত নেই- কোথাও মানুষ নেই; বাংলার লক্ষ গ্রাম
রাত্রি একদিন
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা, পটলচেরা
চোখের মানুষী
হতে পেরেছিল প্রায়; নিভে গেছে সব।
এইখানে নবান্নের স্রাব ওরা সেদিনও পেয়েছে;
নতুন চালের রসে রৌদ্রে কত কাক
এ পাড়ার বড় মেজো... ও ... পাড়ার দুলে
রোয়েদের
ডাকশীখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত
এখন টুশন্দ নেই সেইসব কাক পাখিদেরও;
মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন
নয়;^{২১}

দাস্কার ছুরি যে কেবল মানুষকে বিদ্ধ করল, আহত
ও নিহত করল তাই-ই নয়, সেই ছুরিটি র্যাডক্রিফের
হাতে গিয়ে শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করার মতো
দ্বিখণ্ডিত করলো অখণ্ড ভারত, মানচিত্র, মানুষের
অন্তরও। তারও চেয়ে বড়ো কথা সেই ছুরিতে টুকরো
হলো দেশমাতার শরীর।

যারা দেশকে মা বলে ডেকেছিল, তারা দেখছে সেই
মাকে

কুচিয়ে কুচিয়ে কাটছে র্যাডক্রিফের ছুরি
ফিন্‌কি দিয়ে উঠছে রক্ত, সেই রক্ত গায়ে মেখে
কত মানুষ

মেতে উঠেছে স্বাধীনতার উৎসবে^{২২}

স্বাধীনতা উৎসবের দীপাবলি রঙিন হয়ে উঠলো দেশজননীর সন্তানেরই রক্তে। কেন এলো খণ্ডিত স্বাধীনতা? স্বাধীনতা পেয়েও মানুষ কেন দেশ হারালো? কেন দেশভিখারি হলো? ‘সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া’- কেন সেই ঘরবাড়ি ভিটেমাটি আত্মীয় পরিজন হারালো? এর জন্যে কে দায়ী? শিশুদের শিশুসুলভ চাপল্য বা আচরণের জন্যে অনেক সময় পরিবারের বড়োরা তাদের তিরস্কার করেন, শাসন করেন, প্রহারও করেন। হয়তো শিশুটি একটি জলের গ্লাস ঢেলে দিল কিংবা খাবারের থালাটি ফেলে দিল কিংবা একটি কাঁচের পাত্র ভেঙে ফেলল। খুব সামান্যই ক্ষতি। এই সামান্য ক্ষতিটি বড়োরা করলেও কোনো দোষ হয় না, শিশুদের কিছু বলারও থাকে না, বরং ধমক দিয়ে তাদের চুপ করিয়ে দেয়া হয়। অথচ ভারতবর্ষের মতো বিশাল একটি দেশকে যে ‘বুড়ো’ এবং ‘ধেড়ে’ খোকারা ভেঙে ভাগ করে ফেলল চালাক ও লোভী বানরের পিঠে ভাগের মতো, ‘দেশচিত্র আরো কিছু ছোট হইলে আঁকার সুবিধা হইত’^{২০} বলে মানচিত্র ছিন্ন করলো, মানুষের শেকড় উপড়ে দিল, তাদের তো কেউ তিরস্কার করল না, শাস্তি দিল না। ইতিহাস কি শক্তিমান ক্ষমতাসীনের দাস? তাই তো কবির জিজ্ঞাসা :

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর’পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা!
ভারত ভেঙে ভাগ করো
তার বেলা?^{২৪}

দেশ ভেঙেছে, ঘর ভেঙেছে, পরিবার ভেঙেছে। এসব ভাঙনের ছবি দৃশ্যমান। ভাঙনের শব্দও গোপন থাকে না। কিন্তু আরেকটি গভীর ফাটল ও ভাঙনের দৃশ্য ও শব্দ অদেখা-অশ্রুত থেকে যায়।

দেশ তো কতই ভাঙে-
মন-ভাঙাভাঙির
খবর কেউ রাখে?^{২৫}

দেশভাগে রাতারাতি নিজের দেশটি পরদেশ হয়ে গেল সংখ্যালঘু মানুষের কাছে। পরদেশে থাকার অধিকার তাদের নেই। তারা তখন ভিনদেশি। ‘ওরা বলে, তুমি তো ভিনদেশি, তুমি আর/এইখানে থেকে না, তুমি যাও’।^{২৬} যারা চলে যেতে বলে তাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে পথ আগলে রাখে কিছু মানুষ। তারা যেন বলে, ‘যেতে আমি দিব না তোমায়’।^{২৭} হয়তো শুকুর আলীর মতো মাঝি, দেশভাগ কী ও কেন জানে না, প্রতিবেশিরা কেন চলে যাচ্ছে, তাও সে জানে না। তাইতো সরল সাধারণচিন্তে তার নৌকোয় আরোহী দেশত্যাগী পরিচিতজনকে ভারী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, ‘কুতায় চইলা যাবা, কও দাদাভাই;/আমরাতো তুমাগোরে কোনোদিন কিছু কই নাই/ তাহলে কোথায় যাবা’?^{২৮} হিন্দু-মুসলমান দুই সখি দীর্ঘকালের সুখ-দুঃখের সাথী, দিনযাপনে কখনও কোনোদিন সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান আসেনি, সেই সখি যখন স্বামী-সন্তানসহ দেশ ছেড়ে চলে যায় তখন আরেক সখি, সলির মা, নদীর ধারে দাঁড়িয়ে বলে, ‘যাচ্ছে কেন ঠাকুর জামাই, আমরা তো/মরে যাইনি যেমন ছিলাম/ তেমনি থাকবো’।^{২৯} দেশত্যাগী মানুষের পথ আগলে কি কেবল মানুষই দাঁড়িয়েছিল? দাঁড়িয়েছিল দিনযাপনের অনুশঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানান উপকরণ। উঠোন বাড়ির চারপাশে ভিড় করে থাকা তরলতা, ফসল, ডিঙিও যেন পায়ে পায়ে পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

লক্ষ্মীবিলাস ধান-
সোনা রঙ ধরবে বলে। তারও এক প্রশ্ন- যাবে কোথায়?
আরো দূরে ছলছলাৎ পাগলী নদীর ঢেউ

তার ওপরে ভেসে চলেছে পালতোলা ডিঙি
ময়ূরপঙ্খী
বলছে, আমাদের ফেলে কোথায় যাবে?
আমরা কি তোমার গত জন্মের বন্ধু?
এ জন্মের কেউ নই? স্বজন নই?°°

লোভী এবং স্বার্থপর কিছু মানুষের দূরভিসন্ধিমূলক
ষড়যন্ত্রের জন্যে সুধাংশুদের জীবন বিপন্ন,
নিরাপত্তাহীন। বৃক্ষলতা আকাশ প্রকৃতি হয়তো জীবন্ত
মানুষের মতো প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে পারে
না, কিন্তু তাদের শাস্ত সমাহিত অবস্থান যেন নীরব
চাহনির মতো আকৃতি জানায়। ‘আকাশের নীলিমা
এখনো/হয়নি ফেরারি, শুদ্ধাচারী গাছপালা/আজো
সবুজের/ পতাকা ওড়ায়, ভরা নদী/ কোমর বাঁকায়
তষী বেদিনীর মতো / এ পবিত্র মাটি ছেড়ে কখনো
কোথাও/ পরাজিত সৈনিকের মতো/সুধাংশু যাবে
না’।°° একই রকম বক্তব্য পাওয়া যায় জসীমউদ্দীনের
কবিতায়-

কার মায়া পেয়ে ছাড়িলে এদেশ, শস্যের থালাভরি,
অল্পপূর্ণা আজো যে জাগিছে তোমাদের কথা স্মরি।
আঁকা বাঁকা বাঁকা শত নদীপথে ডিঙি তরীর পাখি,
তোমাদের পিতামাতামহদের আদরিয়া বুকে রাখি;

--- --- --- --- ---
আজি কি তোমরা শুনিতে পাওনা সে নদীর কলগীতি
দেখিতে পাওনা চেউয়ের আখরে লিখিত মনের
প্রীতি?

হিন্দু-মুসলমানের এদেশ, এদেশের গাঁর কবি,
কত কাহিনীর সোনার সূত্রে গাঁথেছে সে রাঙাছবি।°°

দেশভাগ হলো। বাংলা ভাগ হলো। শরীরের
বিচ্ছিন্ন দু’টি অংশ যেন পরস্পর পরস্পরকে
হারানোর বেদনায় কাতর হলো। রাজনীতিবিদরা
দেশভাগ করলেন। বাংলা ভাগ করলেন। যা হয়তো
আর জোড়া লাগানো সম্ভব নয়। রাজনীতিকদের

কোনো অনুতাপ অনুশোচনা হলো না। বরং তাদের
স্বার্থোদ্ধারে তারা সফল এবং পরিতৃপ্ত। কিন্তু মানবিক
কিছু মানুষ যারা দেশভাগের ষড়যন্ত্রে ছিলেন না,
তাদের মতামতও কেউ চায়নি, তারা ভাঙা দেশকে
ভাঙা বাংলাকে চেতনা, ভাষা, সংস্কৃতি, স্মৃতি এবং
আকাশ-বাতাস-জল-মাটির বন্ধনে একসূত্রে গাঁথে
রাখতে চান। তাইতো তারা পরস্পরের চোখে
দেখেন একই চাহনি। তাদের মনে হয়, ‘দু’টুকরো
দেশ বাড়িয়ে আছে পরস্পরের দিকে তাদের তৃষ্ণার্ত
হাত’।°° দেশভাগ, বিশেষত বাংলা ভাগ বাঙালি
শিল্পস্রষ্টাদের এতটাই আলোড়িত এবং ক্ষুব্ধ করেছিল
যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কথাসাহিত্যিক হয়েও,
দেশভাগ নিয়ে গল্প লিখেও, তীব্র দহনে ক্ষোভে
দেশভাগের প্রতিবাদে ‘বাংলাভাঙার কবিতা’ নামে
একটি কবিতাও লিখেছিলেন।°° এই কবিতাটি মূলত
‘রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি তীব্র বিশেষদগার।
সমসাময়িক জাতীয় কংগ্রেসের এবং মুসলিম লীগের
শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতিনিধি নেহেরু বা জিন্নাদের
খামখেয়ালির ফলাফল হিসেবে রক্তাক্ত দেশভাগকে
মেনে নেননি মানিক’।°°

মাইরি বলছি কালীর দিব্যি, খোদার দোহাই,
আর মরা যায় না কিছুতেই।

তাই ঈশ্বর আল্লা নেতা লাটদের বাদ দিয়ে
এবার বাঁচতে চাই,

মানুষ নিয়ে মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই।

ঘর ভাগ হোক

ভাগ হতে দেব না দেহটা, প্রাণটা।°°

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে ভাঙতে দেবেন না।
বাংলা বাঙালির। তারপরও যদি বাংলা ভেঙে যায়ই
তাহলেও বাংলা নামক প্রাণটাকে কোনোমতেই ভাগ
হতে দেবেন না তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাগ
হয়েছেই। প্রাণটাও ভাগ হয়ে গেছে। বিভক্ত প্রাণ
কিংবা ভাঙাবুককে জোড়া লাগবার স্বপ্ন ভাসে কবি

বিভাস রায়চৌধুরীর কবিতায়: বুকের ভেতর আমি
আগলে/আগলে রাখি ভাঙা বুক/ভাঙা বাংলা জোড়া
লাগলে সেরে/ যাবে আমার অসুখ’।^{৩৭} দেশভাগের
বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় না থাকলেও
চেতনায় সৌহার্দ সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান ধ্বনিত হয়
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতায়—

আমরা এক বৃন্তে দুই ফুল, এক মাঠে দুই ফসল
আমাদের খাঁচার ভিতরে একই অচিন পাখির
আনাগোনা।
আমার দেবতার থানে তুমি বটের ঝুরিতে সুতো
বাঁধো
আমি তোমার পীরের দরগায় চেরাগ জ্বালি।
আমার স্তোত্রপাঠ তোমাকে ডাকে
তোমার আজান আমাকে খুঁজে বেড়ায়।^{৩৮}

নজরুলের কবিতার ‘মোরা একই বৃন্তে দুইটি কুসুম
হিন্দু-মুসলমান’ চরণটির কথাও মনে পড়ে যায়। পূর্ব
ও পশ্চিমের নানান অনুষ্ণের উল্লেখ করে অচিন্ত্য
কুমার সেনগুপ্ত অখণ্ড বাংলাকেই যেন একসূত্রে গেঁথে
রাখতে চান। কবির মোক্ষম উচ্চারণটি এরকম:

আমাদের এক সুখ এক কান্না এক পিপাসা
ভূগোলে ইতিহাসে আমরা এক
এক মন এক মানুষ এক মাটি এক মমতা।
পরস্পর আমরা পর নই।^{৩৯}

তারপরও সীমান্তের পাঁচিল মজবুত হতে থাকে।
কাঁটাতারের বেড়া বসে। কোথাও কোথাও কাঁটাতারসহ
পাঁচিল ক্রমশ উঁচু হতে থাকে। মানবতাবাদী মানুষের
কাছে এই পাঁচিল ও কাঁটাতার দূরত্ব বাড়াতে পারে
না।

তবে যত উঁচুই হোক তোমার টাওয়ার
সে ব্যর্থ বিদারণে আকাশের বিস্তার
মেঘের দেশে মেশে মানুষের স্মৃতি আর দীর্ঘশ্বাস
কাঁটাতার আর সায়ক সঙ্গিন ব্যর্থ পড়ে রয়

হৃদয়ের ইথারে ইথারে বিনিসুতোর মালা এক
নিরন্তর গাঁথা হয়ে যায়।^{৪০}

দু’পার বাংলার সেতুবন্ধনের উপকরণ প্রথমত প্রেম-
ভালোবাসা। কবি অনিল সরকার যেমনটি লেখেন,
‘ওপার পদ্মা/এপার গঙ্গা/মধ্যে করতল/সেতু বাঁধো
মৈত্রী সেতু/প্রেমের শতদল’।^{৪১} সেতু বন্ধনের আরও
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বাংলাভাষা ও সাহিত্য। বাঙালির
প্রধান দুই কবি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। ‘আমরা ভাষায়
এক’^{৪২} ‘আমাদের এক রবীন্দ্রনাথ এক নজরুল’^{৪৩}।
কিংবা ‘বিভেদের গাছ কেউ যদি পোঁতে/ টান মারো
তার মূলে/দুই বাংলাকে এক করে দাও/ রবীন্দ্র-
নজরুলে’।^{৪৪} আবার কেবল রবীন্দ্রনাথকে দিয়েও
সেতু বাঁধতে চান কবি রাণা রায়চৌধুরী: ‘পাখি
ওড়ে, কাঁটাতার মাইল মাইল ব্যাপী/ আকাশ এপারে
ওপারে/ নদী এপারে ওপারে/ মা এপারে ওপারে/
রবীন্দ্রনাথ দুই পারে সেতু’।^{৪৫} বাংলা সাহিত্যও হতে
পারে ভাঙা বাংলার ঐক্যসূত্রের মাধ্যম। ‘মঙ্গলপুঁথির
অক্ষরমালা/সুচারু হাতে লেখা বেছলা ভাসান আর
বারোমাস্যার গান/ কোনো সীমানায় ধরে রাখা যায়নি
অদৃশ্য হাতছানি/কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ভুসুকুর
পদাবলী হৃদয়ে ছড়ায়’।^{৪৬} কবি সিদ্ধেশ্বর সেন বলতে
চান বাংলার যেখানেই, যে-কোনো প্রান্তে কোনো
বাঙালির জন্ম হলেই তিনি বাঙালি, কোনো মতেই
সে ভিনদেশি নয়। বাঙালির কোনো ভেদাভেদ নেই।
কোনো পূর্ব-পশ্চিম নেই।

তবে কেন তুমি ভাবো ভেদাভেদ
পূর্ব বা পশ্চিম কোন্ বঙ্গ-
অলীক কুনাট্যে কেন, জল অচলের হাল, ভেদাভেদ,
জন্ম যদি তব বঙ্গে
যেখানেই থাকো তুমি, আত্মপরিচয় মনে রেখো
‘তিষ্ঠ ক্ষণকাল’।^{৪৭}

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ। পৃথিবীতে ধর্ম না থাকলে
হয়তো ভারতীয় উপমহাদেশে দেশভাগের মতো

মর্মান্তিক ঘটনা ঘটত না। তাই তো কবি ধর্মগ্রন্থের প্রাচীর সরিয়ে পরস্পরের বুক বুক মিশিয়ে এক হয়ে থাকতে চান। ‘বাইবেল কোরান বেদ মানিনা/ বুক বুক লেগে আছে তাই সুখ’^{৪৮} দু’পার বাংলা যেন একই ঘরের পাশাপাশি দু’টি কক্ষ। মাঝখানে কেবল একটি খিল আঁটা দরজা। খিলটি হতে পারে দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য। বাস্তব অথবা চেতনাগত। খিলটি খুলে দিলেই দু’পার বাংলার আকাশ বাতাস একাকার হয়ে যায়।

আমরা যেন বাংলাদেশের
চোখের দু’টি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে—
থাকুক গে পাহারা।
দুয়োরে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা।
ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা।^{৪৯}

দু’পার বাংলার মধ্যে ভাষা ও ভ্রাতৃত্বের ঐক্যসন্ধান করেছেন শক্তিপ্রদ ব্রহ্মচারী:

যে কেড়েছে বাস্তুভিটে, সে-ই কেড়েছে ভয়,
আকাশ জুড়ে লেখা আমার আত্মপরিচয়।
--- --- --- ---
এবার আমি পাঠ নিয়েছি আর কিছুতে নয়,
ভাষাবিহীন ভালোবাসার বিশ্ববিদ্যালয়।
বাংলা আমার আই ভাষা গো, বিশ্ব আমার ঠাই,
প্রফুল্ল ও ভৃগু আমার খুল্লতাত ভাই।^{৫০}

উপসংহার :

দেশভাগের কবিতা বাঙালি জীবনের এক নির্ধূর ক্রান্তিকালের দলিল। চরম দুঃসময়ের কথাচিত্র। রক্তাক্ত মানচিত্রের প্রতিচ্ছবি। রাজনৈতিক কূটচালে সম্প্রীতির সুনির্মল আকাশে সাম্প্রদায়িকতার কালো

মেঘ ঘনীভূত হয়, সন্দেহের বিদ্যুৎ চমকায়, ধ্বংসের বজ্রপাত নেমে আসে। পাশাপাশি কাছাকাছি থেকে বংশ পরস্পরায় বসবাস করে আসা হিন্দু-মুসলমান পরম বন্ধু থেকে চরম শত্রুতে পরিণত হয়। কলকাতা-বিহার-নোয়াখালী রঞ্জিত হয় দাঙ্গার রক্তপ্লাবনে। বিশ্বাসে ফাটল ধরে। সন্দেহ গভীর হয়। হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে একে অপরকে হত্যা করতে, নারীর চরম অসম্মান করতে, লুণ্ঠন-অগ্নিসংযোগ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। কেউ পালিয়ে বাঁচে। কেউ বেঘোরে প্রাণ হারায়। কিন্তু মেঘের আড়ালেও তো সূর্য থাকে। অমাবস্যার প্রগাঢ় অন্ধকারেও দূর আকাশে নক্ষত্রের আলো জ্বলে। তাইতো দেশভাগের কবিতা আলোচনা করলে দেখা যায় একটি সম্প্রদায় দাস্তা সৃষ্টি করেছে আবার দাস্তাকারী সম্প্রদায়ের একটি মানবিক অংশ নির্ভরতা দিয়েছে, সম্প্রীতির ভাঙা সেতুটি পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছে। একটি পর্যায়ে দেশভাগ তথা বাংলাভাগ যখন সত্যি সত্যি বাস্তব রূপটি পরিগ্রহ করেছে, কোনোভাবেই যেটিকে আর ঠেকানো সম্ভব নয়, তখন কিছু সংখ্যক শুভবাদী মানুষ যারা অখণ্ড বাঙালিসত্তায় বিশ্বাস করেন তারা ভাঙা দেশ ভাঙা বাংলাকে ভালোবাসা, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতির বন্ধনে একসূত্রে গেঁথে রাখতে চেয়েছেন। তাইতো দেখা যায় দাস্তাই শেষ কথা নয়, সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়াসও অপেক্ষা করে থাকে কোনো না কোনো ভাবে। দেশ ভাগের কবিতা, বিশেষত বাংলা কবিতায় দেশভাগ, দেশভাগের পূর্বাপর দাস্তা এবং সম্প্রীতির সূত্র সন্ধানের যে চিত্র উপস্থাপন করেছে তা যুগপৎ বেদনার এবং আনন্দের, হতাশার এবং আশাবাদের, ঘৃণার এবং ভালোবাসার। তবে শেষ পর্যন্ত মানুষই হলো শেষ কথা। তাইতো দাঙ্গার অভিশাপ পেরিয়ে বাঙালি কবিরা মানুষে মানুষে বিশেষত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের যে আশাবাদের স্বপ্নবীজ বপন করেছেন তা

দেশভাগের ক্ষত, যন্ত্রণা এবং ক্ষতিকে আদর্শগত এবং চেতনাগত ভাবে কিছুটা হলেও লাঘব করে দেয়।

তথ্যসূত্র :

১. বিভূতিভূষণ মণ্ডল (সম্পা), *ভাঙাবাংলার পদাবলী*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২০, গ্রন্থে অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গুণ, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, মহাদেব সাহা, রাণা চট্টোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ শামসুল হকের দুইটি করে কবিতা সংলিখিত হয়েছে।
২. প্রাগুক্ত, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর তিনটি এবং শঙ্খ ঘোষের পাঁচটি কবিতা সংকলিত হয়েছে।
৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রফুল্ল রায় দু'জনই মূলত গদ্যশিল্পী। তাঁরাও দেশভাগ নিয়ে কবিতা লিখেছেন।
৪. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, 'নোয়াখালী', বসুমতী, চৈত্র ১৩৫৩।
৫. সুনির্মল বসু, 'অভিমান', ভাঙাবাংলার পদাবলী, বিভূতিভূষণ মণ্ডল (সম্পা), কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ১৩৬-১৩৭
৬. সাগর চক্রবর্তী, 'রিফিউজি', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
৭. জলধি হলদার 'জেরা কিংবা সওয়াল', এবং অন্যকথা, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ৬১০-৬১১
৮. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'স্বদেশে আমার', *পাগলা ঘন্টি*, দে'জ, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৫২
৯. শামসুর রাহমান, 'মিহিরের উদ্দেশ্যে', শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪৭১
১০. মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা, হয় বাংলা', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত পৃ. ৯৫
১১. বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, 'ভাগের মা', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

১২. শুভ বসু, 'বাঙলাদেশ : নিজের সঙ্গে', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
১৩. সুনীল সোনা, 'ভাঙা সিংহাসন', এবং অন্যকথা, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৬০৫
১৪. গণেশ বসু, 'অমৃত আন্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
১৫. সাগর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
১৬. গণেশ বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. প্রাগুক্ত
১৯. অমতা প্রীতম, 'ক্ষতচিহ্ন', *শ্রেষ্ঠ রচনাসম্ভার*, অমিত সরকার (অনুদিত ও সম্পাদিত), মর্ডান কলাম, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১৮৮
কে আর বুঝবে তার সেই দুঃসহ যন্ত্রণা
যখন নিজেরই সত্তায়
লালন করতে হয়েছে রক্ত-মাংসের নিষ্ঠুর বর্বরতা।
আমি সেই অশুভ মুহূর্তের শিশু-
স্বাধীনতার পুষ্টিপত শাখাগুলো যখন মেলছিল
তাদের দীপ্ত কোরক।
২০. জীবনানন্দ দাশ, '১৯৪৬-৪৭', জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার, রণেশ দাশগুপ্ত (সম্পা), খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৩৮১, পৃ. ৪৫৫
২১. প্রাগুক্ত, ৪৫৬
২২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'সেই দিনটি', ভাঙা বাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
২৩. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
২৪. অন্নদাশঙ্কর রায়, 'খোকা ও খুকু', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
২৫. বেণু দত্তরায়, 'মন ভাঙার খবর', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
২৬. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'স্বদেশে আমার', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যেতে নাহি দিব', সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিতানি, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ১৩১
২৮. অসীম সাহা, 'উদ্বাস্তু ৪', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
২৯. পবিত্র মুখোপাধ্যায়, 'মানুষের গল্প', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
৩০. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'উদ্বাস্তু', ভাঙাবাংলা পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৩১. শামসুর রাহমান, 'সুধাংশু যাবেনা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১
৩২. জসীমউদ্দীন, 'বাস্তুত্যাগী', মাটির কান্না, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৪২
৩৩. তসলিমা নাসরিন, 'ভঙ্গ বঙ্গদেশ', ভাঙা বাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৩৪. মধুময় পাল, 'উত্তর-কথা', হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৪৪২
- লেখার নির্দিষ্ট তারিখ জানা সম্ভব হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কবিতাটি পাওয়া গিয়েছে একটি খাতায়। তারিখ ছিল না। হস্তাক্ষরের ভিত্তিতে বলা যায়, পরিণত বয়সের লেখা। কবিতার বিষয় থেকে লেখার কাল ১৯৪৫-১৯৪৬ অনুমান করা যায়।
৩৫. ড. শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী, দেশভাগের কবিতা, একুশশতক, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭
৩৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা ভাঙার কবিতা', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৩৭. বিভাস রায়চৌধুরী, 'ভাটিয়ালি', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৩৮. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'পূব-পশ্চিম', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৩৯. প্রাগুক্ত
৪০. তানভীর মোকাম্মেল, 'সীমান্তরেখা', বেহুলা বাংলা ও অন্যান্য কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৪১. অনিল সরকার, 'ভারত-বাংলাদেশ', (ব্যক্তিগত সংগ্রহ)
- ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী অনিল সরকারের সাথে বর্তমান প্রাবন্ধিকের সাক্ষাৎ ঘটে ত্রিপুরার সোসাইমুড়ি মেলার মাঠে 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব- ২০০৭'-এ। দু'পার বাংলার মিলনসেতু রচনার বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম নিয়ে কথা বলেন তিনি। এই কবিতাটি তারই উপহার।
৪২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'পূব-পশ্চিম', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৪৩. প্রাগুক্ত
৪৪. অপূর্ব দত্ত, 'দুই বাংলা', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৪৫. রাণা রায়চৌধুরী, 'এপার-ওপার', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
৪৬. কৃষ্ণ ধর, 'কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে', দেশ, ১৭ এপ্রিল ১৯৯৯
৪৭. সিদ্ধেশ্বর সেন, 'জন্ম যদি তব বঙ্গে', দেশ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০
৪৮. মোঃ নাহিদ সরদার, 'অমূলক', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
৪৯. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'পারাপার', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
৫০. শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, 'উদ্বাস্তুর ডায়েরি', ভাঙাবাংলার পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত নারী নাট্যকার রচিত নাটক : বিষয়-বৈচিত্র্য ও বিশ্লেষণ

সুমিত্রা বণিক

সারসংক্ষেপ

সুমিত্রা বণিক

পিএইচডি গবেষক

বাংলা বিভাগ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

e-mail : banikusmita2012@gmail.com

‘ভারতী’র পথচলা শুরু হয় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে। ঊনবিংশ শতকে নারী যখন বাংলা সাহিত্যের জগতে পা রাখল, তখন কবিতাই ছিল তার সহজতম প্রকাশ-মাধ্যম। পরে ষাট-সত্তরের দশকে, বিভিন্ন সাময়িকপত্রে গদ্যানুশীলনের মাধ্যমে নিজের ভাবনা, মানসিকতা, মতামত, কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধনের পথে তাঁরা অগ্রসর হন। এই সময় নারীশক্তির উত্থানে সবিশেষ ভূমিকা নিয়েছে যে পত্রিকাগুলো, ‘ভারতী’র স্থান তাদের মধ্যে ওপরের সারিতে। সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি বিভাগেই বহু নারী লেখকের রচনায় এই পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে বর্তমান প্রবন্ধে তাঁদের নাটকগুলোকে সারিবদ্ধ করে আলোচনা করা হয়েছে, বিষয়বস্তুর আলোকে তাঁদের মানসিকতা, ভাবনাচিন্তা, নিজস্বতার ধরনকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নাটক-রচনায় ‘ভারতী’ পত্রিকার নারী-লেখকদের অবদান সংখ্যায় স্বল্প হলেও বৈচিত্র্য এবং শৈলীতে তাঁরা পাঠকচিহ্নে যথেষ্ট ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এখানে মৌলিক নাটক লিখেছেন মোট চারজন; স্বর্ণকুমারী ব্যতীত বাকিদের নাটকের সংখ্যা খুব কম- মাত্র চারটি। তার মধ্যে রয়েছে একটি ঐতিহাসিক, একটি সামাজিক, একটি লৌকিকগল্পাশ্রয়ী এবং অপরটি রূপকথা-নির্ভর নাটক। তবে, পত্রিকায় নারীরচিত নাটকের এই সংখ্যালঘুতা পূরণ করেছেন একা স্বর্ণকুমারী দেবী। একটি নাট্যোপন্যাস, দুটি প্রহসন, একটি কাব্যনাটক ছাড়াও তিনি লিখেছেন অসংখ্য ছোট ছোট হেঁয়ালি-নাটক। এই নাটিকাগুলো বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং নির্মাণ-কুশলতায় স্বর্ণকুমারীর অনন্যতাকে পাঠক-সমাজের সম্মুখে তুলে ধরে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বাংলা নাটকের ইতিহাস চর্চার প্রথম দিকের গ্রন্থগুলোতে স্বর্ণকুমারী দেবীর নাটকের কোনো আলোচনাই পাওয়া যায় না।

মূলশব্দ

ভারতী পত্রিকা, নাটক, কাব্যনাটক, হেঁয়ালি, নাট্যোপন্যাস, ঐতিহাসিক নাটক

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতকের অপর নাম 'পত্র-পত্রিকার যুগ'। তাদের মধ্যে অধিকাংশই যদিও ছিল স্বল্পজীবী, কিন্তু দীর্ঘজীবী ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব-সমন্বিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। 'ভারতী' পত্রিকা (শ্রাবণ, ১২৮৪-কার্তিক, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ; ১৮৭৭-১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ) এদের মধ্যে অন্যতম। প্রধানত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে, রবীন্দ্রনাথসহ আরও অনেকের প্রচেষ্টায় ১৫ই শ্রাবণ, ১২৮৪ (২৯ জুলাই, ১৮৭৭) তারিখে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। দেশীয় সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ-মনস্কতা, সমকালীন আবহের রুচিশীল প্রতিফলন ও দেশীয় ভাবধারায় দেশে-বিদেশে প্রাপ্ত জ্ঞানের সুস্থ আলোচনাই ছিল এই পত্রিকার মূল লক্ষ্য। এই পত্রিকায় তৎকালীন প্রায় সব খ্যাতনামা লেখকের পাশাপাশি সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনায়াসবিচরণ করেছেন বহু নারী লেখক। তাঁদের লিখিত নাটক প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হবে। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের মতো নাট্যসাহিত্যেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে অলৌকিকতাই ছিল নাটকের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু সাহিত্য যেহেতু যুগের দাবি মিটিয়েই অমরত্ব লাভ করে, সেহেতু উনবিংশ শতকে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় যে সকল সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল, যেমন- বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, নারী-স্বাধীনতা বা স্ত্রী-শিক্ষার নানা সমস্যা, পুরুষের মদ্যপান, লাম্পাট্য ইত্যাদি অবলম্বনে এই সময়ে বহু নাটক রচিত হয়েছে। বিশেষ করে, স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন, ও তাদের পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে নানা মতভেদ, শিক্ষার মূল লক্ষ্য, প্রয়োজনীয়তা-অপ্রয়োজনীয়তা বিষয়ে নানা জনের নানা তর্কবিতর্ক ও মতামতে তৎকালীন সাহিত্য বা পত্রপত্রিকার কলেবর নিরন্তর বেড়েই চলেছিল। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো

তার প্রতিফলন পড়েছিল নাটকেও। নারীর উচ্চশিক্ষার কুফল-প্রদর্শনের জন্য এই সময় বহু নাটক ও প্রহসন রচিত হয়, যার রচয়িতা ছিলেন পুরুষ লেখকেরা। সমাজের ও সাহিত্যের এই একমুখী গতির পরিবর্তন আনতেই নারীরা শুরু করেছিলেন নাটক রচনা।

পদ্ধতি

প্রবন্ধটিতে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বনের পাশাপাশি আকর বা উৎস পত্রিকা 'ভারতী' ও বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য গৃহীত হয়েছে।

বিশ্লেষণ

১.

'ভারতী' পত্রিকায় মৌলিক নাটক রচয়িত্রীদের মধ্যে সর্বাপ্রাে নাম আসে স্বর্ণকুমারী দেবীর (জন্ম: ২৮ আগস্ট, ১৮৫৬, মৃত্যু: ৩ জুলাই, ১৯৩২)। "ইদানীংকালে হয়তো অনেকেই ভুলে গেছেন যে, বাংলায় অপেরাধর্মী গীতিনাটিকা লেখার ব্যাপারেও স্বর্ণকুমারী পথিকৃতির গৌরব দাবী করতে পারেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বাগ্নিকী প্রতিভা', এমন কি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী'রও আগে রচনা করেন 'বসন্ত উৎসব'।"^১ সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো নাটকের বিচিত্র ভূমিতেও স্বর্ণকুমারী দেবীর অনায়াস বিচরণ ছিল।

ভারতী, ১৩০৯ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দেব কৌতুক' নামক একটি কাব্যে নন্দন-কাননে ইন্দ্রানী শচীর সভাস্থলে মদনজায়া রতি ও বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মীর মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিবাদ বাধে। শচী তাঁদেরকে বলেন, যেন তাঁরা দুজনেই মর্ত্যে গিয়ে দু'টি কন্যা নির্বাচন করে নিজেদের মনমতো রূপে-গুণে তাদের ভূষিত করেন। তারপর রঙ্গক্ষেত্রে নির্ধারিত হবে তাদের জয়-পরাজয়। এই প্রস্তাবনার পর ১৩১১ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, আশ্বিন এবং কার্তিক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর

‘উর্বশী ও তুকারাম’ নামক কাব্যনাটক।

বোম্বাই প্রদেশের সমুদ্রতীরে অরণাবতী গ্রাম এই নাটকের পটভূমি। সদাশিব শ্রেষ্ঠীর কন্যা উর্বশী রূপসী, তাই অত্যন্ত গরবিনী। সদাশিবের ভ্রাতুষ্পুত্রী মেনকার চরিত্রটি ঠিক এর বিপরীত। অপার করণার সাগর তার হৃদয়। তবে রূপে সে উর্বশীর পাশে মলিন। উর্বশীর রূপের বর্ণনা শোনা যায় সামন্ত রাজা ও দাক্ষিণাত্য সুলতানের সেনাপতি সাহাজির দেহরক্ষী ও প্রিয় সেনা তুকারামের মুখে, যা শুনে সাহাজি মন্ত্রমুগ্ধের মতো উর্বশীর দেখা পেতে অতি আগ্রহী হন। এদিকে সাহাজির বীরত্বের কাহিনী শুনে, তাঁর কৌমার্যব্রত ভঙ্গ করতে এবং তাঁর হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে উর্বশী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

সাহাজি নিজের রাজবেশ পরিত্যাগ করে তুকারামকে তা ধারণ করতে বলেন। কারণ, তিনি উর্বশীর চোখে নিজেকে পরীক্ষা করতে চান। নিজের বাহ্যিক রূপের উর্ধ্বে উঠে প্রাণের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের অনুসন্ধানই এই নাটকের মূল অশ্বিষ্ট। যখন রাজবেশধারী তুকারাম উর্বশীকে দেখে দ্রুত সাহাজিকে সংবাদ দিতে ছুটে যায়, তখন তার এই আচরণ উপেক্ষাসম তীক্ষ্ণধার-ছুরির মতো বাজে উর্বশীর হৃদয়ে, রূপ-গরবিনী উর্বশীর বিরাগী মনে সাহাজি-বেশী তুকারামের প্রতি অনুরাগ জন্ম নেয়।

নাট্যকার এই নাটকে প্রতিপন্ন করেছেন যে, নারী শুধু নিজের বাহ্য শারীরিক সৌন্দর্য দিয়েই পুরুষের চিত্তহরণ করতে পারে না, প্রত্যেক রমণীর মানসিক সৌন্দর্যেই পুরুষের হৃদয় মুগ্ধ হয়। তৃতীয় সর্গের প্রথম দৃশ্যে সৈনিকের বেশধারী সাহাজি অরণাবতীর মন্দিরে উর্বশীর জন্য প্রতীক্ষারতা মেনকার স্নিগ্ধ রূপে, তার কথাবার্তা ও আচরণে মুগ্ধ হন, যদিও তিনি প্রথম দর্শনে তাকে উর্বশী বলে ভুল করেন। মেনকাও তাঁর দিব্যরূপ ও সৌজন্যবোধে বিবশ হয়ে মনে মনে তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করে। পরে রাজার সেই

ভুল ভাঙলেও মেনকার ‘ফুল হেন সুকোমলা শান্ত মূর্তিমতী’ রূপই তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়।

এদিকে, নবজাগ্রত প্রেমের স্পর্শে আমূল বদলে যায় উর্বশীর হৃদয়। তার আত্মগ্লানির দৃশ্যটি চমৎকার একেছেন নাট্যকার—

“এ দিন এত যত্নে
শতজনে পারে নাই যে কার্য সাধিতে,
অবজ্ঞাকটাক্ষ ক্ষেপি তুমি তা সাধিলে
ফুটালে হৃদয় মোর বুঝাইলে আর
রমণীর শ্রেষ্ঠধন নহে রূপরাশি;
মঙ্গল সুন্দর সত্য অপূর্ব মহান,
একমাত্র প্রেমপূর্ণ হৃদয় তাহার।”^২

তার ভালোবাসা তাকে বিনম্র করেছে, মহান ত্যাগের আদর্শে ব্রতী করে তুলেছে। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে মারাত্মক আহত, মৃতপ্রায় তুকারামকে উদ্ধাস্ত মেনকা খুঁজে বের করে এবং সেনাদের সাহায্যে তাকে সুস্থ করে তোলে। এরপর যখন উভয়ের সাক্ষাৎকালে তুকারাম আত্মপরিচয় দান করে সামান্য সৈনিক হয়েও উর্বশীর প্রতি নিজের প্রেমকে স্পর্ধা বলে আত্মগ্লানিতে ভোগে, তখন একদা রূপগর্বিতা, মমতাহীনা শ্রেষ্ঠীকন্যা নিজের অগ্নিশুদ্ধ প্রেমকে গরীয়ান করে তোলে—

“ওহে সর্বোত্তম, আমি জানিতে চাহিনা
রাজা কিম্বা প্রজা তুমি ক্ষুদ্র কি মহান
এ হৃদয় প্রেম পুষ্প লহ উপহার
সার্থক মানিব জন্ম।”^৩

কাব্য ও নাটক— এই দুইয়ের শর্ত পূরণ করে এদের মধ্যে যথাযথ পরিমিত সাধন করে যে শিল্পমাধ্যম, তাকে কাব্যনাটক বলে (Poetic drama)। সার্থক কাব্যনাটকে থাকে উৎকৃষ্ট কাব্য এবং উৎকৃষ্টতর নাট্যগুণ। মানব-অস্তিত্বের দ্বিমুখী সত্তার মধ্যে টানাটানো, সমস্যাবিক্ষুব্ধ জীবন তরঙ্গের যন্ত্রণাময়

আলোড়ন ফুটিয়ে তোলাই সার্থক কাব্যনাটকের মূল অন্বিষ্ট। এতে কাহিনীর চেয়ে চরিত্রের বিভিন্নমুখী দ্বন্দ্বের অন্তঃসলিলা ধারা বয়ে যায় বেশি। ‘উর্বশী ও তুকারাম’ নাটকের ভাষা ও ভাব এর কাব্যসংলাপে যথার্থ ফুটেছে। স্বর্ণকুমারী অত্যন্ত যত্ন ও মনোযোগ সহকারে উর্বশী-চরিত্রের চিত্রণ ও রূপায়ণ করেছেন। তার অহঙ্কার, গর্ব, উচ্চাশা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-সবকিছুই ভেসে যায় নবানুেষিত প্রেমের শ্রোতে। তার নারীসত্তার দ্বন্দ্ব আর হৃদয়ের পরিবর্তনই এই কাব্যনাটকের মূল বিষয়। এর পাশাপাশি স্বর্ণকুমারী মেনকার সরলতা, চিরন্তন নারী-স্বভাব, প্রেম, মমতা, উৎকর্ষা, ভয়, লজ্জা, সংস্কার- সব কিছুই নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তুকারাম ও সাহাজিও যথাযথ।

নাটকে প্রধান চরিত্রগুলোর পাশাপাশি রয়েছে প্রচুর অপ্রধান ও সাধারণ চরিত্র। এরা বহু দৃশ্যে এসেছে, সংলাপের দ্বারা প্রেক্ষাপট ফুটিয়ে তুলেছে, নানা চরিত্রকে স্পষ্ট করেছে, কাহিনীতে গতি এনেছে, সময়ে সময়ে হাস্যরসের যোগানও দিয়েছে। উর্বশীর অহংকার, উচ্চাশা ও চাহিদার পাশাপাশি মেনকার সারল্য ও সৌন্দর্য যে অবহেলিত হচ্ছে, তা ধরা পড়ে বিন্দু দাসীর কথায়। দ্বিতীয় সর্গের চতুর্থ দৃশ্যেও গ্রামবাসী ও সেনাদল- সকলের সংলাপই সহজবোধ্য, চলিত, চেনা জীবনধারার প্রতিচ্ছবি।

নারীরা যে কোনোদিন প্রহসন লিখবেন- উনিশ শতকে সে কথা অনেকেই ভাবতে পারেননি। ‘ভারতী’তে বহু নাটকের পাশাপাশি স্বর্ণকুমারী লিখেছেন দুটি প্রহসনও- ‘কনে-বদল’ (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩১২) ও ‘পাকচক্র’ (বৈশাখ-অগ্রহায়ণ, ১৩১৬)। “কারুণিক প্যাটার্ণের গল্প-উপন্যাস লিখতে লিখতে তিনি যে হাসাতেও পারেন, তারই দুটি সার্থক উদাহরণ হয়ে দাঁড়ালো”^৪ এই নাটকদ্বয়। প্রচলিত ধারার, ব্যঙ্গ-বিদ্রোপে স্বর্ণকুমারী নিজের রচনাকে জর্জরিত করেননি, প্রধানত ঘটনা বিন্যাসের কৌশল বা জীবন-যাপনের

ক্ষেত্রে অসংগতি ও অসামঞ্জস্য থেকেই তিনি হাস্যরস খুঁজে বের করেছেন। নিজের প্রহসন দু’টিতে হাস্যরসাত্মক সহজ কৌতুকের দিকেই তাঁর বেশি আকর্ষণ ছিল। এই দুটি প্রহসনেরই মূল বিষয় বিবাহ-বিভ্রাট।

‘কনে-বদল’ নামের মাঝেই এই প্রহসনের বিষয়বস্তু স্পষ্ট। শ্রীধর এবং শশীনাথ- এই দুই বিবাহযোগ্য যুবকের বিবাহ-সম্পর্কিত নানা রকম ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও চাহিদার ফলে যে সমস্ত হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, নাট্যকার তা এই নাটকে তুলে ধরেছেন। এই নাটকে হাস্যরস স্বতঃস্ফূর্ত। পরিস্থিতি, সংলাপ, নাটকের পাত্র-পাত্রীর কার্যকলাপ ও স্বগতোক্তি-সবকিছুতেই নাট্যকার সহজ-সরল হাসির পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। সমকালীন শিক্ষিত যুবকদের বিচিত্র মনোভাব এবং আচরণের অসঙ্গতিপ্রদর্শনই এই প্রহসনের মূল লক্ষ্য। যুবসমাজের হঠকারী চারিত্রিক রূপটিকে নাট্যকার বিশেষভাবে নির্দেশ করেছেন। আবার, এই নাটকে সমাজের বিভিন্ন আচার, সংস্কার ইত্যাদির কথাও তুলে ধরা হয়েছে।

১৯১১ সালে, গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত ‘পাকচক্র’ একটি বিশুদ্ধ প্রহসন। পুত্র বিনোদের বিয়ে নিয়ে কর্তৃ-গৃহিনীর বাদানুবাদ ও মনোমালিন্যের পর বিনোদের মনোনীত পাত্রী হরিবাবুর কন্যার সঙ্গে তার এবং কর্তার প্রিয় কর্মচারী চন্দ্রকান্তর সঙ্গে গৃহিনীর পালিতা বাল্যবিধবা শশীমুখীর প্রেমজ-বিবাহের মধ্য দিয়ে নাটকের যবনিকা ঘটে।

‘ভারতী’তে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারীর দুটি প্রহসনের মধ্যেই তাঁর সামাজিক ভাবনা, বাস্তববোধ ও সমাজচেতনা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক যে কোনো সংস্কার-সাধনের ক্ষেত্রে বহু মানুষ প্রগতিশীল মানসিকতা দেখালেও সেটা যে আদৌ তাদের প্রকৃত মনোভাব নয়, ‘পাকচক্র’ নাটকের কর্তার কথায় তা বেশ বোঝা যায়। সমকালীন

সমাজের চিত্রটিও তাঁর কথাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে-
“এখন দুনৌকয় পা দিলেও বেশ চলে যাওয়া যায়,
কেবল যদি মনের বলটুকু থাকে।”^৫

উনিশ শতকে বাংলার সামাজিক বিপ্লবের বেশিরভাগই ছিল নারী-কেন্দ্রিক। বাল্যবিবাহ বা বহুবিবাহ রোধ, বিধবা-বিবাহের প্রচলন, নারী-শিক্ষা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক- সব কিছুই কেন্দ্রে ছিল নারী। এত কিছুই পরও যে সাধারণ মেয়েদের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের তেমন কোনো বদল হয়নি- তা গিল্লির আক্ষেপের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে বিনোদের মা যা বলেন, আমরা অনায়াসেই তাকে স্বর্ণকুমারীর বক্তব্য বলে ধরে নিতে পারি। বিধবাদের বিয়ের প্রচলন হলেই যে সব বিধবা বিয়ের জন্য উৎসুক হয়ে উঠবে, তা কখনোই তাঁর মনে হয়নি। এটি শুধুই অসহায় মেয়েদের জন্য একটি পথ খুলে রাখা। তেমন কষ্টদায়ক অবস্থায় পড়ে কেউ চাইলে বিয়ে করতে পারে। এখানে হতমান নারীর ওপর পুরুষতন্ত্রের আক্রোশ ও মমতাহীনতার কথা বলতেও তিনি কুণ্ডাবোধ করেননি।

‘ভারতী’র ১৩১৮-এর বৈশাখ থেকে আশ্বিন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ‘রাজকন্যা’কে স্বর্ণকুমারী ‘নাট্যোপন্যাস’ শ্রেণিভুক্ত করেন। সাধারণত “যে উপন্যাসে সামাজিক জীবনের কিম্বা ব্যক্তিমানের সংঘাতই শুধু প্রাধান্য লাভ করে, তাকে নাট্যোপন্যাস বলা যেতে পারে।”^৬ মানুষ ও সমাজের সংঘাত মুখরতার ছবি এবং তা ভিন্ন দুই বিষয়কে কিভাবে প্রভাবিত করছে তার চিত্রও এই প্রকরণে থাকা সম্ভব। মানুষের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব টানাপোড়েনের কথাও এতে থাকতে পারে। স্বর্ণকুমারী ‘রাজকন্যা’ নাটকটিকে নাট্যোপন্যাস হিসেবে অভিহিত করায় আমাদের কৌতূহল স্বভাবতই বেড়ে যায়।

নাট্যকার “হয়তো এ নাটকের আখ্যানের সঙ্গে রূপকথা বা উপকথা জড়িত হয়ে আছে বলেই ভিন্ন

অভিধায় এ নাটকটিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন”^৭। এগারোটি দৃশ্য সমন্বিত এই নাটকে সবার শেষে ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় দেখানো হয়েছে। চিরচেনা গল্পের আদলেই এখানে এসেছে সুয়োরানী-দুয়োরানীর দ্বন্দ্ব। চেনা পথেই ছোট রানীর অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছে মৃত বড় রানীর সন্তানেরা। আবার, সমকালীন সমাজচেতনার দাবিতে নিপীড়িতা রানীর মেয়ে রাজকন্যা কল্যাণীকে অসহায়, নিরীহ প্রজারা নিজেদের মঙ্গলাকাজক্ষী মায়ের পদে বরণ করে নিয়েছে। বিমাতার ষড়যন্ত্রে রাজা নিজের কন্যাকে চামুণ্ডা মন্দিরে বলি দেওয়ার আদেশ দেন। একে আপাতঃদৃষ্টিতে অন্যায়েই জয় বলে মনে হলেও মূলত ঘটে ভিন্ন ঘটনা। কল্যাণীর পবিত্র রক্তশ্রোতে রাজ্যের সমস্ত পাপাচার, হিংসা ধুয়ে মুছে গিয়ে ন্যায় ও ভালোবাসার কাছে কুটিলতা হার মানে। জয় হয় রাজকন্যার।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সমাজবোধ ও রাজনৈতিক মনোভাব ছিল খুব স্পষ্ট। শাসক-শাসিতের সম্পর্ক, শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধের স্বরূপ, মনুষ্যত্ব ও ধর্মের মধ্যে কাদের জয় হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা তিনি এই নাটকে সহজভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, মসনদধারীর ধামাধরা মোসাহেবরাও মারাত্মকভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে।

কল্যাণীর মৃত্যুতে সন্ন্যাসীবেশী রাজার আত্মোপলব্ধিতে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে। রাজার উজ্জিত বিশ্বপ্রেমের উদ্বোধন পরিলক্ষিত হয়-

“যে উদ্দেশ্যে সে প্রাণপাত করেছে সে উদ্দেশ্যে সফল হোক। এ রাজ্য হতে মিথ্যা ধর্ম দূর হোক, আচারের নামে বিদ্বেষ, ঘৃণা, পাপাচার, দেবপূজার নামে নরবলি দূর হোক।... হে শুভশক্তি.... বল দাও, তোমার পুণ্যশক্তিতে আমাদিগকে প্রবুদ্ধ কর।”^৮

এমন একটি সমাজ, একটি দেশ, একটি জাতির স্বপ্নই তো অন্যান্য সচেতন মানুষের মতো স্বর্ণকুমারীও দেখেছিলেন!

২.

‘ভারতী’ পত্রিকায় স্বর্ণকুমারীর প্রকাশিত নাটকগুলোর মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে আছে হেঁয়ালি-নাটকগুলো। ১২৯২ সালের ভদ্র সংখ্যার ‘ভারতী’তে প্রকাশিত হয় ‘লজ্জাশীলা’ নামক নকশাটি, যা ‘নক্সা’ নামেই প্রকাশিত হয়। “স্বর্ণকুমারীর ‘বৈজ্ঞানিক বর’ ও ‘লজ্জাশীলা’ ‘শারাড’ হিসেবে অতুলনীয়।”^{১৩} ‘বৈজ্ঞানিক বর’ (ভারতী, মাঘ, ১২৯২) নাটিকাটিও প্রকাশিত হয় ‘নক্সা’ নামে। এটি এক বিবাহ-বাসরে বর এবং কনের প্রতিবেশিনীদের মধ্যে কৌতুকপ্রদ কথোপকথনে শুরু ও শেষ হয়েছে। নাটিকার স্বল্প পরিসরে বিজ্ঞান-শিক্ষাভিম্বানী এক যুবকের সাধারণ গৃহস্থ ঘরের কুলবধূদের হাতে নাকাল হওয়ার ঘটনার পাশাপাশি তার শিক্ষার অহংকার এবং চিরকালীন সংস্কারের প্রতি মানসিক বশ্যতাকে লেখিকা ফুটিয়ে তুলেছেন অপূর্ব দক্ষতায়।

‘লোহার সিন্ধুক’ (ভারতী, ফাল্গুন, ১২৯২) একটি নাটিকা- যাতে মানুষের স্বভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। গোপন কথা গুপ্ত রাখার পরিবর্তে রটিয়ে বেড়ানোর বৈপরীত্যে নাটিকার ‘লোহার সিন্ধুক’ নামকরণটি শ্রেষাৎক ও সার্থক। ‘ষষ্ঠীর বাছা’ (ভারতী, পৌষ, ১২৯৩)- যা ‘হেঁয়ালি নাট্য’ নামে প্রকাশিত হয়, তাতেও আংশিক শিক্ষার কুফল দেখানো হয়েছে। সত্যিকারের শিক্ষা কখনো অহংকারের জন্ম দিতে পারে না। ওই বছরই আষাঢ় সংখ্যায় ‘হেঁয়ালি নাট্য’ নামে প্রকাশিত হয় ‘চাক্ষুষ প্রমাণ’ নাটিকাটি। ঘরোয়া আলাপচারিতায়, কথায় কথায়, শুধুমাত্র অনুমানের সাহায্যে যে মানুষ কত কিছু কল্পনা করে নেয়, এবং প্রমাণ ছাড়া সেই সমস্ত

কথা অপরে বিশ্বাসও করে- এখানে তারই দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে।

১২৯৩ সালের বৈশাখ থেকে শুরু করে চৈত্র পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যাতেই হেঁয়ালি নাটক প্রকাশিত হয়। ভদ্র-আশ্বিন সংখ্যাটি যুগ্মসংখ্যারূপে বেরোনোয় মোট ১১টি এই ধরনের নাটিকা এই বছর আমরা পাই। ‘সৌন্দর্য্যনুরাগ’ (ভারতী ও বালক, শ্রাবণ, ১২৯৪) নামক নাটিকাটিতে স্ত্রী-পুরুষের সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ ও সৌন্দর্যবোধের তারতম্য নিয়ে মজার কথোপকথন রয়েছে। স্বামী-স্ত্রী ও তার ভ্রাতৃবধূ- এই তিনটি চরিত্রের আলাপচারিতায় উঠে এসেছে চিরকালীন সেই নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব। এই বিষয়টি নিয়ে তৎকালীন সাহিত্যে বাদানুবাদের শেষ ছিল না। নাটিকাটির ক্ষুদ্র পরিসরে নাট্যকার নারীর সৌন্দর্যবোধ-সংক্রান্ত নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন।

‘গানের সভা’ (ভারতী ও বালক, পৌষ, ১২৯৪) নাটিকায় নূতন ও পুরাতনের মধ্যে হাস্যকর দ্বন্দ্ব প্রাণের অন্তঃসারশূন্যতাই ধরা পড়েছে। ‘নিজস্ব সম্পত্তি’ (ভারতী ও বালক, ভদ্র, ১২৯৫) নাটিকার এর মূল কাহিনী ভিচার্ড ড্রিসলেন সেরিডন -এর ‘দ্য ক্রিটিক’ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষের হিংসা, আত্মভ্রিতাকে লেখক হাস্যরসের মাধ্যমে সুন্দরভাবে এই নাটিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই নাটিকা ক’টি এবং ব্যাঙ্গ-সভা” (চৈত্র, ১২৯৪), ‘বিরহ-বেদনা’ (কার্তিক, ১২৯৫), ‘সূক্ষার্থ’ (পৌষ, ১২৯৫), ‘তত্ত্বজ্ঞানী পুটার্ক ও তাঁহার শিষ্য’ (মাঘ, ১২৯৫) এবং ‘সূক্ষ্ম ডাক্তারি’ (ভারতী ও বালক, বৈশাখ, ১২৯৮)- মোট তেরোটি রচনা ১৯০১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ‘কৌতুক নাট্য ও বিবিধ কথা’ নামে। গ্রন্থটি স্বর্ণকুমারী উৎসর্গ করেন বড় মেয়ে হিরণ্ময়ীকে। ‘সূক্ষ্ম ডাক্তারি’ নাটিকাটি ‘রহস্য-

নাট্য' নামে প্রকাশিত হয়। ছোট্ট এই নাটিকাটিতে যাদবচন্দ্র নামক এক তথাকথিত শিক্ষিত ও অতি সাবধানী যুবকের যে কারো ক্ষেত্রেই সকল খাদদ্রব্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি দেখানো হয়েছে। এই যে বিশ্বাস, সংশয় ও কর্মের মধ্যে তফাৎ- এতেই মনুষ্য চরিত্রের অসঙ্গতি এবং নাটিকার হাস্যরস লুকিয়ে আছে। যাদবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'চিন্তাশীল' নাটকের নরহরি চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এছাড়াও 'প্রলয় কাণ্ড' (ভারতী, ১৩১৭), 'শিক্ষা-বিভ্রাট' (বৈশাখ, ১৩১৯) নামক নাটিকা রচনা করেন তিনি। 'শিক্ষাবিভ্রাট' নাটিকায় এক মেমসাহেবের প্রাইজ পাওয়ার লক্ষ্যে বাংলা-শিক্ষার হাস্যকর চেষ্টা দেখানো হয়েছে।

৩.

শ্রীমতি সরোজকুমারী দেবীর (জন্ম: ৪ নভেম্বর, ১৮৭৫, মৃত্যু: ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬) 'বিফল মিলন' (ভারতী, মাঘ, ১২৯৮) নামক নাটকটি কাব্যছন্দে লেখা। কাব্যের গভীরতা বা নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ নাটকীয়তার দিক থেকে এটিকে কাব্যনাট্য বলা চলে না বলেই মনে হয়। কাহিনী খুবই সরল। বিনয় ও তরুণা দুটি ভাই-বোনের মতো, জীবন-নদে ছোট দুটি তরঙ্গের মতো পাশাপাশি ভেসে, হেসে-খেলে বড় হওয়ার পর তরুণা জানতে পারে যে, সে বিনয়ের নিজের বোন নয়, বিনয়ের পিতা তার নিজের জনকও নন। মর্মান্তিক এই সত্য জানার পর তার হৃদয়-বেদনা নাটকে প্রকাশ পেলেও নাট্যকার তার মানসিক টানাপোড়েনের চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা এখানে করেননি। বিনয়ের পিতা বীরেন্দ্র সিংহের মনোবাসনা ছিল এই দু'টি ছেলে-মেয়েকে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে এক করে দেবেন, কিন্তু তরুণা বা বিনয়- উভয়ের কাছেই এই প্রস্তাব অসম্ভব ও অভাবনীয়। নাটকীয় ও দ্বন্দ্বিক পরিস্থিতি তৈরির সুযোগ থাকলেও অবশ্য এখানে নাট্যকার তা কাজে লাগাননি। বিনয় এবং

তরুণার একান্ত অনিচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে নিজের মনের ইচ্ছের প্রবল স্রোতে বাঁধ দিতে বাধ্য হন বীরেন্দ্র।

এরপর দেশের যুবরাজ শৈল পথ হারিয়ে নদীতে স্নানরতা তরুণাকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং স্নানান্তে সে নদীতটে এলে তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। অতিথি-সৎকারের উদ্দেশ্যে তরুণা তাকে নিয়ে যায় পিতার কাছে, কুটিরে। যুবরাজ শৈল এবং 'ভিখারিণী' তরুণা পরস্পরকে ভালোবাসে। কিন্তু এই ভালোবাসার প্রত্যক্ষ নিদর্শন নাটকে পাওয়া যায়, তরুণা এবং বিনয়ের সংলাপেই নাট্যকার একে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। নাটকের শেষ দৃশ্যে তরুণাকে শৈলের হাতে সমর্পণ করে বীরেন্দ্র তাদেরকে নৌকায় তুলে বিদায় দেন। আশৈশব সাথী তরুণা চলে যাবার পর বিরহ-বেদনায় পুত্র বিনয় পিতাকে আরো দৃঢ় ভালোবাসার বন্ধনে আঁকড়ে ধরে, বাকি জীবন পরস্পরকে অবলম্বন করে বাঁচার অঙ্গীকার করে সে। পদ্যছন্দে লেখা নাটকটির সংলাপ অতি সরল ও সহজ। খুব সাধারণ একটি কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়েছেন সরোজকুমারী দেবী, যেখানে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত, চরিত্রদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বা জটিল কোনো নাট্য-পরিস্থিতি-সৃজনের তেমন চেষ্টা করেননি তিনি। 'হাসি ও অশ্রু' (১৮৯৫) কাব্যের লেখিকা সরোজকুমারী এখানে জীবনের সরল কিছু আবেগকে সরলতর নাট্যাবয়বে বেঁধেছেন মাত্র। তাঁর মূল শক্তি হলো তাঁর সহজ ভাষা এবং স্নেহ-ভালোবাসার সাবলীল প্রকাশভঙ্গি।

স্বর্ণলতা মল্লিক রচিত 'প্রহসন' নাটকটি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায়। মোট তেরোটি দৃশ্যের এই নাটকের মূল বিষয় হল নরেন্দ্রবাবুর মেয়ে প্রভার বিবাহ-বিষয়ক নানা প্রতিবন্ধকতা ও পাত্র-নির্বাচন জনিত সমস্যা। মাতৃহীন প্রভাকে তার জ্যাঠাইমা বুকে করে মানুষ

করেছেন। রূপে, গুণে অতুলনীয় প্রভা বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠায় বহু পাত্র নানাভাবে তাকে বিয়ে করতে চায়। তার বাবা নরেন্দ্রবাবুর কর্মস্থলের কয়েকজন ব্যতীত এই দলে রয়েছেন নরেন্দ্রর বাল্যবন্ধু বীরেশ্বরের পুত্র নবকিশোর, প্রভার মামার নির্বাচিত সুপাত্র ভূপতিচরণ, জমিদার গঙ্গাধর চৌধুরী প্রভৃতি। নরেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরেন্দ্রর আবার একান্ত ইচ্ছে, তার অভিনুহৃদয় বন্ধু বরেন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে হোক প্রভার। বরেন্দ্রও প্রভাকে ভালোবাসে, কিন্তু এত সুপাত্রের ভিড়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। যাই হোক, বন্ধুবিচ্ছেদ, আত্মীয়বিচ্ছেদের পাশাপাশি নিজের চাকরী নিয়ে টানাটানি ইত্যাদি নানা টানাটানিতে যখন নরেন্দ্রবাবু জেরবার, তখন হরেন্দ্রর পরামর্শ মতো নিজের বাড়িতে প্রভার স্বয়ম্বর-সভার ব্যবস্থা করেন তিনি। লজ্জাশীলা প্রভা বরেন্দ্রকে পছন্দ করলেও কখনো তা প্রকাশ করতে পারেনি, সকলের উপস্থিতিতে নাটকের শেষাংশে, শোভার সাহায্যে নিজের ভালোবাসাকে স্বীকার করে নিয়ে সে বরেন্দ্রর গলায় মালা দেয়।

এই কমেডি নাটকের সংলাপ সরল চলিত ভাষায় লেখা বলে পাঠক নাটকের পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে অচিরেই একাত্মতা স্থাপন করে নিতে পারে। রূপবতী, নম্রস্বভাবা প্রভাকে বিয়ে করতে চায় অনেকেই, তাদের আচারে ও কথায় লেখিকা বহু হাস্যকর মুহূর্ত তৈরি করেছেন। প্রভার জেঠিমা ও উড়িয়া ঝি দুজনেই প্রভার মাতৃসমা, আদর ও স্নেহের ছায়ায় মাতৃহারা প্রভাকে ছোট থেকে বড় করে তুলেছেন। প্রভার বিয়ে এক বয়স্ক জমিদারের সঙ্গে দেওয়ার কথাবার্তা চলছে দেখে এদের উজ্জ্বিত ফুটে ওঠে মাতৃ-হৃদয়ের হাহাকার। জেঠিমা বলেন, “ও বাবা! হীরের গুঁড়ো প্রভা আমার বুড়োর হাতে! আমি বেঁচে থাকতে? ঠাকুরপো এদিকে আমি যা বলি শোনে আর প্রভার বিয়ের কথা শুনবে না!.... আমি মানুষ করেছি প্রভা আমার...”^{১০} ত্রন্দনরতা উড়িয়া ঝি-র উজ্জ্বিতও বারে

পড়ে এক সাগর ভালোবাসা: “পিড়ভা তোড় ঝিয়ারি মোড় কলেজেড় ঝিয়ারি, বাবু যদি ঐ বুড়োটার সাথে পিড়ভার বিয়ে দিবে, মু মাথা ফাটায়ে কিড়ি কাঁদিবা। আঁখির রকত বাড় করিবা।”^{১১} পাশাপাশি, প্রভার নম্র স্বভাব, হরেন্দ্রর বুদ্ধিমত্তা, নরেন্দ্রর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা ও হালছাড়া অসহায় ভাব- সমস্ত কিছুকেই তিনি সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

‘ভারতী’তে নারী-লেখকদের যে কয়টি নাটক প্রকাশিত হয়েছে, তাদের বেশির ভাগের কাহিনীই প্রাচীন উপকথা, লোককথা বা পৌরাণিক গল্পসম্মত। কাজেই তাদের প্রেক্ষাপট এবং নাট্যপরিস্থিতিও ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক। স্বর্ণলতা মল্লিকের আলোচ্য সামাজিক নাটকটি পাঠককে তার চেনা সমাজ সম্পর্কে বলে, তাকে সমকালীন নানা সমস্যা বা হাস্যকর পরিস্থিতির সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। সে দিক থেকে ‘প্রহসন’ নাটকটি একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবেই চিহ্নিত হওয়ার দাবী রাখে।

৪.

শ্রীমতি অনুরূপা দেবীর (জন্ম: ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২, মৃত্যু: ১৯শে এপ্রিল, ১৯৫৮) দু’টি নাটক প্রকাশিত হয় ‘ভারতী’ পত্রিকার ১৩৩২ সংখ্যায়। প্রথমটি ‘ত্রিপুৱেশ্বরী’। শাষণ-ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যাটি এই বছর একত্রে প্রকাশিত হয়, এখানেই এই নাটকের প্রকাশ। লেখিকা এটিকে ঐতিহাসিক নাটিকা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কোনো এক গৌড়েশ্বরের বিপুল বাহিনীর আক্রমণে ত্রিপুৱার মহারাজা সিংহতুঙ্গ যখন ভয় পেয়ে সন্ধি প্রস্তাব আনার কথা ভাবছেন, তখন ত্রিপুৱেশ্বরী চম্পাদেবী দেশপ্রেম ও ক্ষত্রধর্মের প্রতি চরম আনুগত্য প্রদর্শন করেন এবং রাজাকে গৃহবন্দী রেখে রাজকুমার কুঞ্জ, রাজবধূ বিজয়া ও রাজ্যের ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীকে নিয়ে আশুয়ান শত্রুসেনার ওপর বাঁপিয়ে পড়ে বিজয়লক্ষ্মীকে অচল করে রাখেন।

দেশপ্রেম এবং বীরধর্মের প্রতি অনুরাগ- এই দুই বৈশিষ্ট্য দ্বারাই নাট্যকার ত্রিপুরেশ্বরীকে অনন্য করে তুলেছেন। এই চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের মধুসূদন দত্তের ‘বীরঙ্গনা কাব্য’র জনাকে মনে পড়ে যায়। একাঙ্কিকার দ্বিতীয় দৃশ্যে দেশের চরম দুঃসময়ে প্রমোদগৃহে বিশ্রামলাপরত যুবরাজ ও তার পত্নীকে তিরস্কারকালে ছেলের মধ্যে বীরত্বের অভাব দেখে ক্রুদ্ধা জননী যখন বলেন, “ধিক ধিক কাপুরুষ! কেন মাতৃগর্ভে তোমার মৃত্যু ঘটে নাই:.....সাহস থাকে আমার পশ্চাতে এস, না থাকে এইখানে বন্দী থাকো, যুদ্ধান্তে মুক্তি পাইবে”^{১২}- তখন পৌরাণিক এই চরিত্রকেও কোথাও যেন অতিক্রম করে যান চম্পাদেবী। লজ্জিত যুবরাজের আগে অবশ্য রাজবধু বিজয়া এই যুদ্ধে রাজরাণীর সঙ্গী হতে চেয়েছেন।

ছোট্ট এই নাটিকায় চরিত্র খুব বেশি না থাকলেও নাট্যকার বীরধর্মকে মূল কেন্দ্রে রেখে তাদেরকে মিলিয়েছেন, মহারাজা সিংহতুঙ্গ ভীতু, শান্তিপ্ৰিয় মানুষ, কাজেই ক্ষাত্রধর্মচ্যুত এই চরিত্রটিকে বিদ্রপবাণে বিদ্ধ করেছেন ত্রিপুরেশ্বরী। রাজা স্ত্রীকে ভালোবাসেন, সমীহও করেন, কাজেই তাঁর অনুমতিক্রমেই তাঁকে গৃহবন্দী করেছেন রাণী। যুদ্ধে জয়ী রাণীর ফিরে আসার আগের মুহূর্তে সিংহতুঙ্গের আতঙ্কিত রূপ, রাজ্যের অনাগত পরাজয়ের কথা ভেবে তাঁর উদ্ভিগ্ন হওয়ার দৃশ্যটি লেখিকা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাণী নারী হয়েও অক্ষয় কীর্তি ও অম্লান যশের অধিকারিণী হলেন দেশের জন্য শহিদ হওয়ার মাধ্যমে, অথচ তিনি অকর্মণ্য ভীরু হয়ে বেঁচে রইলেন- একথা ভেবে যে আত্মগ্লানি রাজা অনুভব করেছেন, তাতে স্বপ্নায়তনের ক্যানভাসটিকে বেশ বড় ও জীবন্ত বলেই বোধ হয়। নাটকের শেষে আলুলায়িত কুন্তলা দীনবেশিনী রাণী চিরন্তন নারীর মতোই স্বামীর সম্মুখে নতজানু হয়ে রাজদ্রোহী হওয়ার যথোচিত শাস্তি প্রার্থনা করেছেন। পরাধীন ভারতের পটভূমিতে

ত্রিপুরেশ্বরী চম্পাদেবীর মতো বীরঙ্গনা ও দেশপ্রেমী এক চরিত্র সৃষ্টি করার জন্য অনুরূপা দেবী অভিনন্দন পেতেই পারেন।

অনুরূপার দ্বিতীয় নাটক ‘বিদ্যোত্তমা’র প্রথম অঙ্ক প্রকাশিত হয় ঐ বছরের কার্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ যুগে সংখ্যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক যথাক্রমে মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশ পায়। বিদ্যোত্তমা সার্থকনাম্নী রাজকন্যা। সর্বশাস্ত্রজ্ঞা সে, কিন্তু জ্ঞান তাকে বিনয় দান করতে পারেনি- সে অহংকারী। যে পুরুষ তাকে শাস্ত্রজ্ঞানের তর্কে পরাস্ত করতে পারবেন, তারই কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করার প্রতিজ্ঞা তার রয়েছে। কিন্তু গর্বোদ্ধতা বিদ্যোত্তমাকে কেউ পরাজিত করতে পারেন না। তার পিতা দেশের মহারাজা, কন্যাকে পণ্ডিত করে তুলতে গিয়ে যে নিজের মূর্খতাই প্রমাণ করেছেন, তা জনান্তিকে স্বীকার করেন। দেবদত্ত, ভবদেব প্রমুখ পণ্ডিতেরা অহংকারী রাজকন্যার কাছে শাস্ত্রালোচনায় পরাজয় স্বীকারের পর লজ্জায়, অপমানে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং তারই ফলস্বরূপ এক মহামূর্খ, হতদরিদ্র অথচ রূপবান কালিদাসের সঙ্গে কৌশলে তার পরিণয় ঘটান।

নাটকের শেষে প্রকৃত সত্য জানতে পেরে বিদ্যোত্তমা নিজের তথাকথিত স্বামী কালিদাসকে ঘৃণাপূর্বক বিতাড়ন করে, আত্মোপলব্ধি ও নিজের বিদ্যামদগর্বের জন্য অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে। অনুরূপা দেবী বহু-প্রচলিত এই কাহিনীতে এখানেই ইতি টেনেছেন। প্রায়শ্চিত্ত বা নবোন্মোষিত প্রেম, বা বৈরাগ্যবরণের পথে আত্মশুদ্ধি ঘটাননি তিনি বিদ্যোত্তমার। নাটকটির অসম্পূর্ণতা এখানেই।

বিদ্যোত্তমা অনুচিত জ্ঞান-গর্বিতা- একথা সত্য। কিন্তু তবুও, একজন নারীর কাছে পুরুষের পরাজয় যে তৎকালীন সমাজের চোখে কতটা আবাস্তিত ছিল, পুরুষের নির্দিষ্ট করে দেওয়া গঞ্জির বাইরে পা রাখা

নারী সমাজপতিদের চোখে যে কতটা অপরাধী প্রতিপন্ন হোত, তাকে শাস্তি দেওয়ার সম্ভাব্য যে কোনো পথই যে পুরুষ অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করত না- তা পরাজিত ব্রাহ্মণ দেবদত্তের উজ্জ্বিত খুব সহজেই ধরা পড়ে-

“...হায় নারি! জানো না আজ মনিহার বোধে স্বেচ্ছায় তুমি নিজ কর্ত্তে কি তুচ্ছ অস্থিমাল্য তুলিয়া লইতেছ, দুর্কিনীতে! তোমার তীব্র অবহেলায় কি অমোঘ দণ্ড প্রদান করতে এসেছি, তাহা ভাবিতে গেলে আমিই যেন জ্ঞান হারা হইয়া পড়িতেছি।”^{১০}

এমনকি, বিদ্যোত্তমার কালিদাসের কাছে পরাজয়-বরণ মুহূর্ত্তে মনুষ্যত্বের দাবিতে একবার সত্য প্রকাশ করে দেওয়ার কথা ভাবলেও নিজের পূর্ব অপমানের কথা স্মরণ করে সে চুপ থেকে যায়।

নাটকের সংলাপ অতি গুরুগম্ভীর। বিশেষ করে, বিদ্যোত্তমা ও পণ্ডিতগণের কথায় শাস্ত্রের নানা উক্তির আতিশয্য নাটকের কাহিনীর অনুকূল, যদিও প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নায়িকার স্বগতোক্তিতে বেদ বা উপনিষদের বচনের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ নাট্যরসকে ক্ষুণ্ণ করেছে বলেই মনে হয়। উপরন্তু বেশ কিছু সংলাপে সাধু ও চলিতের মিশ্রণে গুরুচগুলি দোষেরও সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি, কালিদাসের সংলাপ সহজ এবং বাস্তব। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গাছের শাখায় বসে সেই ডালই ছেদনরত কালিদাসের মুখের ভাষা অন্যান্য চরিত্রের সংলাপের গাম্ভীর্যের পাশে যেমন এক নাটকীয় বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে, তেমনি শ্রোতাদেরকে দিয়েছে হাস্যরসের অবকাশও। ঠিক তেমনি, সখি বল্লরী ও মহল্লিকার সঙ্গে কথোপকথনে বিদ্যোত্তমার ভাষা অতি সাধারণ, সহজবোধ্য- যা পরিস্থিতির সঙ্গে একান্ত মানানসই। মহাকবি কালিদাসের আগমনের কথা শুনে তিনি যখন বলে ওঠেন, “...ঐ মহাকবি শব্দটাতেই বোধ করি মনের মধ্যে আজ সর্বপ্রথম

এই হার মানবার সাধটা জেগে উঠছে”^{১৪} -তখন সেখানে আত্মমদমত্তা, পণ্ডিতা নারীর আপাতঃ কঠিন খোলসের মধ্যে লজ্জাশীলা, আসন্ন প্রিয়-মিলনে উৎসুক এক চিরন্তন নারীসত্তার প্রকাশ ঘটে।

উপসংহার

১৩০১ সালে ‘ভারতী’র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ও চৈত্র সংখ্যায় সরলা দেবী কর্ত্তক মূল পারস্য থেকে অনূদিত নাটক ‘লানকরানের উজীর’ প্রকাশিত হয়। বিদেশি নাটকের অনুবাদ হলেও এতে অনুবাদিকার রচনাশৈলি ও সৃষ্ট সংলাপ এতই পরিচিত ও সরল যে, পাঠক মুহূর্ত্তের মধ্যেই কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। নাটকটির ভাষা আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের চির পরিচিত, যদিও নাটকের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মানানসই নানা শব্দবন্ধও নাট্যকার এতে প্রয়োগ করেছেন। নাটকের চরিত্রগুলোও খুব সাবলীল, নিজের নিজের বৃত্তে সম্পূর্ণ। বিদেশী একটি নাটকের অনুবাদ করে সরলা দেবী দেখিয়েছেন যে, মানুষের স্বভাব-চরিত্র, চাহিদা, মানসিকতা, আবেগ স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে চিরন্তন। সরলা দেবীর অনূদিত নাটকটিতে জীবনের বহু চেনা বৈচিত্র্যের স্বাদ আমরা পাই, টের পাই নাটক-রচনায় তাঁর অনায়াস দক্ষতা। যদিও ‘ভারতী’তে সাহিত্যের বহু শাখায় বিচরণ করলেও সরলা দেবী কখনো নাটক লেখেননি, তবুও তাঁর ‘লানকরানের উজীর’ অনুবাদটি পাঠ করে আমরা অনায়াসেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, নাট্যকাররূপেও তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারতেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতকের প্রথম দশকগুলোতে, নারী-প্রগতির সেই কঠিন, সামাজিক বাধাবহুল দিনগুলোতে নাটক রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন ‘ভারতী’ পত্রিকার যে সমস্ত লেখিকা, অধুনা নাট্য-সাহিত্যের উন্নততর

ভুবনে তাঁদের সেই রচনার খুব গুরুত্ব হয়তো আর নেই, তবুও, তৎকালীন বাংলা নাটক রচনায় যে আন্তরিকতা, যে নিপুণতা এবং সর্বোপরি নব নব শৈলি-সৃজনে যে নির্ভীক পদক্ষেপ তাঁরা নিয়েছিলেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয় ও নমস্য।

তথ্যনির্দেশ

১. চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৯, পৃ. ৪০
২. উর্বশী ও তুকারাম, ৩য় সর্গ, ১ম দৃশ্য, ভারতী, ভাদ্র, ১৩১১, পৃ. ৪৯৭
৩. পূর্বোক্ত, ৪র্থ সর্গ, ৩য় দৃশ্য, ভারতী, আশ্বিন, ১৩১১, পৃ. ৬৪৮
৪. চিত্রা দেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
৫. পাকচক্র, ৫ম দৃশ্য, ভারতী, বৈশাখ-অগ্রহায়ণ, পৃ. ২৬০
৬. শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণঃ ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৯, পৃ. ১৬৬
৭. সুদক্ষিণা ঘোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, তৃতীয় মুদ্রণঃ ২০১৩, পৃ. ৪৬
৮. রাজকন্যা, উপসংহার, ভারতী, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩১৮, পৃ. ৫৪৮
৯. চিত্রাদেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
১০. প্রহসন, অষ্টম দৃশ্য, ভারতী, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩০১, পৃ. ৫০২
১১. পূর্বোক্ত
১২. ত্রিপুরেশ্বরী, ভারতী, শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৩২, পৃ. ১১৩

১৩. বিদ্যোত্তমা, ২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য, ভারতী, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, ১৩৩২, পৃ. ২৯৭
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫

দলিত সাহিত্য ও দলিতের সামাজিক অবস্থান ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত

রাজা তালুকদার

সারসংক্ষেপ

রাজা তালুকদার
পিএইচডি গবেষক
কটন বিশ্ববিদ্যালয়
গুয়াহাটি, আসাম, ভারত
e-mail : rajatalukdar71@gmail.com

ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় যেভাবে সমাজ গঠিত হত, তাতে সমাজের উচ্চ তিন বর্ণের প্রতি সব সুবিধা প্রদানকারী চতুর্থ বর্ণটি অর্থাৎ সেই খেটে খাওয়া মানুষগুলো যুগে যুগে নির্যাতিত ও শোষিত হয়ে আসছে। তারা সমাজের ‘দলিত বর্ণ’-উপেক্ষিত, অনিকেত, অস্পৃশ্য, পীড়িত ও অসহায় জনতার দল। বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণিবিভাজন একটি অভিশাপ। সেই অভিশাপের হাত থেকে আমরা এখনো মুক্ত হতে পারিনি। এই অভিশাপের ফলে দলিতদের নিস্পেষণ দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। দলিতদের দুঃখ, হয়রানি, দাসত্ব, অধঃপতন, দরিদ্রতা ইত্যাদির শৈল্পিক প্রকাশ যে সাহিত্যের মধ্যে দেখা যায় তাকেই বলা হয় দলিত সাহিত্য। দলিত সাহিত্য নিছক সাহিত্যকর্ম নয়, দলিত সাহিত্য একটি আন্দোলনের নাম। এই আন্দোলন জাতপাতের কুসংস্কার, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

মূলশব্দ

দলিত, অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ, শ্রেণি, ক্ষমতা, সাহিত্য, আন্দোলন, জাতি

ভূমিকা

দলিত সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করার আগে দলিত শব্দের অর্থ কী এবং দলিত কারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া দরকার। দলিত শব্দটি এসেছে দলন শব্দ থেকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় যারা অস্পৃশ্য, ঘৃণিত এবং উত্তরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত-তারাই দলিত। দলিতদেরকে হরিজনও বলা হয়ে থাকে। এরা উচ্চবর্ণের কাছে অস্পৃশ্য বা অচ্ছুৎ। এদের অবস্থান সাধারণত গ্রামের সীমার বাইরে এবং শহরাঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট

চিহ্নিত স্থানে। এই অস্পৃশ্য বা হরিজনরা ছাড়াও আদিবাসী, ভূমিহীন, ক্ষেত মজুর, শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষ, যাযাবর প্রত্যেকেই দলিত পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত। দলিতদের নিপীড়নের ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে সুচতুরভাবে। এই নিপীড়ন যারা করেছেন, তারা ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি বিধানের সুযোগপ্রাপ্ত। এই নিপীড়নের ফলে ব্যাহত হয় দলিতের আত্মোন্নয়নের প্রয়াস। আধুনিককালে দলিত আন্দোলন ও দলিত সাহিত্যের জনক জ্যোতিরাও ফুলে (১৮২৭-১৮৯০)। তিনি ভারতে সর্বপ্রথম

১৮৫১ সালে অস্পৃশ্যদের জন্য মহারাষ্ট্রের পুনায়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৩ সালে জাতপাতের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য গড়ে তোলেন ‘সত্যশোধন সমাজ’। এই বছরেই তিনি লেখেন ‘গোলামগিরি’। পরবর্তীকালে ড. বি আর আশ্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) দলিত আন্দোলনকে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যান। আশ্বেদকর হিন্দুধর্ম ও মনুবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করেছেন। তিনি লিখেছিলেন ‘Castes in India a : Their Mechanism, Genesis and Development’ (১৯১৬), ‘Who were the Sudras’ (১৯৪৬)। আশ্বেদকরের চিন্তাভাবনা দলিত যুবকদের আত্মপরিচয় ও সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো দলিত আন্দোলনের স্বরূপ ও দলিত সাহিত্যের স্থান পাঠকবর্গের কাছে তুলে ধরা। দলিত মানুষদের অধিকার বন্ধিত রেখে দেশ গড়ার কাজ চলে না। সেই বিচারে দেশের হিতের জন্য দলিতদের কথা ভাবতে হবে। দলিত শ্রেণি আত্মপ্রত্যয়ে বলিয়ান হয়ে নিজেরা লেখনী ধারণ করে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা, গ্লানি, পীড়ন ও কলঙ্কময় জীবনের কাহিনি প্রকাশ করে যে প্রতিবাদী সাহিত্য গড়ে তুলল, তা জগৎবাসীর কাছে তুলে ধরা।

পদ্ধতি

নিবন্ধটি বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন বই, পত্রিকা ও অনলাইন তথ্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

প্রত্যেক মানুষের জন্য স্বাধীনতা ও তার আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা, ভয়মুক্ত পরিবেশ ও সুরক্ষা প্রয়োজন। এই পৃষ্ঠভূমিতে নির্মিত মানসিকতা এক ধরনের সাহিত্যে বরাবর ব্যক্ত হচ্ছে। আর এই সাহিত্যই

দলিত সাহিত্য। দলিত সাহিত্য মনে করে মানুষই তার উপজীব্য। মানুষের সুখ দুঃখে দলিত সাহিত্য হৃদয়সংবেদী। মানুষকেই দলিত সাহিত্য মহান বলে মনে করে। মানুষকে তার মুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ বিপ্লবের অভিমুখে নিয়ে যাওয়া দলিত সাহিত্যের লক্ষ্য।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ভারতীয় সমাজ ও মানুষের মনে গণতান্ত্রিক বোধ প্রবল হয়ে ওঠে।

“প্রত্যেকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, নির্বাচন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, জনকল্যাণমূলক যোজনা, আর শিক্ষা প্রসারের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনজীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজের অধিকারবোধ তৈরি হয়। দাবির নতুন ভাষা নির্মিত হয়। *আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি-* এই ভাবনাতে স্বাধীনতা-উত্তর ভারত বেশ মশগুল হয়েছিল। স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে মানুষের মনে এমন একটা আশা তৈরি হয়েছিল যে, তাদের সমস্ত সমস্যাই যেন দূর হয়ে যাবে। কিন্তু কালে কালে নতুন নতুন আরও অনেক সমস্যা সমাজ রাজনীতির পরিসরে সংযোজিত হতে দেখা গেল।”^১

বেকারত্ব, আর্থিক অনটন, জনসংখ্যার আধিক্য, জাতিগত বিবাদ, সার্বিকভাবে সমাজ জীবনে অনাচার, জাতিনির্ভর রাজনীতি, হিন্দুত্ববাদী শক্তির প্রাবল্য, অত্যাচার আর মিথ্যে প্রতিশ্রুতির ফলে সাধারণ মানুষের মন থেকে স্বাধীনতার ওপর বিশ্বাস অনেকটাই টলে যায় এবং নিজেদের প্রশ্নের উত্তরের অন্বেষণে শুরু হয় নতুন নতুন গণ আন্দোলন।

“শিক্ষা আর গণতন্ত্রের আশ্বাদ সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছেছিল। বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ, দেহাতি জাতি, দলিত শ্রেণি, যাযাবর ও আদিবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন বর্গের মানুষ শিক্ষার প্রসারে সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছে অনেকটাই। কৃষক, শ্রমিক ও স্ত্রীলোকের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার হয়েছে। শিক্ষার

গণতান্ত্রিকরণ শুরু হয়েছে। এক মানুষ, এক মূল্য, এই ভাবনা সর্বত্র বিস্তৃত হল, কিন্তু সামাজিক অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হল না।”^২

সাম্য, স্বাধীনতা, বন্ধুত্ব ও ন্যায়বোধের মতো মানবিক মূল্যবোধ তৈরি হওয়ার ফলে রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এবং তার প্রতি মানুষের অসন্তোষ সমাজমানে বেদনা ও বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলল। স্বাধীনতা-উত্তর কালের সাহিত্যিক ধারা এই বাস্তবতাকে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছে।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র আজও চতুর্বেদকে জীবনের আদর্শপন্থা হিসেবে অনুসরণ করে চলেছে। বৈদিক শাস্ত্র আর্ষদের দ্বারা নির্মিত হয়। তারা একসময় ভারতবর্ষে এসে আপন স্থাপত্য গড়ে তোলেন এবং হিন্দু শাস্ত্রে আপন স্বার্থে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নির্মাণ করেন ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ। যে উদ্দেশ্যে তারা এই চতুর্বেদকে নির্মাণ করেন সেই উদ্দেশ্য বহু ক্ষেত্রে কাজে লাগলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর অপব্যবহারও দেখা যায়। আলোচ্য নিবন্ধে এই প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হয়েছে। যে ঋগ্বেদ হিন্দু সমাজের অমূল্যধন হিসেবে গ্রহণীয় সেই ঋগ্বেদেই হিন্দুসমাজের বর্ণবিভাজন রয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্বর্ণের হিসেব নিকেশ ঋগ্বেদ থেকেই হিন্দু সমাজে জ্ঞাত হয়, এই হিসেব নিকেশ যে সামাজিক সুযোগ সুবিধার আধারে নির্মিত তাতে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে ভারতীয় দলিত সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে ১৯৫৬ সালে আহূত হয়েছিল প্রথম দলিত সাহিত্য সম্মেলন। কিন্তু আশ্চর্যকর মৃত্যুতে তা পিছিয়ে যায়। ১৯৫৮ সালে মুম্বাইতে (বোম্বে) দলিত লেখকদের প্রথম সম্মেলন আহূত হয়। আন্নাভাউ শার্টে, বাবুরাও বাণ্ডল, শঙ্কররাও খরাট প্রমুখ মারাঠী দলিত সাহিত্যিকগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ১৯৬৮ সালে ঔরঙ্গবাদ থেকে ‘অস্মিতাদর্শ’

নামে একটি পত্রিকা বের হয় যা দলিত সাহিত্যের মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৬৯ সালে ‘মরাঠাওয়াড়া’ (দীপাবলী সংখ্যা) পত্রিকায় দলিত সাহিত্যের সংজ্ঞা, ইতিহাস আর পরিচয় নিয়ে যে বিশদ আলোচনা হয় তারপর থেকেই দলিত সাহিত্যের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৭২ সালে ৯ জুলাই নামদেও ধাসাল, অর্জন ভাঙলে, দয়া পাওয়ার আমেরিকার ‘ব্ল্যাক প্যাছার’ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ‘দলিত প্যাছার’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল নামদেও ধাসালের ‘গোলপিঠা’ কাব্যগ্রন্থ, যা দলিত সাহিত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

“ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে দলিত আন্দোলন বেশ জোরালো অথবা অ্যাকাডেমিক পরিসরে দলিত সাহিত্য চর্চিত হয়, সেই সমস্ত অঞ্চলে ‘দলিত’ ধারণা বিষয়ে মানুষের মনে সংশয় কম অথবা সংশয় নেই। দলিত কে? কেন দলিত সাহিত্য? এই সাহিত্যের চরিত্র কী? এই সাহিত্যের সঙ্গে মূল শ্রোতের সাহিত্য কোথায় আলাদা? কেন আলাদা? ইত্যাদি প্রশ্ন তাদের কাছে অনেক পরিষ্কার, পরিষ্কার না হলেও বিস্ময়ের বস্তু অন্তত নয়।”^৩

অন্যদিকে একথাও উঠে আসতে পারে, আসলে সেই সমস্ত অঞ্চলে দলিত শোষণ এতটাই প্রকট যে, দলিত চর্চা স্বাভাবিকভাবেই অ্যাকাডেমিক চর্চায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি রাখে।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলার দলিত কণ্ঠস্বর ছিল একেবারেই অশ্রুত। এমনকি এখনো অনেকের মনেই প্রশ্ন বাংলায় দলিত আছে কিনা। এই প্রশ্নের একটা প্রেক্ষিত আছে। বাংলায় অন্য জাতে বিবাহ বেশ প্রচলিত একটা ঘটনা। যদিও ম্যাট্রিমোনির বিজ্ঞাপন অত্যন্ত জাত-সচেতন। ফলত অন্য জাতে বিয়ে হলে ভারতের আর যে কোনও প্রান্তে যেমন সমস্যা অহরহ ঘটে, তা বাংলায় সাধারণত ঘটে না, বা ঘটলেও তার মাত্রা ও সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। বাংলার মন্দিরে

জাতভিত্তিক প্রবেশাধিকার পদ্ধতি নেই বললেই চলে, যা ভারতের অনেক অঞ্চলেই বেশ প্রকট।

“অনেকে অভিযোগ করেন বাংলায় দলিত কারা? কেবল কী নমঃশূদ্র? এপার বাংলার অন্য নীচু জাতের মানুষ নিজেদের সেভাবে দলিত হিসাবে পরিচয় দাবি করে না কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর হয়তো সহজ হবে যদি বৃহৎ বাঙালি ঔদাসীন্য কাটিয়ে আলোচনার পরিসর উদার করে। অন্য নীচু জাত নিজেকে দলিত বলে পরিচিত না করলেও, যে দলিত বলে নিজেকে পরিচিত করছে তার দাবি এতটুকুও মিথ্যে হয় না।”^৪

ওপার বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে যাঁরা এসেছেন তারা স্বাভাবিকভাবে দেশভাগের সাধারণ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং এর সঙ্গে ছিল জাত-নির্ভর দমনও। এই দেশে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের জাত পরিচয়ের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বিজয়গড় কলোনির মতো কলোনি নির্মিত হয়েছিল মূলত ওপার বাংলা থেকে উঠে আসা উচ্চবর্ণের জন্য। এই জাতভিত্তিক আবাস নির্মাণ জাতিভেদের পরিচায়ক নিশ্চয়।

বাংলার দলিত সাহিত্যের আন্দোলন শুরু হয়েছে মারাঠী দলিত আন্দোলনের অনেক পরে। ১৯৪৫ সালে দলিত সাহিত্য নির্দিষ্ট সংজ্ঞা পেয়ে গেলেও ১৯৬৭ সালের আগে মহারাষ্ট্রে সে আন্দোলন তেমন প্রাবল্য লাভ করেনি। বাংলায় এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে সময় নিয়েছে আরো প্রায় কুড়ি বছর। আটের দশকের মাঝামাঝি ‘বঙ্গীয় দলিত লেখক পরিষদ’ গঠনের মধ্য দিয়ে দলিত সাহিত্যের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিকশিত হতে শুরু করে। নকুল মল্লিক হন সম্পাদক, বিমল বিশ্বাস সভাপতি। অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন রণেন্দ্রলাল বিশ্বাস। ১৯৮৭ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে উত্তর ২৪ পরগণার মসলন্দপুরে প্রথম দুইদিন ব্যাপী দলিত সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে কলকাতার সল্টলেকে স্বপন বিশ্বাসের উদ্যোগে গড়ে ওঠে ‘বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা।’ অমর বিশ্বাস হন সম্পাদক, সভাপতি অধ্যাপক জগবন্ধু বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ উষারঞ্জন মজুমদার। এই সংস্থার উদ্যোগে ১৯৯২ সালের ৫-৬ ডিসেম্বর নদীয়া জেলার বগুলার সল্লিকটে ভায়না গ্রামে প্রথম দলিত সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দলিত মানুষদের মাঝখানে গিয়ে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই সংস্থা পরবর্তীকালে উত্তর ২৪ পরগণার হুদয়পুর, হুগলীর খন্যান, মালদহের পাকুয়াহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণার রঘুনাথপুরে (মাধবপুর) ও চক পাঁচঘরিয়ায়, পুরুলিয়ার আদ্রায়, হুগলির কামারকুন্ডু, পূর্ব মেদিনীপুরের কাথি প্রভৃতি স্থানে রাজ্য সম্মেলন এবং রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প ও মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে জেলা সম্মেলন প্রবল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সংগঠিত করে দলিত সংস্কৃতি চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। এই সংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে যেতে থাকে বাঙলার দলিত লেখক, শিল্পী, নাট্যকার, সমাজকর্মী ও পরিবর্তনকামী মানুষেরা। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীচেতনা ভুলে দলিত চেতনার আলোকে দলিত ঐক্য গড়ে উঠবার জমি তৈরি হতে থাকে। দলিত সাহিত্য আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আর একটি সংস্থাও ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গে। দিল্লিকেন্দ্রিক ভারতীয় দলিত সাহিত্য অকাদেমির পশ্চিমবঙ্গীয় শাখা। বর্তমান রাজ্য সরকারের দলিত সাহিত্য অকাদেমির চেয়ারম্যান দলিত লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বর্গ থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে দলিত সাহিত্য, অর্থাৎ “দলিত লেখকের দ্বারা দলিত চেতনা চালিত দলিত বিষয়ে লিখিত সাহিত্য। দলিত সাহিত্যের স্বরূপ নিহিত আছে দলিত সাহিত্যের অভ্যন্তরের দলিত্বের মধ্যে। সাহিত্যে এই দলিত্বের প্রয়োজনীয়তাও স্পষ্ট।”^৫ দলিত সাহিত্যের একটি লক্ষ্য হল দলিত সমাজকে তার দাসত্ব সম্বন্ধে

সচেতন করা। দলিত সাহিত্য দলিতকে এই দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যুক্তি, প্রেরণা ও শক্তি জোগায়। দলিত সাহিত্য উচ্চবর্ণ সমাজ নিয়ন্ত্রিত সার্বিক ক্ষমতার সামনে একটি বয়ান তৈরি করে, দলিতের যন্ত্রণা আর শোষণের বয়ান।

যে সাহিত্য মূলত একটি শ্রেণির জাগরণের জন্য লিখিত সেই সাহিত্যে সমাজ পরিবর্তনের আহ্বান থাকবে, নিছক সৌন্দর্য অনুসন্ধান সেখানে উচিত নয়। দলিত সাহিত্যিকরা বিশ্বাস করেন যে, তাদের সাহিত্যের বিচার সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হওয়া উচিত এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক মূল্যবোধের নিরিখে নির্মিত হবে, নিছক সৌন্দর্যের উপাদানে নয়। প্রতিষ্ঠিত নন্দনতত্ত্ব ও বিচারপদ্ধতির নিরিখে দলিত সাহিত্যের বিচার করা মানে দলিত লেখকের লিখনের মূল দর্শনকে অস্বীকার করা। এই পদ্ধতি তাই দলিত লেখকের কাছে গ্রহণীয় নয়। দলিত লেখকরা নিজেদের লেখার জীবনবাদী, যথার্থবাদী সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র একটি নন্দনতত্ত্বের দাবি করেন, যা প্রচলিত নন্দনতত্ত্বের থেকে ভিন্ন। প্রচলিত নন্দনতত্ত্বের যেখানে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেখানে দলিতের প্রয়োজনীয় নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ আবশ্যিক। অর্থাৎ দলিত লেখকরা নিজেদের সাহিত্যের বিচারের জন্য নতুন মানদণ্ডের দাবি করেন। ফলে নতুন মানদণ্ডের উদ্ভাবন ও প্রয়োগে একটি নতুন নন্দনতত্ত্বের জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

“রিকশা চালাতে চালাতে পেশায় পরিবর্তন হয় কোনও এক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর। তারপর কারও রন্ধনশালায় প্রতিদিন দু’বেলা রান্নার কাজ করে হাত পাকাতে থাকেন নিজের। সময়ের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই লিখতে থাকেন উপন্যাস-লিখতে থাকেন নানা অভিজ্ঞতায় ভরা গল্পের কথা-একের পর এক। শৈশবে বাবার সাথে নদীতে গিয়ে

জাল ফেলা, মাছ ধরার কাজ করতে হয় কোনও এক গোবিন্দদাস শৌভকে এবং সাথে শুরু হয় লেখাপড়ার কাজ। কোনও এক সময়ে হয়ে যান বাস্তুকার-ইঞ্জিনিয়ার। তারপরে গল্পলেখক।”^৬

আবার কোনও এক ‘শ্রীপদ’ নামের বালক রাস্তায় বাবার সাথে জুতো সেলাইয়ের কাজ করতে করতে ঢুকে পড়ে পাঠশালার অঙ্গনে। একান্ত মেধার জোরে কোনও এক নামী কলেজে রসায়নের অধ্যাপক হতে আটকায় না তার। ‘যতীন বালা’ নামের কাউকে দেখা যায় পাঠশালার অঙ্গনে প্রবেশ না করে সেই বয়সে পরের জমিতে দিন মজুরের কাজ করতে। তারপরে কোনো এক সময়ে রাজ্য সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের অফিসারের পদ থেকে বিদায় (অবসর) গ্রহণ করেন।

“মনোহর মৌলি বিশ্বাসের ‘পরাজিত মানুষের গল্প’ ছোটোগল্পগুলিতে কোন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টাই করেননি। আমাদের রাজগাঁর বেঁচে থাকার বা যাতায়াতে বা ঘোরা ফেরা যে কোন জাতের, সে কথাটা হয়তো এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। আবার একটু নিয়তির বিনিময়ে ততো অস্পষ্টও আর থাকে না। ‘দলিত’ বলে যে জনগোষ্ঠী আমাদের সমাজে ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় চিহ্নিত হয়ে আছে, তারা বৃহত্তর ‘হিন্দু সমাজ’ বলে বর্ণিত জনসমাজে সমতুল্য হলেও সমতুল্য হয়ে উঠতে পারেন না।”^৭

মনোহর মৌলি বিশ্বাস এই দলিত জীবনের অস্তিত্বের নিত্যযন্ত্রণার কথা লিখেছেন। লেখার প্রয়োজনে হয়তো কাহিনির একটা কাঠামো অস্পষ্টভাবে বা অতিস্পষ্টভাবে তাকে ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু কোনো সময়ই সেই কাঠামোর প্রয়োজন তাঁর কাহিনির সত্যের চাইতে প্রকটতর নয়। লেখকের এই আনুগত্য তাঁর জীবন সত্যের প্রতি এই একলব্যোচিত বিশ্বস্ততা, তার লেখাগুলিকে মহত্ব দিয়েছে। তাঁর রচনার সেই মহত্ব হয়তো আমাদের সাহিত্য পাঠের অভ্যাসের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই মিলবে না। কিন্তু যদি

আমরা নিজেদের উদ্যোগে ও সাহসে সেই অভ্যাসটুকু ভাঙতে পারি, তা হলে আমরা নিশ্চিতই এমন একটা জীবনের নিত্যতা আবিষ্কার করতে পারব যাকে ‘আমাদের জীবন’ বলতে আমাদের গৌরববোধ হবে।

এখনো দলিত সাহিত্যের সবচাইতে সমৃদ্ধ অংশ হচ্ছে এর ছোটগল্প। যদিও খুব বেশি গল্প সংকলন এখনো অবধি প্রকাশিত হয়নি, তবু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে সব গল্প ছাপা হয়েছে, তার মান এবং পরিমাণ দুটিই বেশ আশাপ্রদ। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোয়, নতুন জীবনবোধে উদ্দীপ্ত গল্পকাররা গল্প পাঠের আনন্দ ফিরিয়ে এনেছেন আবার। এসব গল্পে আঞ্চলিক ভাষা, পরিবেশ, কখনভঙ্গি, সর্বোপরি দলিত-মানস এত সাবলীল ও সুন্দরভাবে ফুটে উঠছে তা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করার।

উল্লেখযোগ্য গল্পকারদের মধ্যে আছেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী, নকুল মল্লিক, ব্রজেন্দ্রলাল মল্লিক, গৌতম আলি, তারকনাথ মাঝি, গোবিন্দ দাস শৌন্ড, শ্যামল কুমার প্রামাণিক, মনোহর মৌলি বিশ্বাস, অচিন্ত্য বিশ্বাস, বেবী হালদার ও লিলি হালদার। ‘চতুর্থ দুনিয়ার গল্প’ নামক একটি গল্প সংকলনে এদের অনেকেরই প্রতিভার পরিচয় ধরা আছে। নকুল মল্লিকের ‘মহাসিন্দু’ গল্পসংকলনে সাম্প্রতিক দলিত মন ও রাজনৈতিক চিত্র সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

আরও যেসব সংকলন এ সময় প্রকাশিত হয়েছে, তা হল যতীন বালার ‘নেপো নিধন পর্ব’ ও ‘গভীর বাঁধে ভাঙন’, গৌতম আলির ‘জতুগৃহের ছাই’ বিমলেন্দু হালদারের ‘আকাশ মাটি মন’, রাজু দাসের ‘ব্রাত্যজনের গল্প’, নকুল মল্লিকের ‘নির্বাচিত গল্প’, শ্যামল প্রামাণিকের ‘খিলি প্রাণের মেয়ে’ এবং কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের ‘অন্য ইছদী’। ‘চতুর্থ দুনিয়া’ থেকে প্রকাশিত ত্রিপুরা, আসাম, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জের গল্পও স্মরণীয়।

দলিত সাহিত্যের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আত্মজীবনী। দলিত সাহিত্যিকরা তাঁদের আত্মজীবনীকে স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছেন, যা তাঁদের একান্ত নিজস্ব। আত্মজীবনীগুলির মধ্যে লক্ষণ মানের ‘উপরা’ দয়া পাওয়ারের ‘বলুতা’ আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছে। সাহিত্যিক শরণকুমার লিম্বালের ‘অঙ্করমশি’ও এক উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনী। “লেখক লিখেছেন, শুধুমাত্র দুমুঠো খাবারের জন্য তাঁর মাকে একাধিক জোতদারের কাছে বিক্রি হতে হয়েছিল।”^{১৮} এই আত্মজীবনীতে লেখক নিজের এবং তাঁর পরিবারের যে অভিজ্ঞতার চিত্র তুলে ধরেছেন তা দলিত জীবনের নির্মম বাস্তব চিত্র। সেখানে কল্পনার কোনো অবকাশ নেই। বাংলা দলিত সাহিত্যে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর ‘ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন’ এক বিশিষ্ট আত্মজীবনী।

উপসংহার

হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা চলে আসছে। ১৮৫১ সালে জ্যোতিরাও ফুলে পুনায় দলিতদের উদ্দেশ্যে যে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তার প্রভাবে দলিত শ্রেণির মানুষের জীবনধারা, চিন্তা চেতনার উর্ধ্বমুখী বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গেও সেই বিকাশের ধারায় দলিত জনজীবনের অগ্রগতির পথ সূচিত হয়েছে। দলিত আন্দোলন, বাংলা সাহিত্যে দলিত চরিত্র চিত্রণে লেখকদের ভাবনা, তার ওপর সাহিত্যে দলিত লেখকদের আবির্ভাব, দলিত সমাজকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছে। সাহিত্যিক চিন্তা-ভাবনায় দলিতরাও স্থান করে নিচ্ছে। এটা দলিত সমাজের জন্য এক আশার দিক। দলিতদের দীর্ঘদিনের অধিকারের লড়াই আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে অনেকটা সফলতার মুখ দেখছে। অধিকারের লড়াই সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকমের রয়েছে। তাই আশা করা যায় দলিতরা একদিন তাদের অধিকারের লড়াইয়ের শেষ দেখবে নতুন ভোরের আলোয়। দলিত সাহিত্য

নিছক সাহিত্যকর্ম নয়, এটি প্রতিনিধিত্ব করে একটি আন্দোলনকে। যে আন্দোলন জাতপাতের কুসংস্কার, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, মুক্তির আলো দেখায়। যেহেতু এটি সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন, তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, এবং এর পক্ষে লেখনীও চালনা করতে পারেন।

তথ্যসূত্র

১. মনুয় প্রামাণিক, *দলিত নন্দনতন্ত্র* (অনুবাদ শরণকুমার লিখালের মূলগ্রন্থ), তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, পৃ. ৪০
২. তদেব, পৃ. ৪১
৩. তদেব, পৃ. ১৪
৪. তদেব, পৃ. ২০
৫. তদেব, পৃ. ৩৪
৬. মনোহরমৌলি বিশ্বাস, শ্যামলকুমার প্রামাণিক ও অসিত বিশ্বাস, *শতবর্ষের বাঙলা দলিত সাহিত্য*, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, পৃ. ২৩
৭. তদেব, পৃ. ১৬১
৮. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, *দলিত মনন* (ডিজিটাল পত্রিকা), বলাকা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পৃ. ২১

প্রফুল্লরঞ্জনের শাক্তপদাবলি : সাধনতত্ত্ব, ইতিহাস ও বিশ্ববোধ

সুরঞ্জন রায়

সারসংক্ষেপ

সুরঞ্জন রায়

অবসরপ্রাপ্ত সহকারি অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
শহীদ আব্দুস সালাম ডিগ্রি কলেজ
কালিয়া, নড়াইল, বাংলাদেশ
e-mail : suranjan.research@gmail.com

প্রফুল্লরঞ্জনের শাক্তপদাবলি কালীসাধন সংগীত হলেও এ সংগীতে একই সঙ্গে তন্ত্রসাধনা ও ইতিহাসের মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশ্বমাতৃত্বের বিষয়ও প্রাধান্য পেয়েছে। এ পদাবলি আঠারো শতকের সৃষ্টি বলে মনে করা হলেও, আসলে এ ধারার গানের মূল প্রথিত আছে হরপ্লা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার মধ্যে, এমনকি দ্রাবিড়দের মধ্যেও ছিলো শক্তিপূজার প্রচলন। আর বেদ ও পুরাণে এ ধারার প্রচলন ছিলো না। শুধু বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণবদের মধ্যে শক্তিপূজার পরিচয় পাওয়া যায়। শক্তিপূজা শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য, দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপ ভূমিতেও প্রচলিত ছিলো তার অসংখ্য প্রমাণ আছে। শাক্তপদাবলি এমনই একটি ধারা যে এ গানের সুরে মোহিত হয়েছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং আরো অনেকে। আর কাজী নজরুল ইসলাম, ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েও রচনা করেন অসংখ্য শাক্তপদাবলি। এ প্রবন্ধটি লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস রচিত শাক্তপদাবলির তন্ত্রসাধনা, বিশ্ববোধ ও ইতিহাস বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে যে মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ের আলোকপাত।

মূলশব্দ

শাক্তপদাবলি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, তন্ত্রসাধনা, বিশ্বমাতৃত্ব, বিশ্ববোধ, মুক্তিযুদ্ধ, নাদ, বিন্দু, বন্যা

ভূমিকা

লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন (১৯০০-৭২) বহুমাত্রিক গানের মধ্যে শাক্তপদাবলির মতো সাধনতত্ত্ব বিষয়ক জটিল ও গুহ্য তন্ত্রশ্রী গানও রয়েছে এবং এ গানে যে ইতিহাস ধারণ করা যায়, তারও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অষ্টাদশ শতকের পরে অনেক সাধক কবি শাক্তপদাবলির মধ্যে অনুষ্ণ যে সকল বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন,^১ প্রফুল্লরঞ্জনের

সে-সব বিষয় ছাড়া তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে কালীমাতার কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে গান রচনা করলেও ঢাকা জেলার ধামরাই থানার আমতা গ্রামের সাধক ভবাপাণ্ডা (১৯০০-৮৪) এ কৃতিত্বের অধিকারী।^২ এদিক থেকে প্রফুল্লরঞ্জনের গান হয়ে উঠেছে সমাজতন্ত্রের বিষয়। এ গানের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে তন্ত্রসাধনার বিষয়টি বিশেষভাবে প্রাধান্য পেলেও প্রফুল্লরঞ্জনের

বিশ্ববোধের বিষয়টি অনুক্ত থাকেনি।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রফুল্লরঞ্জন একজন লোককবি হিসেবে নানা ধরনের গানের মধ্যে শাক্তপদাবলির মতো সাধনতন্ত্রের গানেরও রচয়িতা। তাঁর গানের মধ্যে সাধনতন্ত্রের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপিত হলেও এ পদাবলির মধ্যে যুগপৎ শক্তিসাধনা, শক্তিপূজার উৎস ও ইতিহাস, সাধনতন্ত্রের নানাদিক, শক্তিতন্ত্রের ধারণা, উদ্ভব, বিকাশ, বিশ্ববোধ, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কতখানি প্রযুক্ত হয়েছে তা পর্যালোচনাসহ তাঁর গানের স্বাতন্ত্র্য, মুক্তিযুদ্ধ, পাঠান্তরসহ সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

পদ্ধতি

নিবন্ধটি রচনায় বর্ণনাত্মক পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে প্রফুল্লরঞ্জনের সাতাশটি অপ্রকাশিত শাক্তপদাবলির প্রাধান্য দেয়া হলেও দৈন্যিক উৎস হিসেবে তন্ত্রসাধনা, সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

প্রফুল্লরঞ্জনের গান রচনার সংখ্যা হবে প্রায় ৯৮৫টি। গান ছাড়া তাঁর ৩৫ খানা চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। চিঠিপত্র প্রকাশিত না হলেও তাঁরই চেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছিলো *পল্লীগীতি কবি প্রফুল্লরঞ্জনের শারদীয়া পূজা অবদান* নামে এক ফর্মার একটি পুস্তিকা। দ্বিতীয় সংকলনটির নাম *প্রফুল্লগীতিমালা*। এটি প্রকাশিত হয় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা থেকে। এ সংকলনে প্রফুল্লরঞ্জনের ২৬৮টি গান প্রকাশিত হয়। এই একই নামে আরও একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ১৪০০ সালে বাগেরহাটের ইউনাইটেড প্রেস থেকে। এ সংকলনটি উৎসর্গ করা হয় শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরকে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের *বাংলার বাউল ও বাউল গান* গ্রন্থে বীরভূম জেলার গান হিসেবে

প্রফুল্লরঞ্জনের একটি গান সংকলিত হয়।^৩ পল্লিকবি জসীম উদ্দীনের (১৯০৩-৭৬) *স্মৃতিরপট* গ্রন্থে একটি গান সংকলিত হয়। এ ছাড়া, বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *বৃহত্তর যশোরের কবি ও লোককবি এবং যশোরের গীতিকার ও নাট্যকার* গ্রন্থে জীবনীসহ অনেক গান প্রকাশিত হয়। সুরঞ্জন রায়ের একটি প্রবন্ধে^৪ ও কালিয়া *জনপদের ইতিহাস*^৫ গ্রন্থে তাঁর গান প্রকাশিত হয়েছে।

শক্তিসাধনা ও দেশবন্দনা

শক্তি সাধনা হলো ‘শক্তির সাধনা’। প্রচলিত বিশ্বাস হলো, এ বিশ্ব সৃষ্টির অন্তরালে এক অদৃশ্য শক্তি আছে। সেই শক্তি বলতে বিশ্বমাতৃত্বের (Mother Goddess) প্রসঙ্গ উঠে আসে যে বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই।^৬ নারীর মধ্যে এ শক্তি নিহিত বলে নারীকে বলা হয়েছে ‘মহাবল-ধারিণী’, ‘নানা ঐশ্বর্য-প্রদর্শনকারিণী’ ও ‘বিশ্ব প্রসবিনী’। এ দেবীসত্তা ছাড়া দেবতা যেমন মূল্যহীন, তেমনি ‘শক্তি’ ছাড়া শিব ‘শব’ সদৃশ। তাই দেবসত্তা ও দেবীসত্তা মিলেই পূর্ণ সত্তা, যাকে বলা হয়েছে ‘শিব-শক্তিবাদ’ বা ‘পুরুষ-প্রকৃতিবাদ’; পরবর্তীকালে তাই-ই শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান, বাউল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তন্ত্র ও পুরাণে গভীরভাবে প্রসার লাভ করেছে।^৭

শক্তি সাধনার উৎস হিসেবে ঋগ্বেদের দেবীসূক্তের কথা বলা যায়। তবে আর্যদের মধ্যে নারীর প্রাধান্য বিষয়ে অনেক গবেষক একমত হতে পারেননি। তাঁরা মনে করেন যে, দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মধ্যেই শক্তি সাধনার প্রথম বীজ উগ্ঠ হয়েছিলো। শক্তিপুরাণে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য থাকায় ও আর্যের তন্ত্র সাধনার ঐতিহ্য আর্য সমাজের অঙ্গীভূত হওয়ায়, বেদে ও পুরাণে শক্তিবাদের ধারা প্রবর্তিত হয়। এর সূত্রধরে বৌদ্ধ, জৈন, এমনকি বৈষ্ণবধর্মেও তন্ত্র প্রবর্তিত শক্তিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।^৮ তবে

আর্যেতর জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রসার লাভের বিভিন্ন কারণ ছিলো।^{১৭} এর সূত্র ধরে আর্যেতর জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃশক্তির বিকাশ এবং দেবীকে ‘আদ্যা,’ ‘অদ্বিতীয়া,’ ‘অক্ষরা,’ ‘পুরাণী’ বলা হলেও তিনিই ‘সচ্চিদানন্দরূপিনী পরমেশ্বরী ব্রহ্মময়ী,’ ‘সগুণ ঈশ্বরী,’ ‘মহাবিদ্যা,’ ‘মহাসম্রাজ্ঞী,’ Winternitz-এর মতে, The Great Sakti, the Great Mother, the Goddess, who inspite of her countless names (Durga, Kali, Chandi etc.) is only one, the one Highest Queen (Paremeswari)।^{১০} এর মধ্যে আছে বিশ্বমাতৃত্বের ধারণা। এ ধারণা শুধু ভারতবর্ষীয় নয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশে, যেমন প্রাচ্য ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য, দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপ ভূমি প্রভৃতি স্থানে যে শক্তির পূজা হতো তাতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে দ্বি-মত নেই।

এ সুবাদে বলা যায় হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রাপ্ত নারীমূর্তিই শক্তিপূজার আদি নিদর্শন। এভাবে এ শক্তি দেশ, জাতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির মধ্যে একটি বিশেষ প্রেরণা থেকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন নামে, যেমন— মালসী, প্রসাদী, শ্যামাসংগীত, আগমনী শাক্তপদাবলি হিসেবে গীত হলেও এ গানের মাধ্যমে যে জাতীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিলো, সে উদ্দীপনায় মেতে উঠেছিলো সমগ্র বঙ্গদেশ। এমনকি নবাব সিরাজউদ্দৌলা রামপ্রসাদী শুনে মুগ্ধ হতেন। মাইকেল মধুসূদন ফি না নিয়ে মামলা পরিচালনা করতেন। আর কাজী নজরুল ইসলামের ‘কালো মেয়ের পায়ের তলে দেখে যা আলোর নাচন,’ ‘বল রে জবা বল’ প্রভৃতি গান দেশাত্মবোধ ও ভক্তিবাদের উজ্জীবনেই ঋদ্ধ।^{১১}

শক্তিপূজার ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রভাব

শাক্তপদাবলি আধুনিক কালের সৃষ্টি বলা হলেও তার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। এ গানে যে অনেক যুগের অনেক সংস্কারের বিমিশ্র উপাদান জড়ো হয়েছে তাতে

দ্বিমত নেই।^{১২} নৃবিদ্যা, ভূবিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, এবং যাঁরা বিজ্ঞানভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণের পক্ষপাতী, তাঁরাও একমত হবেন যে, স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে প্রকৃতি ও শক্তিপূজার প্রচলন ছিলো এবং আদিম মানুষেরা মাতৃদেবীর প্রথম পূজারী।^{১৩}

ভারতীয় সংস্কৃতির দুটি ধারার মধ্যে একটি বৈদিক, অন্যটি তান্ত্রিক। প্রথমটি দেবতা প্রধান এবং দ্বিতীয়টি মাতৃ-প্রধান। বেদে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে, মহাকাব্যে ও পুরাণে অনার্যকে অসুর, অনাসা, শিশ্নুদেবা, অযজ্ঞা, অনব্রতা, বায়াংসি, রাক্ষস, দৈত্য, দানব, নিষাদ বলা হলেও এরাই কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির লৌকিক ও তান্ত্রিক ধারাটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তাদের মা শুধু সৃষ্টির মূলে নয়, স্থিতির মূলেও তাঁর অবস্থান।^{১৪} এই মাতৃভাবাপন্নতা প্রচলিত ছিলো আদি অধিবাসী অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গল বা তিব্বতীয় চিন এবং অস্ট্রিকদের উত্তরাধিকার হিসেবে কোল, ভীল, সাঁওতালদের মধ্যে। তাদের দেবীরা হলেন ‘শাক্তরী,’ ‘সীতা,’ ‘বনদুর্গা’ প্রভৃতি। আর্যপূর্ব জাতির মধ্যে দ্রাবিড়রাই বলিষ্ঠতম। পুরাতত্ত্ববিদদের ধারণা হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা ছিলো এ জাতির কীর্তি। তাদের মাতৃ-পূজার বড় প্রমাণ গৌরীপট। ডোনাল্ড এ. ম্যাকেলঞ্জি মাতৃ-পূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বলেন :

The clay figures and phallic bealylic stones suggest that Durga and Shiva worship was a very much greater antiquity in India, than has hitherto been supposed.^{১৫}

অথর্ববেদকে মনে করা হয় শক্তিপূজার উৎস। এ গ্রন্থে আছে বিদ্যা সাধনার বিষয়সহ শক্তিসাধনার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম। আর, শক্তি দেবতার বিষয়টি উপনিষদগুলোতে থাকলেও, পঞ্চম-কার প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে ত্রিপুরোপনিষদে। পুরাণ

হিন্দুসমাজের উৎস স্বরূপ। কেননা, এই পুরাণগুলোতে তত্ত্বকে বোঝানোর পাশাপাশি, দেবতাকে প্রতিমারূপে কল্পনা করা হয়েছে। এ কারণে অনেকের ধারণা পুরাণই পৌত্তলিকতার সূচক। অন্যদিকে বৈদিক সাহিত্যে মাতৃদেবীর প্রভাব থাকলেও মূলত তন্ত্রশাস্ত্রই শক্তি-আরাধনার কল্পভাণ্ডার। আবার তন্ত্রের বামাচার বেদ-বিরোধী, ব্রাহ্মণগণ এ রকম মনোভাব পোষণ করলেও তন্ত্রথল্লে মাতৃকাশক্তির প্রভাব বিন্দুমাত্র কমে যায়নি; বরং ‘তন্ত্রের ধ্যান, জ্ঞান, স্তবস্ততি, জপ, হোম, মন্ত্র, মণ্ডল সব কিছুর’ মূলেই আছেন জগন্মাতা। তাই বলা হয়, ‘মাতৃতান্ত্রিক জাতির মাতৃভাবাসক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তন্ত্রশাস্ত্র।’^{১৬}

বৌদ্ধধর্ম অহিংসবাদের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলেও এক সময় এ ধর্মমতে মাতৃতন্ত্রের প্রভাব ছিলো তখন হিন্দুতন্ত্রের অনুরূপতায় রচিত হয় তন্ত্রথল্লে এবং প্রচলিত হয় মাতৃদেবীর পূজা। বাংলা সাহিত্যে মাতৃভাবের প্রভাব বহু আগে থেকে বর্তমান। সেই বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকের চর্যাপদাবলির মধ্য দিয়ে শুরু করে মঙ্গলকাব্যের মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল এবং অনুবাদ সাহিত্যের রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবপদাবলির লৌকিক স্নেহ-প্রণয় সমন্বিত এমন আবেগপূর্ণ, কবিত্বময় অথচ তন্ত্রপ্রধান রচনার সাহায্যে যে ভাবের প্রকাশ ঘটেছে তা অসাধারণ।^{১৭} বৈষ্ণবপদাবলির মধ্যেও শাক্তভাবের অভাব নেই। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের মধ্যে কৃষ্ণতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্বে শক্তির প্রভাব আছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, ভারতীয় শক্তিবাদে রাধাবাদের বীজ নিহিত। অষ্টাদশ শতকের শাক্তপদাবলিকে মনে হতে পারে অরণ্যের মাতৃ-পিতৃহীন ফুল। আসলে তা নয়। এর আছে ক্রমবিকাশের ইতিহাস।^{১৮}

বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত, পুরাণের মধ্যে দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, তন্ত্রশাস্ত্র; সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটক মালতী-মাধব,

প্রবোধচন্দ্র; শঙ্করাচার্যের স্তোত্র, গোবর্দ্ধন আচার্যের আর্য্যাসপ্তশতীসহ সংস্কৃত ও বৌদ্ধতন্ত্রের কবিতা ও গান; তাছাড়া, বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) ‘বন্দেমাতরম্’ স্বদেশমন্ত্র ও চারণকবি মুকুন্দ দাশের (১৮৭৮-১৯৩৪) কণ্ঠ, এমনকি রবীন্দ্রনাথের ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি / তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!’ গান বাংলার পল্লি অঞ্চল জুড়ে সৃষ্টি করেছিলো অন্য রকম আবহ।

শাক্তপদাবলি কী সুরে, কী শব্দ চয়নে, কী ভাবব্যঞ্জনায় অভিনব ও অসাধারণ। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত ও কৃত্রিমতা বর্জিত যেন সারল্যে ভরা জীবনের অভিজ্ঞান। প্রকাশভঙ্গী অতি সাধারণ ও গ্রামীণ মনে হলেও এ গানের সৌন্দর্যের ঘাটতি নেই। শব্দ নির্বাচনের বিশিষ্টতায় মনে হয়, কাঁচ ও কাঞ্চনে যাঁদের দৃষ্টি সমান, তাঁদের যেন সুন্দর ও পরিপাটি শব্দের প্রতি আকর্ষণ থাকতে নেই। ভাবের আবেগে যে শব্দ এসে গেছে, তাই-ই হয়েছে পদে সন্নিবিষ্ট। এ গানে Best words in the best order তত্ত্ব না মেনে spontaneous overflow of powerful feelings এরই প্রকাশ হয়েছে। এ কথা শাক্তপদাবলিকার ও আমাদের অনিষ্ট প্রফুল্লরঞ্জনের বেলায়ও সমানভাবে প্রযুক্ত। এ গানে সুরের বিশিষ্টতা এমনই যে, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নবাব, রাজা, সাধক ও ফকির সবার মধ্যে নিয়ে আসে অনবদ্য তন্ময়তা।^{১৯}

শক্তিতত্ত্ব ও সাধনতন্ত্রের নানাদিক

এ গানগুলোর মধ্যে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি ও যোগের বিষয় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এ গানে সনাতন ধর্মের উপাস্য ও উপাসনাতন্ত্রের বিভিন্নমুখী ধারা শাক্তপদাবলির স্রোতধারায় একীভূত হয়ে গেছে। বিশ্বপ্রকৃতির অচিন্ত্যলীলা দেখে দার্শনিক হার্বাট স্পেন্সর যেমন বলেন : An infinite and eternal Energy from which all things proceed.

তাত্ত্বিক সাধকও তেমনি করে বলেন :

বিশ্বভুবনে ও বিশ্বের অন্তরালে এক মহাশক্তির লীলা চলিতেছে। সেই অদ্বৈত শক্তি-উৎস হইতেই বিশ্বের যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তির বিকাশ : জড়ে ও জীবনে এই শক্তির লীলা। এই শক্তিই তাপ ও আলো, এই শক্তিই নাদ বা শব্দ : অবস্থাভেদে ইহাই স্থিতিশীল ও গতিশীল (Static & Dynamic); এক কথায় সৃষ্টির যাহা কিছু, সবই তিনি।^{২০}

এই শক্তির নানামুখী বিশ্লেষণ আছে কাশ্মীরী শৈবদর্শনের মধ্যে, সেখানে শক্তির ছত্রিশটি তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে।^{২১} তন্ত্রসাধনার মুখ্য বিষয় হলো শিব ও শক্তি, নাদ ও বিন্দু, শব্দব্রহ্ম ও কুলকুণ্ডলিনী। এ নিত্য বস্তু বিষয়ে বুঝবার বা বোঝাবার সাধ্য কারও নেই। তা 'অপ্রতর্ক', আর্থার আভালনের (Arthur Avalon) মতে যা : Beyond all human conception and discussion; মহাশক্তি অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নির্বিশেষ ও নিরূপাধি অবস্থাই শিবের ব্রহ্মময়ী অবস্থা, অর্থাৎ পরম শিবের অবস্থা। শক্তি ও শিব এখানে অভিন্ন।^{২২}

এত উপাচারে রচিত প্রফুল্লরঞ্জনের যে সংগীত তা কি শুধুই সংগীত? তা নয়। এর প্রতিটি বর্ণ, অক্ষর ও শব্দ যেন সাধনতত্ত্বের উপাচারে সমন্বিত মায়ী, প্রকৃতি, আগম, নিগম, নাদ, বিন্দু, শব্দব্রহ্ম, কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ। এভাবে শক্তির বোধন মানেই অপার আনন্দ, অপার তেজ, আনন্দের অথৈ সমুদ্রে ভেসে বেড়ানো। এ রকম সাস্ত্রীতিক উচ্চারণে যেন শব্দব্রহ্মে লীন হওয়ার প্রত্যাশা। সাধকের এ প্রত্যাশার সঙ্গে প্রফুল্লরঞ্জনের প্রত্যাশা সমন্বিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রকমারিতে রচিত হয়েছে শাক্তপদাবলি; যে পদের রচয়িতা হিসেবে প্রফুল্লরঞ্জন যথেষ্ট শক্তিশালী একজন কবি। তবে যে অর্থে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম শাক্ত পদাবলিকার হয়ে উঠতে পারেননি, প্রফুল্লরঞ্জনও তথৈবচ। তন্ত্রগান ও প্রশ্নোত্তরমূলক গান রচনার অনুপ্রেরক হিসেবে গোপাল ফৌজদারের

নাম যেমন উঠে আসে, শাক্তপদাবলির ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যক্তির অনুপ্রেরণা কাজ করেছে। তাঁর মাতৃ বিষয়ক গান এমনই যে তাঁকে বলা হতো 'ছোট রামপ্রসাদ'।^{২৩}

বিশ্লেষণ

প্রফুল্লরঞ্জনের তন্ত্রসাধনা বিষয়ক গানের পর্যালোচনা
প্রফুল্লরঞ্জনের শাক্তপদাবলির মধ্যে যুগপৎ মাতৃভাব ও তন্ত্রসাধনার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি স্বল্পসংখ্যক গানের মধ্যে যে দক্ষতায় সাধন-প্রণালী উপস্থাপন করেছেন তা মুগ্ধকর। এ সাধনায় দেহ একটি অনিবার্য প্রসঙ্গ। এবং তা এমনই যে, দেহ যেন macrocosm in microcosm। এই দেহকে বৃত্ত করে সীমার মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা জাগিয়ে তোলাই সাধনার অন্যতম লক্ষ্য। আর শক্তি-সাধনার তাৎপর্য দেহের মধ্যে নিহিত বলেই, সাধক পুরুষার্থ লাভের সহায়ক এই দেহকেই বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন।^{২৪} প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের নিম্নোক্ত গানটির মধ্যে এ বিষয়টি বিধৃত হয়েছে। গানটি তিনি রচনা করেন ৫/৪/১৩৩৩ তারিখে, যখন তাঁর বয়স ২৫ বছর। এ বয়সে এ গানের সৃষ্টি অভিনবত্বের সূচক।

শুভক্ষণে কর মন গমন সচ্চিদানন্দ নগরে।

তুই চিদানন্দে কাল কাটাওবি

পৌছিলে সেই নগর পরে ॥

আধার মূলে চতুর্দল উপর,

সার্দ্র ত্রিধাবর্তে শ্যামা শিরোপাছ পর।

সেথায় আবরিছে প্রবেশের দ্বার

শীর্ষদেশ সুবিস্তার করে ॥

অপানে প্রাণ সমাধান করে,

প্রাণ অপানের সমন্বয়ে সূক্ষ্ম প্রকারে।

জাগায়ে তায় হৃৎকারে

পুরোভাগে রাখবি তারে ॥

তদুর্ধ্বতে নগরের সংস্থান
সহস্র প্রাকারে ঘেরা পূর্ণ দ্যুতিমান
তথায় বিরাজে সর্বশক্তিমান
সুন্দর মন্দির ঘরে ॥

প্রফুল্ল কয় নিত্যানন্দময়
আনন্দ নগরে সদা পূর্ণানন্দে রয়।
হবে পূর্ণেতে পূর্ণিমার উদয়
মোহান্ধকার যাবে সরে ॥^{২৫}

গানটির পাঠান্তর নিম্নরেখায়ুক্ত পঙ্ক্তি বা শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। কর=কর না; পুরোভাগে রাখবি তারে=আরোহন কর দ্বিদল পরে; সুন্দর মন্দির ঘরে=প্রণবের নিঃসঙ্গ পরে; নিত্যানন্দ ময়=নিত্যসত্ত্বময়। গানটিতে দেহতত্ত্বের বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। ‘আধার মূলে চতুর্দলের উপর’ বলতে বোঝানো হয়েছে ষট্চক্রের বিষয়। দেহের গুহ্যদেশ থেকে শিরোদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত নাড়ী-মণ্ডালে আছে ছয়টি চক্র বা পদ্ব। এ পদ্বগুলোর নাম মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আঞ্জা। গুহ্য ও লিঙ্গদেশের মধ্যে সুষুন্না নাড়ীমুখে ‘আধার’ পদ্বের অবস্থান। এটি চারটি দলযুক্ত এবং এই দলে মাতৃ কাবর্ণ স্বরূপ ব, শ, ষ ও স সন্নিবিষ্ট। সুষুন্না নাড়ীর মুখকে বলে ‘ব্রহ্মদ্বার’। ‘সার্ক ত্রিধাবর্তে’ বলতে বোঝানো হয়েছে যে, এই ব্রহ্মদ্বার মুখ দ্বারা আচ্ছাদন করে সাপের মতো ভূজগাকার বা সার্ক ত্রিবৃত্তাকারে জগন্মোহিনী কুণ্ডলিনী শক্তি শীর্ষদেশ বিস্তৃত করে সপ্ত অবস্থায় বিরাজমান। এ অবস্থায় তার যে শ্বাস-প্রশ্বাস তাই-ই জীবের জীবনপ্রবাহ। অন্যদিকে, দেহের যাবতীয় ক্রিয়া বায়ুদ্বারা সাধিত হলেও এই বায়ু দশ রকমের- প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ধ্যান এবং নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এই বায়ু দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করলেও এদের মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়াই প্রধান। হৃদয়দেশে অবস্থিত প্রাণবায়ু জীবের জীবন। এই বায়ুই শ্বাস-

প্রশ্বাস সঞ্চালন করে। এবং সাধারণত নাসারন্ত্র থেকে নাভি পর্যন্ত প্রাণবায়ু, আর নাভির নিম্নদেশ থেকে যোনিমূল পর্যন্ত গমনাগমন করে অপানবায়ু। এই বায়ুদ্বয়ের বিরোধের ফলে জীবন রক্ষা পায়। অবিরোধ মানেই অনিবার্য মৃত্যু। প্রফুল্লরঞ্জনের গানে ‘অপানে প্রাণ সমাধান করে / প্রাণ অপানের সমন্বয়ে সূক্ষ্ম প্রকারে, / জাগায়ে তায় হৃৎকারে / পুরোভাগে রাখবি তারে’।^{২৫} অর্থাৎ এই দেহে বায়ুজনিত বিষয়ে প্রাণ অপানের মধ্যে সূক্ষ্ম সমন্বয় সাধন করে যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগিয়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এরপর ‘তদুর্ধ্বতে নগরের সংস্থান / সহস্র প্রাকারে ঘেরা পূর্ণ দ্যুতিমান / তথায় বিরাজে সর্বশক্তিমান / সুন্দর মন্দির ঘরে’।^{২৫} তৃতীয় অন্তরার এ পঙ্ক্তিগুলোতে যে নগরের কথা বলা হয়েছে সেটি জীবদেহের মস্তক। এখানে ‘সহস্র প্রাকারে ঘেরা পূর্ণ দ্যুতিমান’ হলো মস্তকে ‘পূর্ণেন্দুশুভ্র’, ‘পূর্ণপীযুষপূর্ণ’ সহস্রার পদ্ব। এই পদ্ব শুক্রবর্ণ ও অধোমুখ; এবং এর ‘সহস্র দল’কে বলা হয়েছে ‘সহস্র প্রাকার’। সাধকের সর্বসিদ্ধির স্থান এ পদ্বের পরিমণ্ডলটি অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। এখানে ‘বিরাজে সর্বশক্তিমান/সুন্দর মন্দির ঘরে’ অর্থাৎ সহস্রার এ পদ্বটিতে একদিকে সগুণ ব্রহ্মময় শিব অবস্থান করছেন, অন্যদিকে এখানেই আবার ‘নির্বাণ-শক্তির মধ্যস্থ ব্রহ্মরূপ পরশিবের আধার’। এই শিবস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সাধকের চূড়ান্ত লক্ষ্য।^{২৬} এই জায়গাটিকে প্রফুল্লরঞ্জনের গানে বলা হয়েছে ‘সচ্চিদানন্দ নগর’ (সৎ+চিৎ+আনন্দ= সত্তা, চেতনা ও আনন্দে অর্থাৎ নিত্য জ্ঞানময় ও সুখস্বরূপ ব্রহ্মের আবাস স্থল),^{২৭} যেখানে পৌঁছালে চিদানন্দে (চিৎ+আনন্দে পরমব্রহ্মের সন্নিধান) কাল কাটানো যাবে। অর্থাৎ শ্যামা মায়ের সাধনার বলে মানুষের দেহাভ্যন্তরে ব্রহ্মময় শিব শক্তির পূর্ণতা নিয়ে সেই ‘আনন্দ নগরে’ সর্বদা ‘পূর্ণানন্দে’ ‘পূর্ণিমার উদয়’ ঘটিয়ে মোহান্ধকার দূর করা যাবে। ভণিতায়

প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের সে রকম প্রত্য্যাশাই পরিব্যক্ত হয়েছে।

পরের গানটিও দেহতত্ত্বের। এ গানে ‘কেশীঘাট,’ ‘নরবলি,’ ‘কৈবল্যদায়িনী,’ ‘ত্রিবেনী ঘাট,’ ‘সার্দ্র ত্রিবলয়াকার’ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। ১৮/২/১৩৫৩ তারিখে রচিত এ গানে কালীঘাট বলতে সাধনায় সিদ্ধিলাভের স্থান নির্দেশ করেছেন। পৃথিবী হলো ভবেরহাট, এখানে নানা কর্মের মধ্যে ভয়ঙ্করী মা কালী যেভাবে মানুষের মুণ্ড কাটে, অনুরূপভাবে কেশীঘাটে (বাস্তবে কেশীঘাট বলে বৃন্দাবনে একটি ঘাটের অস্তিত্ব আছে) অসংখ্য মানুষের হচ্ছে নরবলি। এ বলির অর্থ সাধনরাজ্যে অনগ্রসরতা। যোগমায়ার যোগ প্রভাবে সাধনায় জয়ী হতে পারলেই জয় কালী বলে বিজয় ঠাটে যাত্রা করতে হবে এবং সাধনার ক্ষেত্র স্বরূপ সে মন্দির আছে দেহের মধ্যেই। মানুষের শরীরে যে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী আছে তার মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নারই শ্রেষ্ঠত্ব। এই নাড়ীত্রয়ের সম্মিলন স্থানকে বলা হয় ত্রিবেনী অর্থাৎ মূলাধার। এই নাড়ীই বায়ু চলাচলের পথ— প্রাণবাহিনী। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে রেচক, কুম্ভক, পূরকের সাহায্যে ঘুমিয়ে থাকা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই চতুর্দল ঘাটে অবস্থিত মায়ের সান্নিধ্য লাভ ত্বরান্বিত হবে। আর গুহ্য ও লিঙ্গদেশের মাঝখানে সুষুম্না নাড়ীমুখে আধার পদ্মের অবস্থান। এই পদ্মের আছে চারটি দল, যাকে বলা হয়েছে চতুর্দল ঘাট। সার্দ্র ত্রিবলয়াকার প্রসঙ্গটি আগেই উল্লিখিত হয়েছে। প্রফুল্লরঞ্জন সময় থাকতে মাকে নিয়ে যে ‘সহস্রার’ পাটে যেতে চেয়েছেন সে জায়গাটি দেহের ছয়টি চক্র বা পদ্মের। তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে ষটচক্রের পরে সহস্রার অবস্থান।

কাজ কিরে মন ভবের হাটে।

এবার তুমি আমি এক সাথে

যাই চলো যাই কালীঘাটে ॥

ভবের হাটে ভেঙ্কী বাজী নর বলি কেশী ঘাটে
সেই ঘাটেশ্বরী ভয়ঙ্করী কেশে ধরে মুণ্ড কাটে ॥

কৈবল্য দায়িনী কালী সদয় হলে মায়া কাটে
চল জয় কালী জয় কালী বলে যাত্রা করি বিজয় ঠাটে ॥

বেশি দূরে নয় সে মন্দির আধারে ত্রিবেনী ঘাটে
সেথা সার্দ্র ত্রিবলয়াকারে মা আছে চতুর্দল ঘাটে ॥^{২৫}

১০/৭/১৩৫৩ তারিখে রচিত তৃতীয় গানটিতে কুণ্ডলিনী মা, হংসিনী, ব্রহ্মযোগ, জম্বুদীপ, সহস্রায় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ দেহতাত্ত্বিক বিষয়ের ইঙ্গিত থাকলেও, বিষয় বৈশিষ্ট্যে গানটি তেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

শাক্তপদাবলির রচয়িতা নির্ভুর কাপালিক নন। তাঁরা উদার মৈত্রীভাবাপন্ন, সমন্বয়বাদী, সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক দলাদলির উর্ধ্বে তাঁদের অবস্থান। শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণগত বৈষম্যমুক্ত এক বিশেষ শ্রেণির মানুষ বলে তাঁদের পরম প্রত্য্যাশা ‘মাতৃপদ’। এটাই তাঁদের দিন ও রাত্রির চিন্তা। সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে তাঁদের যে আত্মহ, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টি, তাই-ই তাঁদের সাধনা। এ রকম একটি বোধ থেকে মহাশক্তিকে সহায় করে ‘ভব পারে’ যাবার প্রত্য্যাশা বর্ণিত হয়েছে প্রফুল্লরঞ্জনের এ গানটিতে। তিনি এ গানের দ্বিতীয় অন্তরায় বলেছেন ভবসিন্ধু পার হতে গেলে আগে ব্রহ্ম বিন্দুকে ধারণ করতে হবে। এরপর যোগাচারের উর্ধ্বগামিতার ফলে অর্জন হবে যোগেশ্বরীকে। আমরা জানি ‘নাদ’ শুধু স্পন্দনই নয়, দীপ্তিও। এই নাদ থেকে বিন্দুর সৃষ্টি। অসম্ভব সূক্ষ্ম বলে এর মধ্যে কোনো সৃষ্টি নেই। এই সৃষ্টিহীন অপর, অব্যক্ত, অপ্রাকৃত ও সূক্ষ্ম নাদের ঘনীভূত অবস্থাই ‘বিন্দু’। এ বিন্দু স্থূল নয়, অব্যক্ত মহাবিন্দু। এই নাদ বিন্দুকে আশ্রয় করে মূলাধারে অবস্থিত যোগেশ্বরীকে যোগের সাহায্যে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং এই যৌগিক ক্রিয়ার পাশাপাশি দশজন ইন্দ্রিয়কে দাঁড়ি করে ও ষড়রিপুর হাতে দেহতরীর গুণ তুলে দিয়ে অর্থাৎ

এদের বশীভূত করে অতঃপর বাদাম উড়িয়ে দিয়ে
কপির দিকে নজর রাখার কথা বলা হয়েছে। গানটির
অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো :

যদি তুই যাবি ভব পারে।

মহাশক্তি সহায় করে

হাল ধরায় দেগে তারে ॥

করে আর ব্লাক বাজারী করিসনে বোজাই ভারী

সুগোনে ধরগে পাড়ি ফুল চাঁদের জোয়ারে।

যত করবি দিন গুজারি ততই পড়বি ফ্যারে

আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনাইলে

নামবে বাদল মুঘল ধারে ॥^{২৫}

প্রফুল্লরঞ্জনের শাক্তপদাবলির পাঠান্তর ও বিশ্ববোধ

প্রফুল্লরঞ্জনের শাক্তপদাবলির পাঠান্তর এ আলোচনায়
আনার উদ্দেশ্য এই যে, এর সাহায্যে দেখা যাবে
গানের সুন্দর ও নান্দনিক পাঠের জন্যে আগের ও
পরের পাঠের গুরুত্ব। আমরা এ বিষয়ে কোনো
রকম পক্ষপাতিত্ব না করে শুধু পাঠকবর্গের সামনে
এ গানগুলো উপস্থাপন করতে চেয়েছি এ বিবেচনা
থেকে যে, গানের পঙ্ক্তি অদল বদল করলে গানের
বিষয় কত সুন্দর, বা সুন্দরতর হয়ে ওঠে তা বিচার
করার জন্যে :

করণা কর অধীনে করণাময়ী জননী।

আমি বাক্য অর্থ তানলয়ার্থ

ভিক্ষার্থী শিবদায়িনী ॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিনী

সর্বভূতের আধারেতে আধার রূপিণী

তুমি আগম নিগম প্রসবিণী

পুরুষ প্রকৃতি রূপিণী ॥

বাক্য অর্থ মনের অগোচর

উপনিষদে বিশদে করেছে বিচার

বর্ণিতে শক্তি হয় বা কার

শক্তি না দিলে জননী ॥

স্তব স্তুতি গান কিছুই না জানি

মা শব্দ মমতায়ুক্ত শাস্ত্রে তাই শুনি

আমি মা মন্ত্রে পদ্মদল দানি

পূজিব চরণ দুখানি ॥^{২৬}

যাঁকে উপনিষদে অবাঙমানস বলা হয়েছে এবং যাঁর
বর্ণনার শক্তি বাল্মীকি, ব্যাস, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস
কারোরই নেই; কবি সেই শক্তির স্তব স্তুতি না জেনেই
শুধু মা নামের মাধুরীতে পদ্মফুলের দল তাঁর রাতুল
চরণে নিবেদন করে পূজা করার বাসনা প্রকাশ করেন।
এ গানটিতে ভক্তের আকৃতি প্রকাশিত হয়েছে। কবির
এ গানটির কিছু পাঠান্তর আছে। নিগম=নিগমাতীত;
মমতায়ুক্ত=মমতাপূর্ণ; মন্ত্রে পদ্মদল দানি=মন্ত্রেতে
ঘটপদ্মেতে।

নিচের গানটিতে ভক্ত হৃদয়ের আকৃতির প্রকাশ
ঘটেছে। এ আকৃতি শব্দের অর্থ অভিপ্রায় বা অভিলাষ।
ভক্তের আকৃতি আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। এ গানটিতে
একজন সাধকের তথা প্রফুল্লরঞ্জনের বিশ্ববোধের
প্রকাশ ঘটেছে। তিনি হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা
মানুষের ওপর ঢেলে দিয়ে যে অর্থে বলেন, 'যে আছে
যে প্রদেশে যে ধর্মে যে বিশ্বাসে / তারা সব অনায়াসে
পায় যেন চরণ তরী / যত ধর্ম বিদ্বেষ কলঙ্কের শেষ
/ চলে যাক দূরে সরি' সে অর্থ কত ব্যাপক এবং
বিশ্ববোধ সমন্বিত তা গানটি পড়লেই অনুভূত হবে :

আমা হতে দুঃখী যত ক্ষুব্ধার্ত মর্মাহত

দাও তাদের স্নেহামৃত যার যতটা দরকারী

আরও দুঃখের বোঝা কঠিন সাজা

দাও আমি শিরে ধরি ॥

পাপী তাপী ডেকে তোমায়, যদি মা সাড়া না পায়

তাহলে কোন ভরসায় কান্দবে তোমার নাম স্মরি?

তাদের শীতল কোলে লও মা তুলে

মুছায়ে আঁখি বারি ॥

যে আছে যে প্রদেশে যে ধর্মে যে বিশ্বাসে

সব তারা অনায়াসে পায় যেন চরণতরী ।

যত ধর্ম বিদ্বেষ কলঙ্কের শেষ

চলে যাক দূরে সরি ॥

প্রফুল্ল কয় মুক্তকেশী, মায়াপাশ ফেলো গো নাশি

জীব-জগৎ উঠুক ভাসি হাসিতে বদন ভরি;

আমি তাই দেখে প্রসন্ন মুখে

কাটাই দিবা শব্দী ॥^{২৫}

কবি এ গানে পরের দুঃখ-কষ্টের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেবার জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে বলেন যে, পাপী-তাপীরা যেন মায়ের শীতল ছায়া থেকে বঞ্চিত না হয়। যেহেতু মা বিশ্বজনীন তাই দেশ-কাল-পাত্র-ধর্ম-বর্ণ ভেদে যেন এ নিয়ম বহাল থাকে। ধর্মের বিদ্বেষ ও কলঙ্ক মোচন করে মুক্তকেশী মহামায়ারূপ কালীকে মায়াপাশ ছিন্ন করে মানুষকে মানুষ হিসেবে বিশ্ববোধে জাগরিত করার জন্যে কবির প্রার্থনা অনুরণিত হয়েছে এ গানটিতে। গানটির পাঠান্তর : নাম স্মরি=নাম করি; আঁখি বারি=চক্ষের বারি; হাসিতে বদন ভরি=মধুর হাসি বিস্তারি; আমি তাই দেখে প্রসন্ন মুখে=আমি নাম রসে বেহালের বেশে।

কবি তারা মায়ের চরণ পূজা করতে চান। কিন্তু ভক্তি, স্তুতি, আবাহন গীতি কিছুই জানেন না। এ-সবের দরকারও নেই। কারণ জগজ্জননী মা-ই তো জগতে সব কিছুর উৎস। কবি জ্ঞানকে পুরোহিত পদে বৃত্ত করে ষড়পদ্ব অর্থাৎ দ্বিদল, চতুর্দল, ষড়দল, দশমদল, দ্বাদশদল ও ষোড়শদল পদ্বকে পুষ্প ও দেহকে নৈবেদ্য করে জগন্নাতার চরণে অর্পণ করবেন এবং শরীরের ইন্দ্রিয়নিচয়কে পূজাপোকরণ করে দেহ-মন তাঁর চরণে সমর্পণ করবেন। আর, কামাদি ছয় রিপু অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যকে দক্ষিণা স্বরূপ তাঁর পায়ে নিবেদন করবেন। কবির মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানার দরকার নেই। তিনি জানেন অস্তিমা কালে মাতৃমন্ত্রই আসল। গানটি প্রফুল্লরঞ্জনের আত্মনিবেদনের ফলশ্রুতি :

বিশ্ব তোমার দয়ায় গড়া, সর্বভূতে তোমার সাড়া,
কি আছে মা তোমা ছাড়া ভব ভয় হরা অভয় দায়িনী ॥

জ্ঞানকে দিয়ে পুরোহিত পদ, পূজিব শ্রীপাদ পদ্ব
পুষ্প করি ষড় পদ্ব দেহ নৈবেদ্য দিব জননী ॥

উপকরণ ইন্দ্রিয়চয়, দেহ-মন সমর্পিব পায়,
কামাদি রিপু ছয় জনায় দক্ষিণায় অর্পিব জননী ॥

প্রফুল্ল কয় তন্ত্র মন্ত্র কিছুই আমার নাই স্বতন্ত্র
জানি শুধু মাতৃমন্ত্র অস্তিমে মোর পারের তরণী ॥
(২৩/৬/১৩৩৬)^{২৬}

গানটির পাঠান্তর : দেহ-মন=আত্মমন; শুধু=মধুর।
পূজাবিধি বিষয়ক এ গানটির সঙ্গে সাধক রামপ্রসাদের ‘মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রম মাটি দিয়ে’ গানের ভাবগত মিল থাকলেও মৌলিক রচনায় প্রফুল্লরঞ্জনের দখল অসামান্য। এ গানে মায়ের জগজ্জননী রূপের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি তো সামান্য নন। হিংসা তাঁর অপছন্দ। তাই বলিপ্রথা পরিহার করে মিস্তি কলা, আতপ চালের নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করলে মানুষের অহংকার দূরীভূত হবে। তবে সবাব আগে দিতে হবে আত্মবলি, অর্থাৎ স্বার্থবলি দিতে পারলেই তবেই সার্থকতা।

তৃণ মাটির মূর্ত্তি করি সাজালি তায় কত করি
মনোময় মাণিক্য ধরি সাজালি না মহামায়ায় ॥

অজা মেষ মহিষ সংহারে পূজিলি তায় হিংসা করে
বিশ্বকে যে প্রসব করে সে কি কারো রক্ত খেতে চায়?
মিস্তি রঙা আতপ চালে, নৈবেদ্য সাজালি থালে,
তন্ত্রে মন্ত্রে ঢাকে ঢোলে অহংকারে তুই পূজিলি শ্যামায় ॥
প্রফুল্ল কয় আত্ম বলি দিতে হয় সব সার্থ বলি,
বাদ্য ভাণ্ড করতালি মা মন্ত্রে অঞ্জলি দিতে হয় ॥^{২৭}

তারা মাকে উদ্দেশ্য করে এ গানটি একটি অন্যরকম
অভিব্যক্তির সূচক। মা ভক্তি পছন্দ করেন। কবির

ধারণা, যারা ভক্তি করে মাকে ডাকে মা তাদের বেশি কষ্ট দেন। অন্যদিকে যারা শৌর্য ও বীর্যবান তাঁদের ঘরে মায়ের দৃঢ় অবস্থান। তাই মাকে পেতে 'যেমন মা তার তেমনি ছেলে' হওয়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে :

জানি গো জননী তারা আমি জানি গো তোরে।
ভক্তি করে ডাকলে পরে যাতনা দিস তারে দ্বিগুণ
প্রকারে ॥

মা মা বলে ভক্তি ভরে স্তব স্তুতি যে জন করে
দুঃখানলে দক্ষ করে রাখিস তারে জীযন্তে মেরে ॥

শৌর্য বীর্যে যে জন বান্ধে বান্ধা থাকিস তারি ফাঁদে
হরের বাঞ্ছিত পদে ভয়ে দিলি তুই মহিষাসুরে ॥^{২৫}

কবি শ্যামা মাকে বাজিকরের মেয়ের মতো ভেবেছেন। কেননা, বাজিকরের মেয়ে যেমন বহু সাজে ও বহু রঙ্গে অভিনয় করে, শ্যামা মায়ের লীলাও অনুরূপ। তিনি কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি। কখনও নগ্ন হয়ে তরোবারি হাতে যুদ্ধে সামিল হন এবং লজ্জা, ঘৃণা পরিত্যাগ করে শিবের বুকের ওপর পা রাখেন। অর্থাৎ 'প্রকৃতি পুরুষ অদর্শনে তাণ্ডব নৃত্য করেন এবং নিজ শক্তিকেই এককসত্তায় দেখেন, তাই কালী ভয়ঙ্করী ও রণমূর্তি ধারিণী; তখন তিনি পুরুষকেও গ্রাহ্য করেন না; তাহাকেও পদদলিত করেন, তাই পদতলে শিব'-এর অবস্থান।^{২৬} এ প্রসঙ্গে কবি ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি গানের কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি মা কালীর মদমত্ত বেশকে বলছেন, 'মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়।'^{২৭} রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।'^{২৮} তাঁর প্রমত্ত নৃত্যে দশদিক যেন অন্ধকার হয়ে যাবে। কালীর পদতলে শিবের অবস্থান ও নানাবিধ রূপ সম্পর্কে হরলাল ভট্টাচার্যের মন্তব্য :

শক্তি-সাধকদের কালী মূর্তিটি খুবই বিজ্ঞান সম্মত; কালী পদতলে শিব (পুরুষ) বা স্ট্যাটিক শব্দরূপে বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শায়িত। আর কালীমূর্তিটি কর্ম-শক্তি (dynamic force) বা প্রকৃতিস্বরূপ। এই

বিশ্ব সংসারে বা এই কাল রাজ্যে যিনি ক্রিয়মান তিনিই কালের ঈশ্বরী, কালনী (ঈ) = কালী; তাই কালী ঘোর-কৃষ্ণ (deep blue বা dark blue) বা নীল-ঘন শ্যাম বর্ণা। তিনি উলঙ্গিনী (প্রসব কালে), উন্মাদিনী (গর্ভ যাতনা ও প্রসব বেদনা কালে), সহাস্যবদনা বা অভয়া (সন্তান পালনে) এইরূপে কালীকে সহনশীলা, মমতাময়ী, স্নেহশীলা ইত্যাদি বলা হয়। প্রকৃতি (কালী) জগৎ সংসার প্রসব করেন, তাই তিনি বিশ্বজননী। কালী এই বিশ্বের প্রবৃত্তির কারণ স্বরূপা; মানুষের প্রবৃত্তিগুলিই কালস্বরূপ; ঐ কালকে কালী নাশ করেন। ইন্দ্রিয় সকল মানুষের শত্রু, ঐগুলির একনাম রিপু; ঐ সকল মানুষের প্রবৃত্তির কারণ, উহারা অসুর তুল্য। তিনি অসুর নাশিনী; তাই হাতে অসি ও নরমুণ্ড এবং কণ্ঠে নর-মুণ্ড মালা। তিনি স্নেহময়ী মাতা, তাই একহাতে অভয় বাণী অন্য হাতে বরাভয়।^{২৯}

কালীর নৃত্যে পৃথিবীর কম্পনকে বলা হয় শক্তি। ঋষি অরবিন্দ শক্তির এ প্রকাশকে বলেছেন Strength : There is in her an overwhelming intensity, a mighty passion of force to achieve, a divine violence rushing to shatter every limit and obstacle.^{৩০}

সাধনা ও ইতিহাস

নাটক ও উপন্যাসে ইতিহাসের বিষয় যুক্ত হলেও, এমনকি কবিতাতেও সে জীবন মূর্ত হয়ে উঠলেও গানে যে ঐতিহাসিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, সেদিক থেকে প্রফুল্লরঞ্জন নতুন না হলেও শাক্তপদাবলির মাধ্যমে প্রকাশটি কিছুটা হলেও ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর সমসাময়িক কালে ভবাপাগলা মাতৃসংগীতে এ বিষয়ের অবতারণা করেন।^{৩১} প্রফুল্লরঞ্জন শাক্তপদাবলির তিনটি গানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা ও ভূমিকম্প ও তার সুদূর প্রসারি ফলাফল সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা সদ্য

দেশবিভাগ হওয়া একটি দেশের জন্যে মারাত্মক হুমকি। কবির ধারণা অকালে প্রবল বন্যা ও ভূমিকম্প শ্যামা মায়ের সংহার মনস্কতার ফলশ্রুতি। তিনি নিষ্ঠুরভাবে এ খেলার সৃষ্টি করেছেন।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত শাক্ত পদাবলী (চয়ন) গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, শাক্ত-বিষয়ক গানের সংখ্যা তিন হাজারের মতো হলেও রচনাকারের সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে অধিকাংশের ধারণা, তা প্রায় দেড় শতাধিক হবে। সবাই পরলোকগত। তাঁদের মধ্য থেকে ২৯৮টি গানের সংকলন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি গানের রচয়িতার সন্ধান মেলেনি।^{৩৪} তাঁর প্রদত্ত বিষয়সূচি অনুযায়ী পদাবলিগুলো ষোল ভাগে শ্রেণিকরণ করা হলেও কোনো পদাবলিতে দেশের বন্যা, ভূমিকম্প, মানুষের দুর্গতি, দেশত্যাগ, স্বাধীনতা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই। সদ্য বিভাজিত দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে মায়ের কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে গান রচনা যেন কিছুটা অন্য রকম। এছাড়া, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রফুল্লরঞ্জনের গানে ১৯৭০ সালের গণভোট, আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, মুসলিম লীগের পরাজয় এবং স্বাধীনতার জন্যে বাংলার বুক উড়িয়ে দেয়া হলো যে বিজয় নিশান তা উচ্চারিত হয়েছে। ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার নামে তালবাহানা করে অবশেষে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে এবং নিরীহ অসহায় জনগণের ওপর শুধু নয়, আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, হত্যা ও অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি ব্যাপক লুটপাট চালায়। হিন্দুরা প্রাণের দায়ে ভারতে যাওয়ার পথে স্বাধীনতা বিরোধীদের দ্বারা বিভিন্ন জায়গায় লুটপাট ও অত্যাচারের শিকার হয়।

বিভাগ পরবর্তী পাকিস্তানের বন্যা ও ভূমিকম্পের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধও যে শাক্তপদাবলির বিষয় হতে

পারে, তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন প্রফুল্লরঞ্জন। এদিক থেকে তাঁর গান হয়ে উঠেছে ইতিহাস ও সংগীতের মেল বন্ধন। সেই সময়ের বন্যা, ভূমিকম্প ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনার জন্যে প্রফুল্লরঞ্জন শ্যামা মাকে দায়ী করে গান লিখেছেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৩৫৫ সালের বন্যা ও ভূমিকম্প বিষয়ক গান (রচনার তারিখ ১০/০৬/৫৫ ও ১৮/০৬/৫৫ ও একটি তারিখবিহীন) ঐতিহাসিক দলিল বিশেষ। এ গান তিনটিতে প্রায় একই বিষয় উল্লিখিত হলেও, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্নতাও আছে। আর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গানটি রচিত হয়েছে যুদ্ধ চলাকালীন ভারতে বসে।

১০/০৬/৫৫ তারিখে রচিত গানে তিনি বলেন যে, বন্যার প্রবল তোড়ে জল ও স্থল একাকার হয়ে গেছে। প্রলয়ের বেগে বান ছুটছে। এর ফলশ্রুতিতে মানুষ, গরু, গাছপালাসহ কৃষকের ফসল— সব ডুবে গেছে। এমন বিপর্যস্ত অবস্থায় মানুষেরা হচ্ছে দেশান্তরি। দেশান্তরির ঘটনা দীর্ঘদিনের। এমনকি আজও বাংলাদেশের মানুষের দেশান্তর হওয়া একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। বন্যার সময় কেউবা টোঙ্গের পরে বসে ভাবছে কী করা যায়। বাজারে সব জিনিসে যেন আশুণ লেগেছে। দুর্ভিক্ষের জন্যে অনাহারে মরছে মানুষ। কবি ভেবেছিলেন ১৯৪৭ সালে সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে সুখের দিন আসবে। জয়শ্রী বাঁধা থাকবে প্রতি দ্বারে। কিন্তু হঠাৎ অশনিপাতে জীবজগৎ ছারখার হয়ে গেল। আসলে তারা মায়ের ইচ্ছাতেই তো সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয় এবং এর মধ্যে কোনো মঙ্গল নিহিত থাকলেও জীবনের এ-পারে ও ও-পারের আশ্রয়স্থলই তো মা তারা।

শ্যামা কি নিষ্ঠুর খেলা খেললি মা
সৃষ্টি কি করবি লয় এইবারে।

অকালে প্রবল বন্যা ভূমিকম্প মাগো
পাঠালি সন্তানের সংহারে ॥

জল স্থল একাকার, অথৈ পারাবার,
প্রলয় বেগে ছুটেছে বান ছেড়ে হুঙ্কার
হাহাকার উঠেছে সংসারে
তলাতল মানুষ গরু তৃণ তরু মাগো
কৃষির বল ডুবেছে পাথারে ॥

ছেড়ে কেউ বাড়ি ঘর, যাচ্ছে দেশান্তর
কেহ কেহ ভাবছে বসে ভাসা টোঙ্গের পর ।
আগুন দর চড়েছে বাজারে ।
এলো ঘোর মন্বন্তর, হৃদকম্প জ্বর মাগো
কত জীব মরছে অনাহারে ॥^{২৫}

উপরিউক্ত গানের অনেক কথা নিচের গানে পুনরাবৃত্তি
হলেও নতুন কিছু সংযোজন, যেমন উনুনে জল, টেঁকি
ঘরেও জল। ধান ভানার কলের অভাবে মানুষ না
খেয়ে মারা যাচ্ছে। নদীর ঘাটে নেই কোনো খেয়া।
রাস্তার ওপরে ভেলা চলছে। এমন বিপর্যস্ত অবস্থায়
হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারত চলে যাবার উদ্যোগ
নিয়েছিলো। তখন কালিয়া অঞ্চলে স্টিমার চলতো।
দুই একদিন দেশত্যাগী যাত্রীদের ভিড় দেখে স্টিমার
কূলে না ভিড়িয়ে চলে গেলে সারেংকে কম গালমন্দ
শুনতে হয়নি। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে থাকা যাবে
না বলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা আগেই দেশত্যাগী
হয়েছে। এখন বন্যার অজুহাতে সে প্রবণতা আরও
বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণপঞ্জি
হিসেবে গানটির গুরুত্ব কম নয়।

শ্যামা মা বন্যাতে ডুবালি পূর্ব পাকিস্তান ।
কি অপরাধ করলো মাগো
এতগুলি সুসন্তান ॥

ডুবেছে ধান তৃণ তরু, ভেসে গেছে মানুষ গরু,
চাষীর হৃদয় শুষ্ক মরু, চিন্তাজ্বরে ম্রিয়মান ।
দেশে এলো ঘোর মন্বন্তর, জলে সরে এসেছে জ্বর
উঠেছে করুণ কণ্ঠস্বর
হায় খোদা হায় ভগবান ॥^{২৬}

এভাবে প্রফুল্লরঞ্জনের শাক্তপদাবলির মধ্যে সাধনতত্ত্ব ও
ইতিহাসের মেল বন্ধন ঘটিয়েছেন, যার মধ্যে প্রযুক্ত
হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের
ওপর রচিত শাক্তপদাবলিটি একটি নতুন বিষয়ের
অবতারণা করে। বিষয়টি অনুধাবনের জন্যে গানটি
উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

ঘটালি গণভোট, হিসাব করে মোট
মুজিবর বিজয়ী হলো পেয়ে অনেক ভোট ।
পরাস্ত হলো অন্য দলে,
জয়ীরা জয় বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে মাগো,
জয় নিশান তুলিল সকলে ॥

খান সাহেব লুভী লোক, পেলো দারুণ শোক,
ভোটে হেরে কমে না তার গদির পরের রোক ।
বেড়াজাল পাতলো সুকৌশলে,
শেষে শেখ সাহেবকে বন্দী করলো মাগো,
ঢাকাতে পরামর্শ ছলে ॥

অস্ত্রবল হাতে তার পাশ করলো অর্ডার,
আওয়ামী লীগ যেখানে পাও করো সব সংহার ।
মালায়োন পোড়াও সব অনলে,
করলো অগ্নি সংযোগ হত্যা লুণ্ঠন মাগো,
ভরলো দেশ ক্রন্দন কোলাহলে ॥

হিন্দুরা প্রাণের দায়, ছুটলো ইন্ডিয়ায়,
ডাকাত পড়ে কাড়লো পথে সম্বল আর সহায় ।
বর্ডারে এলো নিঃসম্বলে ।
এসে সরকারের সাহায্য পেয়ে মাগো,
নির্ভয়ে আছে শিবির তলে ॥^{২৭}

শাক্তপদাবলির সমাজতত্ত্ব

জগতে যা কিছু সামাজিক, তা সবই সমাজতত্ত্বের
উপাদান। একজন কবি প্রথমত সামাজিক, অতঃপর
নির্মিতর গুণে ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীত, জ্ঞান থেকে
জ্ঞানাতীত, বিষয় থেকে বিষয়াতীত হওয়ার চেষ্টা
থাকলেও, তাঁর সূত্রপাত হয়েছে সামাজিক ইতিহাস,

নৃত্ত্ব ইত্যাদির সূত্র ধরে। শাক্তপদাবলির মধ্যে মানবীয় অনুভূতি, মহিমাময় বোধশক্তি, বিষয়বুদ্ধি থেকে পরিভ্রাণের চেষ্টা সবই সমাজতত্ত্বের বিষয়। বোধি (Intuition) দ্বারা পরমসত্তার উপলব্ধিজনিত মানসচাঞ্চল্য মরমীবাদের বৈশিষ্ট্য হলেও, বন্ধন-মুক্তি, দেহ থেকে দেহাতীত, বিরহ-মিলন, সুদূরকে নিকট করা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, একাকীত্বের মধ্যে পূর্ণতা, বিষাদ-আনন্দ এবং প্রেমকে যতই অপ্রাকৃত এবং অন্তর্গত সত্য-শিহরণের অনুভূতি ব্যতীত জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা বিচার করা না গেলেও বিষয়টি কিন্তু সমাজ এবং সামাজিক মানুষেরই বিষয়। আর প্রেম যতই স্বর্গীয় হোক না কেন, তার সৃষ্টি মানুষের মর্মলোকে। তাই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে যাবতীয় ঘটনা, এমনকি সীমা অসীমের বিষয়টিও সমাজতত্ত্বের বিষয়। দেহ আছে বলে দেহাতীত বিষয়ের প্রতি আগ্রহ দুর্নিবার হয়ে ওঠার মধ্যে যতই তত্ত্ব অনুসন্ধানের চেষ্টা হোক না কেন, এবং ভাঙে ব্রহ্মাণ্ড খোঁজার চেষ্টা অব্যাহত থাকলেও, তন্ত্রসাধনায় যাকে বলা হয় 'মৈথুনতত্ত্ব,' তা সমাজতত্ত্বের প্রজননক্রিয়ার একটি শ্রেষ্ঠ বিষয়। অতি প্রাচীন এ তত্ত্ব সাংখ্য, গীতা, যোগ, তন্ত্র মিলে প্রাচীন কাল থেকে সৃষ্টি হয়েছে দেহতাত্ত্বিক সাধনা। এই দেহতত্ত্ব মরমিবাদের মূল বিষয়, যা বিশ্বতত্ত্বের বৈচিত্র্যে, জ্ঞানতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচারে পূর্ণতা পেয়েছে বেদান্ত দর্শনে।^{৩৫}

প্রফুল্লরঞ্জনের গানে যতই তত্ত্বের কথা থাক না কেন, তা বাস্তবতার পরিপন্থী নয়। এ তো গেল একদিক। অন্যটি হলো সমাজভাষা। একালে রামপ্রসাদ থেকে গুরু করে যে সকল শাক্তকবিগণ গান রচনা করেন, তাঁদের ভাষা নিত্যদিনের সাধারণ মানুষের ভাষা। অনুরূপভাবে প্রফুল্লরঞ্জনের শাক্তপদাবলির মধ্যে প্রযুক্ত কৃষি-কর্ম, বিষয়-সম্পত্তি, মামলা-মোকদ্দমা, জমিদারি তালুক, দলিল-দস্তাবেজ, লেন-দেন, ভবেরহাট, কালীঘাট, দুঃখের বোঝা, মায়ামমতা,

বাজিকরের মেয়ে, রঙের অভিনয়, বাঁশির সুর, কায়েমী মৌরশী স্বভূ, চাকরি, ওঠ বন্দী জমা, খাজনা, সন কিস্তি, মহিষবলি, পাঠাবলি, বিচারের প্রার্থনা, ব্লাক বাজারী প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ নিত্যদিনের হলেও, প্রায়োগিক দক্ষতায় হয়ে উঠেছে যেমন অসাধারণ, তেমনি সমাজতাত্ত্বিক। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মানুষের ভারতে চলে যাওয়ার বিষয়টি রাজনৈতিক হলেও সমাজতত্ত্বেরই বিষয়।

সমাজতত্ত্ব এমন একটি বিষয়, যা কিছু সমাজ ও মানুষ সংশ্লিষ্ট তার সবই এ বিষয়ের অধিভুক্ত। তাই বলা যায়, গান, কবিতা, দেহাতীত প্রেমচেতনা, অসীম সসীম প্রসঙ্গ সমাজতত্ত্বের বিষয়। কেননা, এগুলো মানবীয়। শাক্তপদাবলির তত্ত্বও মানুষ সংশ্লিষ্ট এবং মানুষকে নিয়েই এ তত্ত্বের পূর্ণতা ও বিকাশ। এদিক থেকে বলা যায়, শক্তিসাধনা, শক্তিসাধনার উৎস ও বিকাশ, সাধনতত্ত্বের নানাদিক, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব সবই সমাজতত্ত্বের বিষয় ছাড়া আর কিছু নয়। এ সুবাদে বলা যায়, প্রফুল্লরঞ্জনের শাক্তপদাবলির মধ্যে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই সমাজতত্ত্বের বিষয়।

উপসংহার

প্রফুল্লরঞ্জনের শাক্তপদাবলি শুধু কালিসাধনার অনুধ্যান হয়ে থাকেনি। এ গানের মধ্যে দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় যেমন যুক্ত হয়েছে, তেমনি তৎকালীন পূর্ব বাংলার বন্যা ও ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিসহ চূড়ান্তভাবে বিশ্ববোধের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, তাই-ই আছে দেহভাণ্ডে। এরকম চিন্তন থেকে তাঁর শাক্তপদাবলি রচিত বলে, এ গানের মধ্যে যুগপৎ সাধনতত্ত্ব, ইতিহাস ও নন্দনতত্ত্ব একাকার হয়ে গেছে। ঠিক সে কারণে এ গানগুলো সমাজতত্ত্বেরও বিষয়। এদিক থেকে শাক্তপদাবলি প্রফুল্লরঞ্জনের যেমন সাধনার ধন,

তেমনি হয়ে আছে ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের উদাহরণ এবং বিশ্ববোধের সমন্বিত রূপ।

তথ্যসূত্র

১. অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, শাক্ত পদাবলী, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০২। এ গ্রন্থে অজ্ঞাতনামা কবির রচনাসহ প্রায় ১১৪ জন কবির গানের তালিকা (পৃ. ১৫১-৫৫) এবং প্রায় ষোলো রকম বিষয়ে গান রচনার নমুনা আছে (বিষয় সূচি দ্রষ্টব্য)
২. গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী, ভবাপাগলার জীবন ও গান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫
৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ ১৪০৮, পৃ. ১০৩৮-৩৯
৪. সুরঞ্জন রায়, 'কালিয়ার আঞ্চলিক ভাষার গান : লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন,' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল, ১৪শ সংখ্যা ১৪১৩, পৃ. ৯১-১১০
৫. সুরঞ্জন রায়, কালিয়া জনপদের ইতিহাস, র্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৮৪, ৩২৭-২৮
৬. এ বিষয়ে অধ্যাপক বলরাম শ্রীবাস্তব তাঁর *Iconography of Sakti* (১৯৭৮) গ্রন্থে বলেন : The archaeological discoveries of Mother Goddess figurines throughout the areas of prehistoric world, essentially the Eastern Europe, Western Asia, Persia and India indicate that the Cradle land of the Mother Goddess cult was in the Southern Russian Steppes and Western Asia.
উদ্ধৃত: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪০
৭. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-৭১

৮. ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৫১৩-১৪
৯. “আদিম আর্যের জাতির যাদু-শক্তিতে বিশ্বাস, ধর্মের আনুষঙ্গিক নানা গুহ্যক্রিয়া, মন্ত্রে আস্থা, শক্তি-পূজার প্রবণতা, দেবতার পত্নী-রূপে দেবীর কল্পনা, হঠযোগ, ধর্ম-সাধনায় নর-নারীর দৈহিক ও মানসিক মিলন-কল্পনা, নানা দেব-দেবীর পূজা, প্রাক বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদ-উপনিষৎ প্রভৃতির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শেষে উহারা একটি উপাসনা-পদ্ধতি ও মতবাদের দার্শনিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া তন্ত্র-ধর্ম নামে একটি বিশিষ্ট ধর্মে পরিণত হইয়াছে। বৈদিক আর্য-ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে এই আর্যের তন্ত্র-ধর্মের একটি ধারাও ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত ছিল বলিয়া মনে হয়। মন্ত্র, যন্ত্র, বীজ, মুদ্রা, মণ্ডল, যোগ ও নানা গুহ্য প্রক্রিয়াই ইহার মূল ভিত্তি।”
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃ. ১৮৬
১০. উদ্ধৃত: জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা, ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৮৯
১১. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ১-৪
১২. Winternitz বলেন : There is no doubt that this Goddess and her cult do unite traits of very different deities, Aryan as well as Non-Aryan. A History of India Literature, Vol-1,
উদ্ধৃত : জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ১৩
১৩. R.S.Tripathi বলেন: From time immemorial India is home of the worship of Prokriti or later Sakti.
History of Ancient India. উদ্ধৃত : জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ১৩

১৪. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ১৩, ১৪
১৫. উদ্ধৃত : জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ১৪ ও ১৫
১৬. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ২১
১৭. বৈষ্ণব ধর্মসাধনার একটি প্রামাণিক গ্রন্থ *গৌতমীয় তন্ত্র*। এ গ্রন্থে বীজমন্ত্রে সাধন বিষয়ে দীক্ষা, পূজা, ন্যাস, প্রাণায়াম সম্পর্কে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সবই শক্তি তন্ত্রানুসারী। রাধাতন্ত্র নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে : ‘ভোগ ছাড়া যোগ হয় না, অতএব তুমি শক্তিসহায়ে যোগ সাধনা কর। মথুরা ও ব্রজমণ্ডল দেবীর কেশপীঠ, তথায় কাত্যায়নী দেবী বিরাজমানা, সেখানে পদ্মিনীর সহিত কুলাচার-পদ্ধতিতে সাধনা কর, সিদ্ধি সুনিশ্চিত।’
- জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ২৫
১৮. বস্তুতঃ তন্ত্রশাস্ত্রই যে বাংলার শাক্ত কাব্যগুলির অন্যতম উৎস তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু শক্তিবাদের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস হইতে দেখা গিয়াছে, তন্ত্ররূপ সাধন-শাস্ত্র রচিত হইবার পূর্বেও শক্তি সাধনার ধারা চলিয়া আসিতেছিল। বেদ, দর্শন ও পুরাণে মাতৃকা দেবীর তত্ত্ব ও লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শক্তি-সাধনার ক্রিয়াগুলি তন্ত্রের নিজস্ব হইলেও তন্ত্রে দেবীর লীলা বর্ণনা করা হয় নাই। অতএব তন্ত্র শাস্ত্রকে শাক্তপদাবলীর মূল উৎস বলিয়া স্বীকার করিলেও, বেদ, দর্শন ও পুরাণের প্রসঙ্গও উপেক্ষা করা যায় না।
- জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা, ২৮
১৯. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৪৮
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
২১. সেগুলো : ১. পাঁচটি শুদ্ধতত্ত্ব : শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, বিদ্যা; ২. সাতটি শুদ্ধতত্ত্ব : মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা (অবিদ্যা), রাগ, পুরুষ; ৩. ২৪টি অশুদ্ধ তত্ত্ব : প্রকৃতি, মহৎ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, মন; পঞ্চতন্ত্রাঃ : রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ; দশ ইন্দ্রিয় : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক; কর্মেন্দ্রিয় : বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ; পঞ্চভূত : ক্ষিত্তি,
- অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৮৯
২২. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৯০
২৩. মহসিন হোসাইন, *বৃহত্তর যশোরের লোককবি ও চারণকবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১২৩
২৪. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ১৩৩
২৫. প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।
২৬. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ১৩৪-৩৫
২৭. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১১০৭
২৮. শ্রী হরলাল ভট্টাচার্য্য, *গীতা আলোচনা ও গীতা চিন্তাকথা*, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৩৪
২৯. শ্রী অমরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, *শাক্তপদাবলী*, পৃ. ৫২
৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতাবিতান*, তুলি-কলম, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃ. ৮০১-০২
৩১. শ্রী হরলাল ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৩৩-৩৪
৩২. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ১১৪-১৫
৩৩. তিনি শাক্তপদাবলিতে সাস্প্রদায়িক দাঙ্গা, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষয় ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গানে ইতিহাসকে ধারণ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গানে বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে বলেন :
- ভবাপাগলার অভিমান,
আর কেন দেবী, শোন হে কাণ্ডারী,
মুজিবরে হও অধিষ্ঠান ॥
- গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী, পৃ. ৮৯-৯১
৩৪. অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, পৃ. ভূমিকা (ব)
৩৫. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমী কবি পাঞ্জু শাহ জীবন ও কাব্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৮

বিপণনের বিশ্বে মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে প্রসঙ্গ অমর মিত্রের ক'টি গল্প

শ্রাবন্তী মজুমদার

সারসংক্ষেপ

শ্রাবন্তী মজুমদার

পিএইচডি গবেষক

বাংলা বিভাগ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

e-mail : shrabamghe@gmail.com

বিশ শতকের শেষ দিকে বা একবিংশ শতকের প্রথমার্ধে দাঁড়িয়ে আমরা সাহিত্যের মাধ্যমে যে সময় এবং সমাজকে খুঁজে পাই তা কোনো না কোনোভাবে বিশ্বায়িত। ফলে সমকালের একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিকের সাহিত্যমূল্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি তাঁরই চোখ দিয়ে এমন একটা কালপর্বকে অবলোকন করা দেশ ও বৈশ্বিক বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অমর মিত্র বিশ শতকের শেষ প্রান্তের একজন বিশিষ্ট কথাকার। সুতরাং উত্তর ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আধুনিক সাহিত্যের একজন প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক কীভাবে পারিপার্শ্বিকতাকে অনুধাবন করে থাকেন এবং সেই অন্তরগ্রাহ্য আবেদনের বহিঃপ্রকাশই বা কীভাবে সাহিত্যে ছাপ ফেলে সেই দিকটির ওপর আলোকপাত করা যেমন এই আলোচনার উদ্দেশ্য পাশাপাশি আট-নয়ের দশকের মুক্ত অর্থনীতি ও ভুবনায়নের দৌলতে মধ্যবিত্তের জীবনে যে দোলাচলতার শুরু হয়, যে সংশয় ক্রমশ মুছে দিতে থাকে গ্রাম ও শহরের মধ্যবিত্ত দূরত্ব- তারই প্রেক্ষিতে বিজ্ঞাপনের মোহিনী জগৎ কীভাবে প্রলুব্ধ করে তার অন্বেষণ এই আলোচনার মুখ্য বিষয়।

মূলশব্দ

বিশ্বায়ন, বিপণন, বিজ্ঞাপন, পরিবর্তিত সমাজ, মধ্যবিত্ত, দ্বন্দ্ব

ভূমিকা

বিশ শতকের প্রান্তলগ্নে বিশ্বব্যাপী যে বিশ্বায়নের ঝড় উঠেছিল তার ওলট-পালট হাওয়া এসে লেগেছিল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও। না-খেতে পাওয়া মানুষগুলোর নাকে এসে লেগেছিল 'বিলিতি' সুবাস। ঘরে বসে বহির্বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার এই প্রলোভন তখন কে ছাড়বে! একটি ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে চাল-ডাল-আলু-জামা-জুতো-ফ্রিজ এমনকী

কচুরলতির এই সমষ্টিগত কনসেপ্টের শুরুটা ছিল এই হাওয়ায় ভেসেই। তবে এই মোহময় বাজার আর গ্রাহকের মধ্যে দূরত্ব ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞাপন। তারপর বিজ্ঞাপনই ধীরে ধীরে হয়ে যায় একটা বিনোদন (!) এবং ব্যবহারের সূত্রে দৈনন্দিন জীবন থেকে উপভোক্তা নিজেই কখন যে সেই বিজ্ঞাপনের জীবন্ত মডেল হয়ে ওঠে তার গোপন রহস্য আর অব্যক্ত থাকে না। শুধু তাই-ই

নয়, এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় মিডিয়ার রঙিন প্রতিফলন আম-জনতার স্বাভাবিক জীবনে ব্যাপ্ত হয়ে গড়ে তুলেছে এক অদ্ভুত ফ্যান্টাসির জগৎ। সেই সঙ্গে অর্থনীতির শ্রেণি বিন্যাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে মধ্যবিত্ত-মূল্যবোধ।

বিশ্লেষণ

১

বাণিজ্যিকীকরণের রমরমা ও বিজ্ঞাপিত জীবনের সূত্র ধরেই অমর মিত্র বলে যান এমন এক গল্প, যার মূলে রয়েছে পণ্যায়ন ও ভোগবাদের ভুবনব্যাপী রঙিন দুনিয়া। গল্পটির নাম ‘উড়োমেঘ’, ১৯৯৩ সালে শারদীয় প্রতিক্ষণে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরে অমর মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়।

এই গল্পে উপর-নিচে রয়েছে দুটি পরিবার। এক তলায় রয়েছে মালা এবং আবিরের পরিবার, দোতলায় রয়েছে নন্দিনী ও সন্দীপদের পরিবার। এক তলায় টালার জলাধার থেকে জল এসে সরাসরি জমা হয় রিজার্ভারে। ফলে উপরে, নন্দিনীদের ঘরে পাম্প মারফৎ সে জল পৌঁছায়। একতলা এবং দোতলার যে শ্রেণিবিন্যাস তাতে প্রয়োজন ছাড়া নন্দিনীরা এক তলায় নামে না ঠিকই তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত, বিনোদনের দুর্নিবার হাতছানিতে রোজ উপরে উঠে আসে মালা। উপরের ঘরের একটি রঙিন টিভি আছে এবং একটি কেবল কানেকশন নিচের মালাকে চুম্বকের মতো টানতে থাকে। কিন্তু এমন একটি দিন আসে, যেদিন পাম্প খারাপ হয়ে যায় আর খুব স্বাভাবিক ভাবে সুন্দরী-শিক্ষিত-স্মার্ট নন্দিনীকে নিরুপায় হয়ে মালার স্যাঁতসেঁতে নোনাধরা পঁচিশ ওয়াটের লালচে আলো-জ্বলা বাথরুমে নেমে আসতে হয়। যে মালাকে রোজ নন্দিনীর ঘরে যেতে হতো টিভি দেখার জন্য সেই নন্দিনীকে স্নানের জন্য মালার

দ্বারস্থ হওয়ার মধ্যে কোথাও যেন এক কৌলিন্যের জন্ম দেয়। এভাবে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের টানাপড়েনের সঙ্গে যুক্ত থাকা আত্মসম্মান বা আত্ম অবমাননাকে মিলিয়ে দিয়ে এই দুই নারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে গল্প লিখে যান অমর মিত্র। শুধু এক বেলার জিতে যাওয়া নয় বরং জলহীন পাম্পের কাছে মালা খণ্ডী হয়ে যায় কারণ তার দরুণ সে ফ্রি-তে ঘরে বসেই বিদেশী সাবানের গন্ধে নিজেও বিহ্বল হয়ে যেতে পারে বলে। সে নিজে যেন নন্দিনীর স্নানের গন্ধ মেখে নেয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মালা আর তার কৌতূহল চাপা রাখতে পারে না, সাবানের নাম জিজ্ঞেস করে বসে নন্দিনীকে। অন্যদিকে নন্দিনী যেনো এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। তবু সে ততোধিক নিঃস্পৃহ গলায় প্রলুদ্ধ মালার কাছে বিদেশী সাবানের গুণগান গেয়ে যায়—

বিদেশের বলতে পার, তবে এখানেও তৈরি হচ্ছে, নতুন বেরিয়েছে, এখন হয়তো এ পাড়াতেও এসে গেছে, আমি পার্কস্ট্রীট থেকে কিনেছিলাম... স্টারে যা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে এটার ভাবতেই পারবে না, তিন থেকে সাড়ে তিন মিনিট ধরে একটা অ্যাড প্রায় গল্পের মতো যেন, কেবল এনেছিলাম ভাগি!... আর এটাতো এক্সক্লুসিভলি ফর উইমেন, মেয়েদের জন্য তৈরি হয়েছে।^১

এই গল্পে একটি সাবানকে কেন্দ্র করে ঘটনাক্রম এগিয়েছে এবং সেই সাবানের মনোহরণকারী বিজ্ঞাপন বয়ে এনেছে কেবল টিভি। মূলত কলোনিয়াল সিভিল সোসাইটিতে বিপণনের বিপুল সমারোহ এবং বিশ্বায়নজাত ফ্রি-মার্কেটের দৌলতে নয়ের দশকের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পণ্যমুখরতা ও তার মোহময় বিজ্ঞাপনকেই উপজীব্য করে লেখক অমর মিত্র তুলে ধরেন নতুন একটি ধারাকে। যখন ক্ষুদ্র এবং নিঃস্ব হয়ে যাওয়া পৃথিবীটা জনসাধারণকে একটি বোকা বাস্তব বন্দি করে নিতে চাইছে ঠিক

তখনই সেই যূপকাঠে অগ্নি সঞ্চারণ করেছে কেবল টিভি নেটওয়ার্ক। সাদা-কালো টিভির মায়াবী জগৎ ধুসর হয়ে গিয়ে স্বমহিমায় প্রবেশ করছে রঙিনটিভি। মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে বিপন্নতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে এভাবেই অমর মিত্র লিখে যান সময়ের বিন্যাসে ভেসে আসা সব উড়ো মেঘের গল্প।

সাবান এবং সাবানের বিজ্ঞাপনকে নিজের মতো করে উপভোগ করার জন্য মালার মধ্যে এই যে বিহ্বলতা তা সে সঞ্চারণিত করে দেয় আবিরের মধ্যে। পণ্যসামগ্রী এবং বিশ্বায়িত ভুবনের গহীনে ডুবে সে কেবল কানেকশন নেওয়ার জন্য আবিরকে প্ররোচিত করে। অথচ আবির যখন জানতে পারে একটা ডিশ বসালে পুরো এলাকার টিভির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় অন্য দেশের টিভির প্রোগ্রাম, যখন জানতে পারে ডিসের একটি কানেকশনই এসবের জন্য যথেষ্ট তখন কিম্ব সে বিপন্ন বোধ করে। তার নিভৃত সুখী গৃহকোণের জন্য সে ব্যথিত হয়ে পড়ে। ওদিকে মালা আবিরকে চিরকুটে গন্ধ সাবানের নাম লিখে দেয়, আবির অফিসে যাওয়ার পর লুকিয়ে লুকিয়ে উপরের রঙিনটিভির উন্মাদনায় মেতে ওঠে। এমন কী সময় নির্ধারণের জন্য মালার আর ঘড়ির দরকার হয় না। টিভির জিংগল, অনুষ্ঠানের শব্দময়তা তাকে জানিয়ে দেয় কখন কটা বাজে। সে যদি ঘুমের ভেতরে শোনে ‘আয়াম এ কমপ্ল্যান গার্ল...’;^২ তাহলে আচমকা দুম করে উঠে বসে। সে জানে কোন সাক্ষ্যকালীন অনুষ্ঠানের সৌজন্যে এই বিজ্ঞাপন। এরপর টিভির শোয়ের সমান্তরালে মালাও সন্ধ্যায়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

মূলত এভাবেই নয়ের দশকের একান্নবর্তীতা ভেঙে টিভি যেন একটি অভ্যেসে পরিণত হয়ে যায়। আর এই অভ্যেসকে মুদ্রিত করতে গিয়ে অমর মিত্র বলে চলেন বদলে যাওয়া বিশ্বের গল্প। যার ফলে

আমরা দেখতে পাই মালা এবং আবিরের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে কীভাবে টিভি একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠছে। মালা তার নিদ্রিত স্বামীকে পাশে রেখে গভীর রাত পর্যন্ত টিভি দেখে। এভাবেই তাদের রোজকার দাম্পত্যে জায়গা করে নেয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া। টিভির পর্দায় চোখ রাখতে রাখতে তারা অনায়াসেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কথা ভুলে যায়, টিভির জগৎ প্রবেশ করে জীবনে। ক্রমশ তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের ছবি মুছে দেয় হাইপার-রিয়ালিটি। অর্থাৎ যে নিস্পৃহ গৃহবধু বাসনওয়ালার সঙ্গে গল্প করে দুপুর কাটাত বা রাস্তার জমাদারের কাছে হাঁক পেড়ে জানতে চাইত তার সংসারের হাল-হকিকত তাদের মতো সরল মেয়েদের জীবন থেকে অলসকালীন আলাপচারিতাকে হরণ করে নেয় এই মিডিয়াময় জগৎ।

শুধু তাই নয়, প্রসাধন সামগ্রীর মাতাল করা বিজ্ঞাপন এবং নারীকে পণ্যায়ন করার এক মোহময় প্রতিবেশও রচিত হয়ে যায় এই গল্পে। ধীরে ধীরে টিভির প্রোগ্রামের পাশাপাশি বিজ্ঞাপনও সমান বিনোদনমূলক বিষয় হয়ে ওঠে। আর তাই স্টার টিভিতে সাবানের বিজ্ঞাপন দেখার জন্য মালা নিজেও যেমন উন্মুখ হয়ে থাকে তেমনই স্বামীকেও বাধ্য করে। আমরা দেখি যে আবিীর রোজকার ঘামগন্ধ জীবনে বাস-ট্রামে বা দোকানে শৌখিন সামগ্রী বিক্রি দেখতে অভ্যস্ত ছিল সেও একদিন ঘরের নিজস্ব সাদা-কালো টিভি ছেড়ে সন্দীপ-নন্দিনীর রঙিন টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আবিীর বিষণ্ণ হয়ে ভাবতে চেষ্টা করে সে গন্ধ কেমন হতে পারে? তার অফিস যাত্রাপথে ট্রাম-বাসে ধূপকাঠি ফেরি করে বেড়ায় যে সুদর্শন অথচ ক্ষয়টে যুবক, যার বর্ণনা সে কান পেতে শোনে এ গন্ধ কি তেমন না আরো গুরুতর কিছু ভাবতে ভাবতে আবিীর বিপন্ন বোধ করে। আসলে

এই বিষণ্ণতা ও বিপন্নতা আবিরের একার নয় তা যেন আমাদের পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থারই অর্জন।

আসলে স্টারটিভির বিজ্ঞাপনের সাবানটি ছিল একটি কোলাবোরেরেটেড প্রোডাক্ট। অর্থাৎ ভারত এবং ফ্রান্সের মধ্যে এমন কিছু ব্যবসায়িক চুক্তি হয়েছে যার ফলে ভারতে বসে ফরাসি সুগন্ধি কিনতে পারবে কলকাতার রমণীরা। এবং সেই রমণীরাই মালার মতো নিরুত্তাপ গৃহিণীকে সাবানের টোপ দিয়ে প্রলুব্ধ করে। বিজ্ঞাপন দেখে নন্দিনী সাবান কিনেছে আবার সেই সাবান নিয়েই মালার অপরিষার স্নানঘরে ঢুকে নিজের সর্বাপেক্ষে সাবানের সৌরভ ছড়িয়ে নিজেই জীবন্ত বিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছে। শিকারের ফাঁদে পা দিয়ে ধরা পড়ে যায় মালা এবং আবিব। সন্দীপ-নন্দিনীর ফ্ল্যাটের প্রাচুর্য রঙিন টিভির চিত্রমালা মধ্যবিন্ত গোত্রের মালা-আবিরের অভাববোধকে খুঁচিয়ে দেয়। তাদের বিচারবুদ্ধি এভাবেই আক্রান্ত হয়ে পড়ে পণ্যায়িত মিডিয়া এবং ইমেজের দ্বারা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিলাসিতায় দিশেহারা করে দেওয়াই যেন গণমাধ্যমের উদ্দেশ্য তা যেন সাবানের বিজ্ঞাপনটি বলে দেয়—

দেওয়াল মেঝে এত নীল, পরস্পরে এমনভাবে মিশে গেছে যেন কোনো-হৃদের জল দেখছে তারা। বোঝা গেল ওই নীল দেওয়াল হল স্নানঘরের, ওই জল বাথটাবের। টেলিভিশনের গৃহকোণ থেকে স্নানঘর দেখে ঝুঁকে পড়েছে আবিব। কী বিপুল বিস্ময়ে সে ভেসে যাচ্ছে! স্নানঘর যেন সমুদ্র। আর ওই বাথটাবটি যেন অকুল সমুদ্রে ভাসা এক নৌকো। সেই নৌকোয় পা দিল রাজকুমারীর মতো এক নারী। তাকে সম্পূর্ণ দেখা গেল পরদায়। হলুদ টাওয়ালে নিজেকে সামান্য আবৃত করে আছে সে। ঈশং নিচু হল। সমুদ্রতলে, স্নানঘরের মেঝেয় পড়ে আছে পাখির ডিমের মতো একটি মুক্তো। সে নিচু হয়ে সুঠাম হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে নিল মুক্তোটি। সাবান সাবান! ...

আবিরের মনে হল সাবানের টুকরোটি যেন প্রাণ পেল সুন্দরীর দৃষ্টিপাতে। ধারাভাষ্যে পুরুষকণ্ঠ ধীর গলায় বলে যাচ্ছে, ফরাসি আভিজাত্যের কথা। ওই সাবান ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখবে সেরা সুন্দরীর দেহের আনাচ-কানাচ।^৩

‘সেক্স অ্যান্ড বিউটি’-কে মিলিয়ে দিয়ে যেভাবে বিজ্ঞাপনে নারী শরীরকে ব্যবহার করা হয় তা মালাকে আহত করে। যে মালা স্বামীর কাছে সাবানের জন্য বায়না করত, বিজ্ঞাপন দেখার পর তার মোহভঙ্গ হয়। তাই আবিব যখন মালার কাঁধে হাত রেখে জানায় সে সাবানটি এনে দেবে তখনই শুরু হয়ে যায় মালার বিদ্রোহ—

মালা ফুঁসে উঠল যেন। মাথার খোঁপা ভেঙে গড়িয়ে ওর কাঁধে, ছিঃ, ওই সাবান আনার কথা বলতে পারছ তুমি? কী বলল বিজ্ঞাপনে? পুরুষ মানুষের মতো সাবান, ঘুরবে শরীরের গোপন সব ... ছিঃ আমি এতই সস্তা, সন্দীপদা কেমন ব্যাখ্যা করছিলেন টিভির মতো,... ওই সাবান নিয়ে আমি বাথরুমে ঢুকব, তোমার অপমান লাগবে না, তুমি কি পুরুষ! আমি কি বাজারের ...।^৪

মালার এই জাগ্রত চেতনা এবং তার প্রতিবাদ তো আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানুষদের চেতনায়ও ধাক্কা দেয়। বিজ্ঞাপনকে বাস্তবে গ্রহণ করতে পারে না সে। ‘উড়োমেঘ’ গল্পের অভ্যন্তরে যে বিশ্বায়ন ও বিপণনের পণ্যমুখী সংস্কৃতির দ্বন্দ্বকে যেভাবে অমর মিত্র তুলে ধরলেন সেই পণ্যমুখর মানসিকতা থেকে তিনিই জাগিয়ে তুললেন প্রতিবাদের স্বর! কলোনিয়াল সমাজব্যবস্থায় লালিত সামান্য গৃহবধুর আত্মমর্যাদাবোধ দিয়ে এই যে প্রত্যাখ্যানের ভাষা তিনি রচনা করেন তা কী যুগের বিষাদ মুদ্রিত হয়ে যায় না!

আমরা দেখেছি যখন বিশ শতক থেকে একুশ শতকের দিকে পা দিচ্ছে পৃথিবী, তখন অনেকটাই বদলে গেছে সমাজ। তখন থেকেই উদার মুক্ত-বাণিজ্যের কল্যাণে ‘ডিসকাউন্ট’ এবং ‘ফ্রি’— দুটো শব্দের সঙ্গে নিজেদেরকেও অভিযোজিত করে নিয়েছে মানুষ। টাকাকে বস্তুতে পরিণত করলে বাজারে লাভ বেশি সেটা দোকানিরা যেমন জানে তেমন ক্রেতারারও সেই সমীকরণে তৃপ্ত। পৃথিবীময় শুরু হয়েছে গ্রিন মুভমেন্ট। মানুষ অনেক কিছুকে এক সঙ্গে এবং চকিতে পেতে চেয়েছে, আর তার সঙ্গে পা মিলিয়েছে চোন্দ থেকে চল্লিশ।

অমর মিত্রের ‘ব্ল্যাকম্যাজিক’ গল্পে রিনি এবং নিলয়ের চোন্দ বছরের ছেলে সবুজ ফ্রি জিনিসের জামানায় মনে করে অপচয় করাটা শুধু অর্থহীনই নয়, বোকামিও! তার নির্ভেজাল স্বীকারোক্তি— ‘কেনো কিনব? ফ্রি তো পেয়েই যাচ্ছি!’^৬ সবুজ বছর টুথপেস্টের সঙ্গে ব্রাশ, ওয়াশিং পাউডারের সঙ্গে শেভিং ক্রিম বা একটা চিরুনির দামে পাঁচটা চিরুনিও নিয়ে এসেছে ঘরে এবং ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে মাকে ফিরিস্তিও দিয়েছে। বাজারের মনোহারি পণদ্রব্য গুছিয়ে রাখতে গিয়ে রিনিও ধন্দে পড়ে যায় সে বুঝে উঠতে পারে না ন্যায্য মূল্যের বস্তু কোনটি বা কোনটি ফাউ! এভাবেই কিশোর সবুজ একদিন তেলের সঙ্গে পেয়ে যায় একটি হেয়ার ডাই। দোকানদার বুঝিয়েছে এটা তার প্রয়োজন না হলেও তার মা বাবার কাজে লাগবে।

পুত্রের আনা হেয়ার-ডাই পিতার যৌবন ফিরিয়ে এনে দিতে চায়। অথচ চুয়াল্লিশ পেরনো নিলয় কিছুতেই তাতে সম্মত নয়। অবশেষে রিনির চাপে নিলয়কে তার বুড়িয়ে যাওয়া সাদা চুল কালো করতে হয়। সে মনকে বোঝায় মানুষ যেখানে অনেক বছর পর্যন্ত সবুজ থাকতে চাইছে তার সঙ্গে সেই বা কেনো পা

মেলাবে না! ওদিকে বাবার পুনরুজ্জীবিত তারুণ্যের গর্বে সবুজের বুক ফুলে যায়। ফাউ পাওয়ার বৃথা আনন্দ ধীরে ধীরে সংক্রামিত হয় নিলয়ের মধ্যেও। নিলয়ও একদিন একটি ফ্রি গিফট নিয়ে হাজির হয়। সে খুব সঙ্গোপনে তার সাঁইত্রিশ বছরের স্ত্রীর জন্য নিয়ে আসে রাতপোশাক যার বাজার চলতি নাম ‘হানিমুন নাইট’। এক্ষেত্রে সাড়ে আটশো টাকার রাত পোশাকের সঙ্গে ফ্রি-তে এসে যায় ছাপ্পান্ন টাকার একটি বডি ক্রিম। একটি ফুরিয়ে আসা দাম্পত্য জীবনে আকস্মিক একটা পরিবর্তন ঘটতে চায় এই পণ্য। আর তাই নিলয় ফিসফিসিয়ে রিনিকে বলতে পারে— ‘ফ্রি-গিফট আমিও পেলাম, শুধু তোমার ছেলে পাবে?... বডি অয়েল মেয়েদের জন্য তৈরি।’^৭ ক্রিমের কৌটোর গায়ে কোনার্কের নারীমূর্তি এবং তার স্ফীত বক্ষয়ুগল দেখে শিহরিত হয় রিনি। কোথাও একটা ধাক্কা খায় এবং সে সজোরে তা প্রত্যাক্ষান করতে চায়। অন্যদিকে কালো চুলে যৌবন পুনরাবিষ্কার করে রিনিকেও নতুন মোড়কে উন্মোচিত করতে চায় নিলয়। একটি নিরন্তরা দাম্পত্য সম্পর্ক খুঁড়ে লেখক যা তুলে আনেন তা যেন নিছকই এক যুগের অসুখ—

এ কী পোশাক! না, নগ্নতাকে আরো নগ্ন করে তোলার এক আশ্চর্য আয়োজন। যেভাবে দুহাত সামান্য তুলে, মশারির চাঁদোয়া পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে কনুই থেকে তা ভেঙে রাত্রিবাস মেলে ধরেছে নিলয়, তাও যেন এক বিজ্ঞাপনের ছবি। বারমুড়া পরিহিত নিলয় যেন বিজ্ঞাপনের দুর্বিীনিত যৌবন, যার কাছে দলিত, মথিত এমন কী ধর্ষিতও হতে চায় বিজ্ঞাপনের নারী, যে নারী এক অলৌকিক পৃথিবীর যেন বা। যার লজ্জাহীন রূপটি হল বিজ্ঞাপনের আসল উপাদান।^৮

রিনির মনে পড়ে সে একটি ম্যাগাজিনে দেখেছিল বিপুল বক্ষের ভারে নত যুবতীর শরীর, রিনি এটাও

জেনেছিল সে বক্ষয়ুগল ছিল সিলিকন দ্বারা নির্মিত। সেই বিজ্ঞাপনের আবেদনের কথা স্মরণ হতেই রিনি যেমন রাগে-অপমানে নুয়ে পড়ে, অন্যদিকে নিলয় উন্মাদের মতো পণ্যারতীতে মেতে উঠতে চায়। এক নিকষ কালো জাদুতে বদলে যায় দাম্পত্যের বিশ্ময়। কিন্তু এই আকস্মিক পরিবর্তন কে ঘটায়!— নিলয় না ব্ল্যাকম্যাজিক! একটি গন্ধের সূত্রে এই গন্ধের মোড় ঘুরে যায়। একদিন স্বাভাবিক কৌতূহলবশত রিনি সিল ভেঙে কৌটো নিয়ে বাথরুমে ঢোকে। ক্রিম নিয়ে ঘসতে থাকে বুকে। অদ্ভুত এক মায়াবী গন্ধে, আবেশে সে যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঠিক এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ে সবুজ। রিনি দরজা খুলে বেরিয়ে যেতেই আচমকা হতচকিতের মতো সে জড়িয়ে ধরে মাকে। এই গন্ধে সবুজ ভুলে যায় তার সদ্য পাওয়া ফ্রি গিফটের কথা। সে সব কিছু ভুলে শুধু গন্ধটিকে জানতে চায়। সবুজ কিছুতেই ছাড়তে চায় না, সে উত্তরের আশায় জেরবার করে তোলে তার মাকে আর মা মনে মনে আর্তনাদ করে ওঠে—

এ কাঁঠালিচাঁপার সুবাস নয়, এ যেন সাপিনীর গায়ের গন্ধ। মিলন পিয়াসী সাপিনীর শরীর থেকে যে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে সেই গন্ধে ভরে যাচ্ছে ঘর।^৮

এই গন্ধটির মধ্যেও আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞাপনের মেয়েদের মতো, উন্মুক্ত বক্ষ নিয়ে লজ্জাহীন যুবতী মডেলের ত্রাস গেলা এক বাঙালি বধুর মূল্যবোধ। যে বুকের দুধ খেয়ে তার ছেলে বড় হয়েছে সেও যেন অলঙ্কে প্রশ্রময় হয়ে উঠে তার মায়ের আত্মপরিচয়ের সংকট ডেকে আনল। ক্রিমের বিজ্ঞাপনে যে লেখা ছিল ওই গন্ধ নারী-পুরুষের যৌন উন্মাদনাকে বাড়িয়ে দেয়— সেটা কী তবে আর গোপন থাকবে না! এই দ্বিধা থেকেই যায় এবং এক জাদুবর্ণের ঘন এবং আমিষ গন্ধ যেন ছড়িয়ে যায় নগরের অলিতে গলিতে।

৩

আন্তর্জাতিক পানীয় সম্ভার এবং সেই পানীয়কে ঘিরে লাকি লটারি খেলা, বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার উন্মাদনা, বিশ্বকাপ ফুটবলের দলগত উত্তেজনা অথবা গ্রাম-মফস্বল-খালপাড়া-বুনেপাড়া থেকে শহরে কাজ করতে আসা মানুষগুলির রূপান্তরিত দৈনন্দিনতা নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই— এ সবই অমর মিত্রের নব্বই পরবর্তী কথাসাহিত্যে পৃথক পৃথক ভুবনকে উন্মোচিত করেছে। শহর এবং গ্রামের সহাবস্থানে সহজাতভাবেই অমর মিত্র তাঁর কথাজগৎ নির্মাণ করতে পেরেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি যা বলেন—

আমি গ্রামে যাই শহরে আসি। শহরে এসে এক মানুষ হই, গ্রামে গিয়ে হয়ে যাই অন্য মানুষ। শহরে এসে লাতিন আমেরিকার গল্প, উপন্যাস নিয়ে আলাপে বসি, ইতালো কালভিনোর ইনভিজাল সিটিজ নিয়ে কথা বলি, গ্রামে ফিরে দলিল দস্তাবেজ, চাষের জল, ধানের ফলন, অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ না পাওয়া হতভাগ্য চাষীবাসী মানুষের সঙ্গে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আলাপ জুড়ি। কী রকম অলীক লাগে সমস্তটা। আমি কোনটা বুঝি? দুটোই, নাকি কোনোটাই না?^৯

অমর মিত্রের প্রথম দিকের গল্প-উপন্যাস জুড়েই রয়েছে গ্রামজীবন। গ্রাম ছেড়ে ক্রমে অমর মিত্রের কথাজগৎ শহরমুখী হয়ে উঠেছে। ধুলোখেলা, মাটির অবকাশ ছেড়ে তিনি তাঁর এই পর্যায়ের কথাসাহিত্যকে নাগরিক কলতানের আবহেই ব্যাপ্ত করেছেন। ফলে মৌজা, তহসিল, খালপাড়ের জায়গায় অনায়াসে এসে পড়েছে নগর কলকাতা। 'চাঁদবালি' গল্পে খালপাড় থেকে উঠে আসা পঁয়ত্রিশ বছরের অবিবাহিত উষা রোজ এক ঘন্টা হেঁটে উলটোডাঙার মুখার্জি বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে যায়। মুখার্জি বাড়ির ছত্রছায়া থেকে যে সৌজন্যমূলক শহুরে মানসিকতা সে অর্জন

করে তা অদ্ভুত দ্বন্দ্বময় এক পরিসর নির্মাণ করে। উষার মুখে ফুটে ওঠে ইংরেজি বুলি। মুখার্জি বাড়ির মেয়ে চোন্দো বছরের বান্টি ধর্মতলার একটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে পড়ে। বান্টিরও ইচ্ছে সে মডেলিং করবে, মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতায় যাবে। বান্টির মা সেই জন্যই তাকে প্রতি রবিবার পার্ক স্ট্রিটে নিয়ে গিয়ে হটবাথ, ফেসিয়াল করিয়ে আনে। সে বারমুড়া পরে, কমপ্ল্যান-হরলিকস-ম্যাগি-নিউট্রামূল-আমুল-ক্যাডবেরির সঙ্গে দিনে চার পাঁচটার বেশি কোল্ডড্রিংক খায়। এ হেন বান্টি ওরফে সুদক্ষিণা একদিন পেপসি খেয়ে তার ছিপিতে পেয়ে যায় মিস ওয়ার্ল্ড উত্তরা সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ। নিয়ম অনুযায়ী তাকেও একটা পেপসি কেন্দ্রিক ক্যাপশন লিখে দিতে হয়। পরিবর্তে সে টাকা পায় এবং উত্তরা সিং আসে তাদের বাড়িতে। বিশ্বসুন্দরীর আসাকে কেন্দ্র করে মুখার্জী বাড়ির এই উন্মাদনা উষার মারফত ছড়িয়ে যায় খালপাড়ের বস্তিতে। যাকে টিভিতে দেখেছে ব্যাপক উত্তেজনা নিয়ে, তাকে চাম্ফুষ দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে উষা। সেই সঙ্গে যোগ দেয় উষার ভাইঝি বাবলি। বাবলির প্রেমিক- সুদীপের দেওয়া শাড়ি পড়ে উষা পৌঁছে যায় উত্তরা সিং-কে দেখতে। বিনিময়ে বাবলিকে দিতে হয় মুখার্জি বাড়ি থেকে আনা ইউরোপ মহাদেশের কসমেটিকস। বাবলিও সেদিন সেজেগুজে উত্তরা সিং-কে দেখার জন্য সুদীপের কাছে গিয়ে আবদার করলে সুদীপ উল্টে তাকে তার দোকানে বসাতে চায়। কারণ উত্তরা সিং-এর জন্য সেদিন তার দোকানে প্রচুর খদ্দের। তাই বাবলিকেও সে পণ্যায়িত করতে চায় কারণ সে মনে করে 'ইয়াং অ্যান্ড বিউটিফুল গার্ল'-এর দামই আলাদা'।^{১০} বাবলির সংকোচ কাটাতে সুদীপ জানায় তার পিসি উষাও মুখার্জি বাড়ি থেকে ফেরার সময় দোকানে এক ঘণ্টা সার্ভিস দিয়ে যায়। সে আরো বলে—

লেডিজ থাকলে বিক্রিবাটার সুবিধে হয়। খদ্দের ঝগড়া করে না, পয়সা দিয়ে যায়। লেডিজ থাকলে খদ্দের বেশিই হয়। পিসি পয়সা নেয়, ডিম ফাটায়, পেরাজ কুচি করে, পাকানো এগরোলে লেবুর রস ছড়িয়ে দেয়। তখন ভিড় বাড়ে। লেডিজ হলেই হল, একটু সাজুগুজু হলেই হল, তাতেই লোকে ভিড় করে, মিস ওয়ার্ল্ড না হলেও চলে বাবলি, তোমার ওই পিসি, এমন সুন্দর কথা বলে তাতেই সব মাত, একটা দুটো ইংলিশ, মুখার্জি বাড়িতেই শিখে বোধহয়— হাই, আয়াম উষা, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, এগরোল আর মার্টন রোল, চিকেন।^{১১}

বাবলি তার নিতান্ত সাদামাটা জীবনের দাবি নিয়ে যাচাই করে নিতে চায় সুদীপ আদৌ তাকে ভালোবাসে কী না! অথচ ফিল্মি কায়দায় সুদীপ তাকে বলে— 'আই লাভ যু বাবলি!'^{১২} সুদীপের ইংরেজি বলার ধরন শুনে তার চকিতে মনে হয় এ যেন তার পিসির গলা, পরক্ষণেই মনে হয় না এই স্বর বান্টির এবং তারপরেই মনে হতে থাকে এ বান্টিরও কথা নয়, এ যেন টিভির কথা। টিভি ছাপিয়েও মনে হতে থাকে এ কথা কোনো কোম্পানির! সাধারণ সরল মানুষের কোমল অনুভূতিতে হাত বাড়ায় উদার বাণিজ্যনীতি, আর তাই বাবলির মতো যুবতীর প্রেম বহুজাতিক ঠাণ্ডা পানীয় থেকে খুচরো রোল কর্নারের বাজারিতে হারিয়ে যায়।

পরিবর্তিত ভাষাবন্ধন এবং তার বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের হাত ধরেই চলে আসে 'বালিকা মঞ্জুরী' গল্পটি। 'হে হোয়াট'স ইয়োর নেম?'^{১৩} -এভাবেই শুরু হয় অমর মিত্রের 'বালিকামঞ্জুরী'। গল্পে উল্লেখিত মন্তব্যটি পিঙ্কি বলেছিল বুলিকে উদ্দেশ্য করে অথচ আচম্বিতে মনে হয় এই সংলাপের মাধ্যমে লেখকও যেন পাঠককে তার আইডেন্টিটি সম্পর্কে সচেতন করে দিতে চান।

মূলত ভাষা হারিয়ে যাওয়া যে বিশ্বায়নের আর একটি রূপ তা অমর মিত্রের এই পর্বের রচনার দ্বারা নির্ণীত হয়ে যায়।

স্বরূপনগর থেকে কাঁকুড়গাছির এক ফ্ল্যাটে বাচ্চা দেখাশোনা করতে এসে বুলি ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে যায় 'হে হোয়াটস ইয়োর নেম' শুনে। সে অবাধ চোখে স্কুল ডেস পরিহিতা পিঙ্কি এবং তার ভারি বইয়ের ব্যাগটিকে দেখে। পিঙ্কির মা বার্ণা আন্টি তাকে ধাক্কা দিয়ে বলেছিল পিঙ্কিকে দিদি বলে ডাকতে কারণ পিঙ্কি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, সে ইংরেজিতে কথা বলে, তার একটা সম্মান আছে!

এখানে অমর মিত্র দুই কিশোরীর গল্প বলতে চেয়েছেন। যারা ভিন্ন দুই মেরুতে থেকেও কোথাও যেন একই শৈশব প্রদক্ষিণ করে বেড়ায়। যেন রূপকথার দুই রাজকন্যা- সুয়ো এবং দুয়ো। একজন বৃষ্টির মতো ধনি তুলে অনর্গল বলে যায়- 'ইয়েস মাম্মা, 'মাম্মা- শি ইজ লাফিং, 'প্লীজ, ডেন্ট ডিস্টার্ব মি'^{১৪} ইত্যাদি এবং অন্যজন গ্রাম থেকে শহরে এসেও ভোলে না তার 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে'^{১৫} ছড়াটি। বুলির মনে হয় ইংরেজি হলো আনন্দের ভাষা। বুলির জীবনে কোনো আনন্দ নেই, তাই তো মা, বাবা ভাই-বোন তথা স্বরূপনগর-গংখালির সারল্য ছেড়ে ইট-কাঠ-পাথরের শহরে এসেছে কাজে। শুধু গ্রাম থেকে বয়ে আনা ছড়া, রূপকথা, লোকগাথা ছাড়া বুলির আর কিছু নেই। সে বোঝে না বার্ণা আন্টির বর কেনো তার কাকাবাবু হবে! বরং সে ভেবে দেখেছে ইংরেজিতে বার্ণা আন্টি এবং অধীর আঙ্কেল একদম ঠিক। সে ইংরেজি ভাষাটাকে কৌতুকে গ্রহণ করে নিতে চায়। অথচ পিঙ্কির খারাপ রেজাল্টের কারণে তাদের সোসাইটিগত সংকট শুরু হয়ে যায়। বাবা-মায়ের চাপে পিঙ্কি যখন ভয়ে, অপমানে গুটিয়ে যায়

ঠিক তখনই তার পাশে এসে দাঁড়ায় বুলি। তার কনভেন্ট স্কুলের অতিরিক্ত চাপে হতাশা মোচনের জন্য বুলি পিঙ্কিকে ভূতের গল্প শোনায়। একদিকে বুলির গংখালির গল্প অন্যদিকে পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা পিঙ্কির মা-বাবার কথোপকথন যুগপৎ শুনে পিঙ্কি নিজেকে ভূতে পাওয়া চাষিবোয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। সে নিজের আত্মপরিচয় হারিয়ে অজানা এক ভয়ে চিৎকার করে বুলির গল্পকে থামিয়ে দিয়ে তাকে এলোপাথাড়ি ভাবে মারতে থাকে। মেয়ে এবং মার খেয়ে ক্লান্ত বালিকাদ্বয় মধ্যরাতের বারান্দায় নিশ্চুপ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন ভাষাহীন এক অব্যক্ত বেদনায় তারা একাকার হয়ে যায়। বুলির এই গ্রাম থেকে বয়ে আনা ভাষা এবং লোকজীবনের মধ্য দিয়ে অমর মিত্র আসলে এই কাহিনিকে শিকড়বিহীন নগরায়নের প্রেক্ষিতে এমন এক ভাষা নির্মাণ করেন যা, শহর কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়ির অন্দর মহলের সংলাপ এবং স্বরূপনগর গংখালিসহ গোটা দক্ষিণবঙ্গের ভাষায় মিলিয়ে- একে অন্যের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

৪

শুধু বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতাই নয় বিশ্বকাপ ফুটবলের উত্তেজনাও যে বৈশ্বিক ভিত্তিতে ডেউ তুলেছে এবং বিশেষ কোনো দলের সমর্থক হতে গিয়ে মানুষ যে তার ভৌগোলিক অবস্থান হারিয়ে, সমগ্র পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে পড়ছে তা অমর মিত্রের 'মারাদোনা মারাদোনা' গল্পটি পড়লে বোঝা যায়।

এই গল্পের মধ্যে বহুস্তরীয় বিন্যাসের নিরিখে এসেছে বিশ্বকাপ প্রসঙ্গ। মহাদেশ থেকে উপমহাদেশ জুড়ে খেলাকে কেন্দ্র করে কীভাবে ব্যবসা ও বিনিয়োগ চলতে পারে তার সম্ভাবনা এ গল্পে ধরা পড়ে। কলকাতার এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক বিশ্বনাথ তার

প্রিয় দল আর্জেন্টিনা হেরে যাওয়ার দুঃখে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। আর সেই অবসাদের সুযোগে তাদের ওপর তলার শিক্ষিত-সুন্দরী-প্রাচুর্যময়ী সর্বোপরি জার্মানির সাপোর্টার শর্মি বউদি তাকে দিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে থাকে। গল্পের মধ্য দিয়ে অমর মিত্র কলকাতার বিশ্বকাপ বিলাসের যে বয়ান নির্মাণ করেন তা সহজেই এক আলো-অন্ধকারময় প্রতিবেশ রচনা করে—

তুমি কাল খেলা দেখলে বিশু, দেখলে কী রকম হারল ওরা!

হয় জার্মানি না হয় ইতালি, যে কেউ জিতে নেবে ওয়ার্ল্ড কাপ। মারাদোনোর আর্জেন্টিনা! কী যে বল তুমি বিশু, ওদের কারিকুরি বোঝা গেল, সবাই ড্রাগ নিয়ে মাঠে নেমেছিল কি না কে জানে? ড্রাগ স্মাগলিং-এর দেশ সব, ওরা ফুটবল খেলবে কী? ফুটবল তো ইউরোপের। তাও তো এবার ফ্রান্স নেই, ইংল্যান্ড নেই।

খুব রেগে গিয়েছিল বিশ্বনাথ। রেগে কথাই বলতে পারছিল না, শুধু কোনক্রমে বলেছিল, এ-এ-এফিড্রিন ওষুধ খেয়ে কি মারাদোনা হওয়া যায়? চক্রান্ত, সব চক্রান্ত! ইউরোপের না না ইউরোপে-এ-এর চক্রান্ত।^{১৬}

বিশ্বনাথ জীবিকাহীন এক পোড়খাওয়া যুবক। কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া জীবনের যেটুকু উত্তেজনা তা ফুটবল নিয়ে। শর্মি বউদি খেলা এবং কাজ দুই ধরনের প্রলোভনে বিশ্বনাথকে আটকে রাখতে চায়। কারণ এই বিশ্বকাপের মধ্যেই আমেরিকা থেকে এসেছে শর্মির পিসতুতো দাদা বাবলি। সেই দাদার মারফত কাজের সুযোগ এমনকি আমেরিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেওয়ার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসলে বিশ্বনাথের মতো বেকার যুবকদের দিয়ে

বেগার খাটিয়ে নেওয়ারই এক চক্রান্ত করতে থাকে। আমেরিকা নাম শুনেই বিশ্বনাথ রোমাঞ্চিত হয়। ফলে শর্মি বউদির কোনো প্রস্তাবকেই প্রত্যাখ্যান করতে পারে না সে। আমেরিকাবাসী বাবলিদা এবং জার্মানির সাপোর্টার শর্মি বউদির জন্য জলভরা সন্দেশ এবং কোকাকোলা আনতে যায় আর্জেন্টিনার সাপোর্টার বিশ্বনাথ। তার এই জার্নিটাই যেন গল্পে এক ভিন্ন অভিমুখ তৈরি করে। কোকাকোলা তো আমেরিকান জিনিস, বিশ্বকাপ হচ্ছেও আমেরিকায় আর বাবলিদাও আমেরিকার মানুষ! এক উপনিবেশিক মোহে পড়ে সে জ্বর গায়ে রোদের মধ্যে বেরিয়ে শর্মি বউদির ফরমাশ মেটায়। প্রথর রোদের তাপে বেরিয়ে বিশ্বনাথের জ্বর প্রবল হয়। শর্মি বউদির কোনো প্রয়োজনেই আর সে নিযুক্ত হতে পারে না। বরং নতুন শিকার হিসেবে শর্মি পেয়ে যায় বিশ্বনাথের ভাই শম্মুনাথকে। রুমালিরাটি, চিকেন, পঁয়াজ ইত্যাদি আনার বিনিময়ে সে শম্মুনাথকে ইংরেজিটা ভালো করে দেখিয়ে দিতে চায়। কারণ ইংরেজি না জানলে এই পৃথিবীতে তার কোনো স্থান নেই। বিশ্বনাথের অপটু ইংরেজির দোহাই দিয়ে তার আমেরিকা যাবার মিথ্যে স্বপ্নকে একেবারে মুছে দিতে চায় শর্মিরা। অন্য দিকে বাবলিদার চলে যাওয়ার দিন ঠিক ছ'টায় ফাইনাল কথা বলার জন্য জ্বরগ্রস্ত বিশ্বনাথ শর্মি বউদির ঘরে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়।

এই গল্পটির মধ্যে অমর মিত্র যেন আরো একটি রূপকথার জগৎ নির্মাণ করেন। ফুটবল বিশ্বকাপ যে উন্মাদনার মরসুম উপহার দিয়ে চলে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে থাকা বাণিজ্যগণকে উন্মোচিত করে দিতে চান লেখক। নব্বই পরবর্তী সময়ে সাদা কালো টিভির পরিবর্তে রঙিন টিভির বিক্রি বেড়ে যায়। তেমনি বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ

এবং ব্যবসার রমরমাকে মাথায় নিয়ে কলকাতার অলিতে গলিতে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা টিভি সারাই করার হিড়িক পড়ে যায়। তার ফায়দা নিতে থাকে ছোটোখাটো মেকানিকেরা। তাই এই গল্পে নৌশাদের মতো সাধারণ মেকানিকেরা আর্জেন্টিনাকে নিয়ে পঞ্চগশ টাকা বাজি রেখে যখন হেরে যায় তখন আরো মরিয়্যা হয়ে টিভি সারাইয়ের নামে দু'হাতে লুঠতে থাকে—

এই যাচ্ছি তেরো নম্বর বাড়িতে, টিভি খারাপ হয়ে গেছে, সারাই করব, টিভির কাজ যদি জানতে বিশ্বদা এই সময় কামাই হয়ে যেত, কালার টিভিতে হাত দিলেই দুশো রুপয়া, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে অবশ্য পঞ্চগশ পাঁচাত্তর, তাই বা কম কী? আরে দেখো না, বাইশ নম্বরে বোসবাবুর নতুন কালার টিভি রাত নটায় খারাপ হলো, তার এক ঘণ্টা বাদে খেলা তখন কম্পানিতে দিলে তো ফেলে রেখে দেবে, ততোদিনে ফুটবল শেষ, টিভি খুলেই তিনশো চার্জ করে দিলাম, কিছুই হয়নি, একটা তার লুজ হয়ে গিয়েছিল।^{১৭}

কলকাতা শহরে চার বছরের ব্যবধানে একটি উত্তেজনার উৎসবকে কেন্দ্র করে অমর মিত্র গভীরতর এক সত্যে উপনীত হন, যেখানে আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর বাকি সব দেশগুলোই যেন একটি মাত্র পঞ্জিক্তে স্থান পেতে পারে। তাই হয়তো তিনি নতুন করে বিশ্বনাথদের জন্য কোনো গন্তব্য নির্ধারণ করেন না। বন্ধ জানালা, কার্নিশ গড়ানো ছিটেফোঁটা জলের সমারোহে শুধু আর্জেন্টিনার ভক্ত বিশ্বনাথ টের পায় উপরের ঘরে কোয়ার্টার ফাইনাল হচ্ছে, ডালাসের সবুজ মাঠ তাকে আরো জ্বরগ্রস্ত করে তোলে। সে আর আমেরিকার স্বপ্ন দেখে না, বরং দরিদ্রতার নিরিখে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ক্যামেরুনের

মতো পিছিয়ে পড়া দেশগুলির শরিক হয়ে পড়ে।

উপসংহার

বিগত শতকের সাতের দশক থেকেই অমর মিত্রের সাহিত্য জীবনের শুরু। বিশ্বায়নের দীর্ঘ যাত্রাপথে এই সময়টাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তখন থেকেই বা তার কয়েক বছর পরে অর্থাৎ আট-নয়ের দশকে ভারতীয় সমাজ মুক্ত-বাজার এবং বিশ্বায়নের ভুবন গ্রামে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত পরিবর্তন শুরু হয়। কিছু গ্রাম আধা শহরে রূপান্তরিত হয়, কসমোপলিটন শহরগুলিও দু'বাহু বাড়িয়ে অদূরবর্তী গ্রামগুলিকে গ্রাস করে নিজের অঙ্গীভূত করে তোলে। জীবনের বদলে যাওয়া অবকাশভঙ্গিতে জায়গা করে নেয় মিডিয়া। রঙিনটিভি, টিভির বিজ্ঞাপন, বিদেশি পণ্যের সঙ্গে উপরি পাওনা হিসেবে বেশ কিছু উপকরণ দৈনিক দিনলিপিতে যুক্ত হয়। জীবন যাপনের এই সামগ্রিক পরিবর্তন আমাদের পুরনো আদর্শ ও মূল্যবোধে যে ভাঙন ধরায় তা অমর মিত্রকে তাড়িত করছে। এই রূপান্তরকেই তিনি অবিকল তুলে এনেছেন কথাসাহিত্যে। গ্রাম-শহরের রূপান্তরগত দ্বন্দ্ব এবং ধন্দে পড়ে বিশ্বায়ন আক্রান্ত সাধারণ মধ্যবিত্তের দোলাচলতাকেই তিনি তাঁর শৈলীর মাধ্যমে অনুধাবন করতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১. অমর মিত্র, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, পৃ. ১৪৪
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৫. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২২৬
৬. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৩২
৭. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৩১, ২৩২
৮. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৩৫
৯. অমর মিত্র, *অলীক এই জীবন*, ভূমিকা অংশ, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, পৃ. XVII
১০. অমর মিত্র, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ২৮৫
১১. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৮৫
১২. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৮৫
১৩. অমর মিত্র, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৭৩
১৪. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৭৩, ১৭৪
১৫. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৮০
১৬. অমর মিত্র, *পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প*, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পৃ. ২৫৩
১৭. প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৫৯

জীবনানন্দের গল্প: অস্তিত্ববাদী চেতনা ও নাগরিক জীবনের সংকট

শরীফ আতিক-উজ-জামান

সারসংক্ষেপ

শরীফ আতিক-উজ-জামান
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
সরকারি ব্রজলাল কলেজ
খুলনা, বাংলাদেশ
e-mail : sharifatiquzzaman@yahoo.co.uk

জীবনানন্দের খ্যাতি কবি হিসেবে- প্রকৃতি, ভালোবাসা ও নির্জনতার কবি। কিন্তু গল্প-উপন্যাসও লিখেছিলেন তিনি; সংখ্যা ও সাহিত্যগুণ বিচারে সে রচনা কোনো অংশেই অকিঞ্চিৎকর নয়। জীবদ্দশায় তাঁর অনুরাগী পাঠককুলের কাছে সে খবর অজানাই থেকে গিয়েছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কেন তা অজ্ঞাত ছিল? কেন তিনি তাঁর এই বিপুল সৃষ্টিসম্ভার পাঠকের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখলেন? অপ্রকাশের ভার চেপে বসেছিল কি তার ওপর? নাকি অন্য কোনো কারণ ছিল? তবে বাজারের সস্তা গল্প-লিখিয়ে হয়ে অর্থ বা নাম করতে যে তিনি চাননি তা নিশ্চিত। তাঁর প্রভাবলী থেকে জানতে পাই যে গল্প লেখার ইচ্ছাটা অকস্মাৎ তাঁর মনে চাগিয়ে ওঠেনি, তার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি ছিল। গল্পগুলো সে প্রস্তুতিরই ফসল। গল্পগুলোতে আমরা খোঁজ পাই অন্য এক জীবনানন্দের যিনি এমন কিছু চরিত্র নির্মাণ করছেন যারা নাগরিক জীবনের সংকটের মাঝে অস্তিত্বের জন্য নীরবে লড়াই করে। আত্মসম্মান বাঁচিয়ে সংগ্রাম করতে থাকা এই মানুষগুলোর গভীর মনস্তত্ত্ব জীবন সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি দেয়।

মূলশব্দ

অস্তিত্ববাদ, নাগরিক, মানসিক, সংকট, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, হতাশা, দ্বন্দ্ব

গবেষণার উদ্দেশ্য

জীবনানন্দের গল্পে সবদিক দিয়েই নতুনত্ব রয়েছে। বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি সে নতুনত্বের স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। নতুন পথে চলা ঝুঁকিপূর্ণ। সেই ঝুঁকির কথা স্মরণ রেখেই তিনি নেমেছিলেন গদ্য সাহিত্যের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। শুধু আঙ্গিকগত দিক দিয়েই নয়, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও আমরা দেখি নতুনত্ব। তিরিশোত্তর সময়ের নাগরিক জীবনের নানাবিধ সংকটকে তিনি ধরার চেষ্টা করেছেন

মধ্যবিভূর অন্তরদর্পণে, যে সংকট মূলত অর্থনৈতিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং বিশেষ করে মানসিক। সংকটের ভিতর দিয়ে জীবনের মানবিক তাৎপর্য উপলব্ধির আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। তাঁর কাব্যে যেমন গল্পেও তেমন সংকট উপস্থাপনার এলিয়ট-সৃষ্ট বৈশিষ্ট্য নজর কাড়ে। সেখানেও যেন এক কবিকেই আমরা খুঁজে পাই। তাঁর রচনায় তাঁর কালের এমন এক মানসিকতা ফুটে ওঠে তা ওই সময়ে রচিত অন্য লেখকদের গল্প-উপন্যাসে খুব

সুলভ এমন বলা চলে না। যে মানসিকতার কথা বলা হচ্ছে তা এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধ-নিঃসঙ্গতা-হতাশা যা সংকটময় মানব-অস্তিত্বকে তুলে ধরে। স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনানন্দ এমন এক সময়ে গল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন যখন সবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। রুশ-বিপ্লবের চেতনা, রাজনীতির নতুন মেরুকরণ ও যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ মানুষকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। মানুষের প্রচলিত মূল্যবোধে প্রবেশ করেছে সন্দেহ। সমাজের নানাবিধ অবক্ষয়-হতাশা, নিঃসঙ্গতা, পারক্যবোধ, বিচ্ছিন্নতা ও দ্বন্দ্বিক অনুভূতির সমন্বয়ে নতুন জীবন-চেতনা গড়ে উঠছে। তাঁর কাব্যে যে নিঃসঙ্গতাবোধ তা তাঁর গল্পেও সমানভাবে চোখে পড়ে। অন্তরের এই নিঃসঙ্গতা ব্যক্তির নয়, সমষ্টির। এই নিঃসহায়তা অন্তরে বাসা বাঁধে নাগরিক জীবনের নানাবিধ সংকট আর টানাপোড়েনের কারণে। মূলত তাঁর লেখায় ধরা পড়ে এক বেদনাভরা কালচেতনা। উল্লিখিত বিষয়ের সাথে তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামের স্বরূপ অনুসন্ধান এই গবেষণার উদ্দেশ্য। এখানে বর্ণনাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

জীবনানন্দের কবিতার আলোচনা যত সহজলভ্য, কথাসাহিত্যের ততটা নয়। সমীরণ মজুমদার *জীবনানন্দ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* এবং সুমিতা চক্রবর্তী *জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল* শিরোনামে মননশীল গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিক্ষিপ্ত কিছু রচনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উদ্ধৃতি হিসেবে তার কিছু কিছু এই রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এই বিষয় আরো গভীর আলোচনার দাবি রাখে।

বিশ্লেষণ

জীবনানন্দ সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের গল্প লিখেছেন। প্রচলিত ধারার বাইরের সে গল্প পাঠকের গ্রহণ করতে

সময় লেগেছে। নিজেরই হয়তো কোনো সন্দেহ ছিল তাঁর। তাই লেখার পর দীর্ঘকাল না ছেপে ফেলে রেখেছিলেন যে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সমীরণ মজুমদারের বক্তব্যে সে উল্লেখের সমর্থন মেলে:

একটার পর একটা গল্প উপন্যাস লিখে গেলেন অথচ নামহীন, সংশোধনহীন অবস্থায় ফেলে রাখলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, তিনি আর দশজনের মতো গল্প উপন্যাস লিখে সাধারণ একজন গদ্যকার হিসেবে খ্যাতির স্বপ্ন দেখেন নি। তিনি চেয়েছিলেন এমন কিছু সৃষ্টি যার হীরকদুত্তির মাধ্যমে আবহমান বাংলা গল্পপাঠকের চিন্তে বিরাজ করতে পারেন। তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বাংলা গল্পের নতুন ডিকশন, নতুন যাত্রা, নতুন ভাষা।^১

‘মা হবার কোন সাধ’ গল্পের মূল বিষয় বেকারত্ব ও দারিদ্র্য। এ দুয়ের আক্রমণে বিপন্ন হয় একজন নারীর মাতৃত্বের সাধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দাম্পত্য-প্রেম, শারীরিক অস্তিত্ব, স্বজনের সহায়তা। গল্পের নায়ক প্রমথ বেকার, জীবিকার সন্ধানে ছুটছে কলকাতায়। বাড়িতে তার আসন্ন প্রসবা স্ত্রী শেফালী; স্বামীর কাছে লেখা চিঠির মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি বাড়ির লোকেরা তার ওপর কোন ধরনের অমানবিক আচরণ করছে। কারণ আর কিছুই নয়, তার স্বামীর বেকারত্ব। জীবনানন্দ এখানে দেখিয়েছেন দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্যও আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর নির্ভরশীল। বিয়ের পর হাজার টানাপোড়েনের কারণে স্ত্রীর সাথে প্রমথ সহজে মিশতে পারে না, সংকোচ হয়। সুশ্রী সুন্দরী স্ত্রীর সান্নিধ্য বিষাদময় হয়ে ওঠে। তাই সন্তান আসতে দেরি হয়। যখন সে একটা কাজ পেলে, কাজে যোগদান প্রায় নিশ্চিত, তখনই শেফালী তার সাথে সহজ হয়ে মিশতে পারলো। যার ফসল তার গর্ভের ওই সন্তান। কিন্তু যোগদানের পূর্বে কোম্পানি

আর্থিক অস্বচ্ছলতার অজুহাতে তার নিয়োগ প্রথমে দফায় দফায় পিছিয়ে দিয়ে পরে বাতিল করে দিল। এ অবস্থায় আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবে শেফালীর মাতৃত্বও বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। এ সন্তান তার কাছে অবাঞ্ছিত মনে হলো। বাড়ির লোকেরাও এ অনাগত বংশধর সম্পর্কে আগ্রহহীন ও বিরক্ত। প্রমথ ভাবে ‘একটু স্বচ্ছলতা থাকলে এ সন্তানকে তারা একটুও অন্যায় মনে করতো না। শেফালীকে হয়তো আশীর্বাদই করতো।’^২ কিন্তু এখন প্রতিনিয়ত নির্দোষ মেয়েটির কপালে জুটছে গঞ্জনা। শাশুড়ী প্রতি সকালেই ঘুম থেকে উঠে ‘বউয়ের ভাগ্যে ধন, ধন না শন? মার ব্যাটা মার ব্যাটা’^৩ বলে ব্যাটা হাতে বাড়ির কাজে বেরিয়ে যান। প্রমথ’র দুর্ভাগ্যের দায় সবটুকু শেফালীর। সংসারে বেকার লোকেরা আত্মীয়-স্বজন পরিজনের কাছে কতটা মূল্যহীন শেফালীর চিঠিতে তার নাড়া দেওয়া বর্ণনা:

‘গাভিন গরুটাও সেদিন বিয়োলো তোমাদের। নিজের চোখেই দেখলাম। কিন্তু তার জন্যও আশংকা, আতঙ্ক, চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম, আগ্রহ এসবের ঢ্রুটি নেই দেখলাম। কিন্তু আমি জানি। আমিই বা কতটুকু পাবো। কিন্তু দুঃখ করে কি লাভ? ঐ গরুটার মত দুধ দিতে পারিনা আমি, আমার স্বামীও কারো দুধের পয়সা দিতে পারে না।’^৪

বেকারত্ব মানুষকে মানুষের কাছে কতটা মূল্যহীন করে তোলে, প্রেমশূন্য করে দেয় তার নগ্নচিত্র আর কী হতে পারে! এমতাবস্থায় মানুষের হয়তো আর কিছুই করার থাকেনা মৃত্যু কামনা ছাড়া। শেফালীও তাই করে, মৃত্যুকে আহ্বান। শারীরিক মৃত্যুর আগে তার আত্মিক মৃত্যু হয় এবং শারীরিক মৃত্যুও হয় তবে প্রসবের পর। জীবনানন্দ মুক্তি দেন শেফালীকে। এ মুক্তি না দিলে হয়তো তার কপালে জুটতো আরো গঞ্জনা। মৃত্যু তাই তাকে মারে না, বাঁচিয়ে দেয়। জীবনানন্দ দাশের নারীরা সংগ্রামী নয়, নয় তার

পুরুষেরাও। বাস্তবতাকে সাহসিকতার সাথে তারা মোকাবেলা করতে পারেনা। তাই শেফালী হয়ে ওঠে না বিভূতিভূষণের সর্বজয়া। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে রাখতে পারে না কোনো ভূমিকা। বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় তাই বলেন, ‘জীবনানন্দের কোনো নায়িকা-নারীই জীবন রূপিণী নয়। মৃত্যুর সাথে তাদের সহমর্মিতা অর্থাৎ, জীবনানন্দের কাছে নারী-প্রেম-মৃত্যু একাকার।’^৫

তাঁর গল্পের কোনো নারীচরিত্রই সংগ্রামী নয়, নয় মাতৃত্বের প্রতীক। তাই শেফালীর মেয়েকে দারিদ্র্য জয় নয়, দারিদ্র্য সহ্য করার জন্য প্রস্তুত করা হয়।

‘প্রেমিক স্বামী’ গল্পেও দেখি মূল বিষয় বেকারত্ব, তার থেকে হতাশা-বিষণ্নতা এবং পরিশেষে বিচ্ছিন্নতার কাছে আত্মসমর্পণ। প্রভাত বেকার কিন্তু বিবাহিত। পরিবারে সে আর তার স্ত্রী মলিনার অবস্থান সংহত নয়। সকাল থেকে রাত বারোটা অন্ধি রান্নাঘরে, ভাড়া ঘরে কাটে মলিনার। অন্যের প্রয়োজনে তার সবটুকু সময় ব্যয় হয়ে যায়। মলিনার ওপর বিশ্বসংসারে সকলের অধিকার আছে, নেই শুধু প্রভাতের। প্রভাত এর কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। কেননা সংসারের মুখে রোজগার করে কিছু ঢালতে পারে না বলে গায়ে খেটে তার স্ত্রীকে সেই মূল্য পরিশোধ করতে হয়। আপনসত্তা বিকিয়ে দিতে হয়। স্ত্রীর বিমর্ষভাব-অশ্রুপাতের কারণ কিছুই প্রভাতের অজানা নয়, কিন্তু রাতে যখন মলিনা আসে তার বিরস মুখ প্রভাতের কাছে অসহ্য মনে হয়। তার মানসিক-জৈবিক চাহিদা বড় হয়ে ওঠে। বড্ড স্বার্থপর হয়ে ওঠে প্রভাত। একটি মুহূর্তের জন্য স্ত্রীর যন্ত্রণার খোঁজ নিতে সে চায় না। নিজের চাওয়া-পাওয়ার হিসাবটি মিটিয়ে নিতে চায়। সে ‘বস্ত্র’ চায়। কিন্তু মলিনার দিকে চেয়ে সে আকাঙ্ক্ষার আশ্রয় নিভিয়ে রাখতে হয়। সমগ্র রাতটা আরো বিষময় না হয় এই ভয়ে। কিন্তু মলিনা তার রাতের জীবনটুকু মধুর করে তুলুক

এমন ভাবনা থেকে প্রভাত নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারে না। আর সে না পাওয়ার বেদনা তার মনে যে শূন্যতা সৃষ্টি করে তা মলিনা যেন আর ভরিয়ে তুলতে পারবে না। ওদের মাঝে ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে দুর্লভ দূরত্ব। ওদের আশা বেঁচে থাকে কিন্তু মন মরে যায়। স্বপ্ন দেখতে দেখতে ওরা শেষ হয়ে যায়।

সংসার নামক আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে মলিনা শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রভাত নীরব দর্শক। স্ত্রীর জন্য কিছুই সে করতে পারে না। তাই সম্পর্কে জ্যাঠা ভুজঙ্গ বাবুদের সাথে তার দিল্লী বেড়াতে যাবার খবরে সে উৎফুল্ল হয়। কিছুদিনের জন্য হলেও এ যন্ত্রণার নিষ্কৃতি। মলিনা ওদের সাথে দিল্লী যায়। তিন-চার মাস গড়িয়ে যায় তার ফেরার সময় হয়। কিন্তু প্রভাত শঙ্কিত হয়ে পড়ে। আবার এ অশান্তির মাঝে এসে পড়বে মলিনা। এই সময়ের মধ্যে আপন অবস্থার কোনো উন্নতি সে করতে পারে নি। পূর্বের লাঞ্ছনা গঞ্জনার কথা স্মরণ রেখে মলিনার ফিরে আসার সংবাদ তাকে আতঙ্কিত করে। কিন্তু সৌভাগ্য প্রভাতের নাকি মলিনার, সে আসেনা বরং প্রভাতই দিল্লী ঘুরে আসে। ভুজঙ্গ বাবুরা কিছুতেই তাকে ছাড়বেন না। তার ছেলে সময়ের সাথে মলিনার সম্বন্ধ স্থির হয়ে যায়। বিনা প্রতিবাদে ফিরে আসে প্রভাত। বেকারত্বের কাছে হেরে গিয়ে আপন স্ত্রীকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে সে নিষ্কৃতি পায়। এমন সহজ-সমাধান ভারতীয় সামাজিক প্রথার সাথে মেলেনা কোনোমতেই। কিন্তু লেখক বেকারত্বের ভয়াবহরূপ তুলে ধরতেই গল্পের এমন আবাস্তব পরিণতি টানেন। বেকারত্বই তার নর-নারীদের সমস্ত স্বপ্ন-সাধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভালোবাসা নৈরাশ্যের চোরাবালিতে ডুবিয়ে দেয়।

এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রও আছে দাশের গল্পে। অর্থ-বিল্ড-বৈভব সবই আছে কিন্তু প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই, আছে ঘৃণা, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দেওয়াল। এ এক

সামাজিক সংকট। ‘মেয়েমানুষ’ গল্পে দেখি-দু’জোড়া দম্পতি। হেমন-চপলা ও দ্বিজেন-লীলা। উভয়েরই প্রচুর অর্থ আছে।

হেমন পূর্ণব্যবসায়ী; দ্বিজেন উকিল, এর পাশপাশি আছে ব্যবসায়, ছেলে পুলে নেই, ঝাড়া হাত-পা। কিন্তু স্ত্রী লীলার সাথে দ্বিজেনের বনিবনা নেই। স্বামীর প্রতি লীলার আস্থাহীনতাই তাদের অমিলের প্রধান কারণ। দ্বিজেন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের নয় মোটেও। সে সুবিধাবাদী, সুযোগ খোঁজে। ব্যবসায়ীর যে চরিত্র। বন্ধু হেমনের স্ত্রী চপলার ওপরও সে সুযোগ নিল। এই রকম ড্রইং রুম থেকে ড্রইং রুমে তার বিচরণ। ধনী উচ্চবিত্তের সমাজে যে পক্ষিতা তার দিকে জীবনানন্দ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ পক্ষে ডুবে আছে এদের মতো অনেকেই। এর মূলে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ। বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়ও তা সমর্থন করেন:

‘ধনবাদী সমাজে সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই বিচ্ছিন্নতা। যন্ত্র ও যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতিতে মানুষ ক্রমশ একের থেকে অপরে সরে যাচ্ছে, আর বাইরের বিচ্ছিন্নতা বোধের আকারে বাসা বাঁধছে মনের গভীরে। সেখানে অনুভূত হয় নিজের ব্যক্তিসত্তার সাথে পরিপার্শ্বের বিচ্ছিন্নতা এবং নিজের ইচ্ছার সাথে-কাজের বিচ্ছিন্নতা।’^৬

ব্যবসায়-ব্যবসায়ী বিষয় দুটো জীবনানন্দ কখনো ভালো চোখে দেখেছেন বলে মনে হয় না। ব্যবসায় অর্থই যেন অসাধুতা-জোচ্চুরি অসুস্থ প্রতিযোগিতা। ‘হিসেব-নিকেশ’ গল্পের রাখাল বলছে:

‘মানুষের ঘরে ঘরে ভালো জিনিস পৌঁছিয়ে দেব সে আইডিয়া নিয়ে ব্যবসা চলে না... বাজারে কে কাকে ঠকিয়ে রাখতে পারি খাসা জিনিসের কেরামতিতে- আর নেহায়েতই গায়ের জোরে; এই নিয়ে হচ্ছে ব্যবসার জিত। গায়ের জোর আসে কোথেকে? টাকায়।’^৭

টাকাওয়ালা মানুষের কী হয়? খেয়াল চাপে বাড়ি তৈরি, গাড়ির মডেল পরিবর্তন, পার্টিক্লাবে জুয়ো-তাস-অনুপানে ফুঁতির ফোয়ারা। ঘরে নিঃসঙ্গ স্ত্রী, বাড়ে নিঃসঙ্গতা, তৈরি হয় স্বামী-স্ত্রীর দূরত্ব। সম্পর্ক দাঁড়ায় জোড়াতালির। স্বামী আসক্ত হয় পরনারীতে। সেই সাথে আশ্রয় খোঁজে প্রতারক আধ্যাত্মিকতায়। অবনীশ একবার ভাবে, ‘সমস্ত জীবন বেড়ে একটি সুন্দরী মেয়ে মানুষ খুঁজে পায় না সে। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকে নিয়েই যে সর্বদা তৃপ্ত থাকতে হবে শুধু তাওতো নয়। না না তা মোটেই নয়।’^৮ আবার পরক্ষণেই ভাবছে, ‘এরকম পজিশন, টাকা-কড়িও যদি না থাকত, শুধু যদি এই জানতাম যে, সারাজীবন ভগবানে বিশ্বাস রেখে, সৎপথে চলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এসেছি তাহলেও। ব্যস আমার মুখের হাসিটি কেউ কেড়ে নিতে পারতো না।’^৯ ইহজাগতিকতা-পরলৌকিকতার দ্বন্দ্বিক রূপ একজন মানুষের ভাবনায়।

আবার রাখাল বন্ধু অবনীশের স্ত্রীর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার চিন্তা করছে। তার মনে যে ভাবনা এলো এ অসাপুতা রাখালের নয়, তার সমাজের। ‘মেয়ে মানুষ’-এর দ্বিজনকে দেখি ওইরকম ‘সৎ’ হতে। রাখালও হতে চায় মনে প্রাণে। বন্ধু স্ত্রীর প্রতি তার নিষিদ্ধ কামনা লুকানো থাকছে না। এখানে দ্বিজন (মেয়েমানুষ) ও রাখাল (হিসেব-নিকেশ) নষ্ট সমাজের নষ্ট প্রতিনিধি।

জীবনানন্দকে আমরা অস্তিত্ববাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। অস্তিত্ববাদীরা বলেন যে, মিথ্যাচার ও আত্মপ্রবঞ্চনার সাময়িক সম্ভ্রুতি উপভোগ করছে আজকের মানুষ যা হলো Unauthentic Existence। সত্য সন্ধানের সততা তারা হারিয়ে ফেলেছে। তাই মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ঠকবাজিকেই মনে করে আসল-আরাধ্য। কিন্তু তা নয়। এর ভিতর দিয়েই যারা Authentic Existence খোঁজেন, তার আকর্ষণই জীবনকে করে সত্য সুন্দর। জীবনানন্দ দাশ জীবনের

কদর্য চেহারা তুলে ধরেন তা এ নষ্ট জীবনের জয়গান গাইবার জন্য নয়; জীবনের সঠিক সত্য উপলব্ধির জন্য।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রেমের প্রসঙ্গ তাঁর গল্পে এসেছে নানাভাবে। বারবার সে যেন অপূর্ণতার স্বাদই দিয়ে যায়। ‘শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভালোবাসা’ গল্পে আপন ভ্রাতা-ভগ্নি মাদুরী-সত্যব্রত তাদের প্রেম বিষয়ে খোলামেলা আলাপ করছে। এমন পরিচিত দৃশ্যে আমরা চমকে উঠি। সত্যব্রত মাদুরীর প্রেম সম্পর্কে খুঁটে খুঁটে জেনে নেয়। নিজের নীরব ভালোবাসা সম্পর্কে খোলাখুলি স্বীকারোক্তি করে। ঠিক বাঙালি সমাজের প্রচলিত ধারণার সাথে মেলে না। কিন্তু প্রেম যে অচলু নয়, নিষিদ্ধ কিছু নয়, জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজন, প্রাকৃতিক নিয়মে যা আমাদের মাঝে বেড়ে ওঠে তার স্বীকৃতিও যে স্বাভাবিক হওয়া উচিত জীবনানন্দ আমাদের সে সত্য চেনাতে শেখান। মাদুরী যখন বলে, ‘আমাদের পরিবারের এই লোকগুলো মানুষের জীবনের একটা স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় জিনিসেও কত কি নোংরামির কাদা-রস-মাটি খুঁজে পায়’^{১০} তখন প্রেমের প্রতি আমাদের সমাজের সনাতন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় মেলে। কিন্তু দাশ মানুষের মানসিক বিপর্যয় রোধে প্রেমের ভূমিকার কথা মাদুরীর জবানিতে স্মরণ করিয়ে দেন, কিন্তু এ সবেরও প্রয়োজন আছে সংসারে। নইলে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়। তারপর কদর্য হতে আর কত বাকি থাকে। প্রেম সংকীর্ণ এই-ই আমাদের সমাজের শিক্ষা। তাই প্রতি পদে পদে পড়ে বাধা, পরিবারের গুরুজনদের, সকলের। শীতাংসুর পত্রের কোনো উত্তর দিতে সাহস করে না মাদুরী, কেননা বাবা-কাকাদের ওদিকে অনুমতি হবেনা বলে। বাঙালি মেয়েদের হৃদয়ের স্টিয়ারিং হুইলটাও গুরুজনদের হাতে। তাই কোনো প্রেমই দানা বাঁধতে পারে না। ঝরে ঝরে শেষ হয়ে যায়। থাকে শুধু শূন্যতা। তাই হতাশার কথা শুনতে হয়,

‘এসব কোনো কিছুর ভিতরেই কোনো শান্তি নেই, শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভঙ্গ।’^{১১}

সতব্রত যে অনুপমাকে ভালোবাসতো তাও কেউ জানেনি, নিভৃত ঘটেছে সব। কিন্তু সে সত্য প্রকাশ করে সে প্রেমের হাত থেকে নিস্তার পেতে চায়। যে জীবন তার অতিবাহিত হয়ে চলেছে এর ভিতর রয়েছে স্নিগ্ধতা, মাধুরী, শান্তি। আমরা দেখি প্রেমের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের নায়কেরা নিভৃতচারী। বাস্তবের মুখোমুখি তারা আসতে চায় না। মুখোমুখি বা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নয় আত্মদ্বন্দ্বই তার নায়ক-নায়িকাদের প্রেম মারা পড়ে। ভালোবাসতে চেয়ে তারা ভালোবাসা হত্যা করে।

‘বেশি বয়সের ভালোবাসা’ গল্পেও আমরা একজোড়া ভাইবোনকে পাই যারা স্মৃতিচারণে মগ্ন। যেখানে নিজেদের অতীতের অবস্থা-অবস্থান নিয়ে তারা কথা বলছে। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা আছে, আর আছে ভালোবাসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা-কৌতূহল-ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা। আভা-সুহৃদ ভাই-বোন। বিদেশ ফেরত ভাই তার বোনের ফেলে আসা জীবনের ভালোবাসার কথা জেনে নেয়। তার গভীর শূন্যতার খোঁজ করে। আভা তার একাধিক ভালোবাসার অভিজ্ঞতার কথা শোনায়। প্রথম ভালোবাসা তার জীবনে এসেছিল পনের বছর, পরের বার বাইশ বছর বয়সে। দু’বারের ভালোবাসা থেকে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে সে মনে করে, ‘ভালোবাসা বলে কিছু নেই, ছোটবেলা নির্বুদ্ধিতা বেশি, সের্স-এট্রাকশান কম, বয়স হলে এটা উল্টে যায়, তবুও ভালোবাসা নামেই এ জিনিসটাকে আমরা চালাই।’^{১২} এই অনুভূতি যার সেই আভাও ভালোবাসার ওপর থেকে আস্থা হারায় না। প্রেমের ভিতর দিয়েই জীবনের মানে খুঁজে দেখতে চান দাশ। তাইতো সুহৃদ যখন মিছেমিছি একজন ইঞ্জিনিয়ার অতিথি আসবে বলে জানায়, আভা উচ্ছ্বসিত হয়। তার ভাবনায় ধরা দেয়:

‘জীবনটা কোনো একটা মুহূর্তের রঙে চঙে থাকে না, তাই যদি হতো কোনো একটা বই নিয়ে থাকা যেত, একটা গান নিয়ে, একটা সেলাই নিয়ে, হয়তো ঘুম নিয়ে, হয়তো মৃত্যু-চিন্তা নিয়ে। কিন্তু জীবন অজস্র তরঙ্গ-প্রতি তরঙ্গের একটা বিরাট মর্মান্তিক কলরব, একে প্রশমিত করা বড় শক্ত।’^{১৩}

তাই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ড্রইংরুম গোছাতে, বাজার থেকে নতুন জিনিসপত্র কিনে ড্রইংরুমের সৌন্দর্য বাড়াতে। এখানে প্রেম বিষয়ে তার মনের দ্বন্দ্বিকতার প্রকাশ ঘটছে।

জীবনানন্দের গল্পে আমরা বারবার দেখতে পাই জীবনের সব শূন্যতা ভরে তোলার জন্য প্রেমই একমাত্র ভরসা। তাইতো আভা দু’বার প্রেম খোয়ানোর পরও তৃতীয়বার আকর্ষণ অনুভব করে। প্রেমে আস্থা হারায় না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জীবনানন্দ সার্বের অস্তিত্ববাদী দর্শনে বিশ্বাস করতেন। কিছু নেই জেনেও মানুষ ক্ষয়িষ্ণু এই জগতকে আঁকড়ে ধরেন, কারণ সে নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, এর বাইরে আর কিছু নেই। In life man commits himself and draws his own portrait, outside of which there is nothing.^{১৪} বেঁচে থাকার মুহূর্তগুলো নানা হতাশায় গড়া বলে সব ত্যাগ করতে হবে এমন ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে হয় না।

দাশের গল্পে নারীরা এসেছে বিচিত্ররূপে। নারীর এই বিচিত্ররূপ তিনি ধরতে চেয়েছেন সামাজিক সাংসারিক দর্পণে। ফ্রয়েডিয়ন দৃষ্টিকোণ থেকে দাশের নারী চরিত্রের ব্যাখ্যা চলে। ফ্রয়েড মানুষের মনে যে নিগুণ স্তরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন সেখানে মানুষের ব্যক্তিত্বে তিনটি সত্তার উপস্থিতি রয়েছে বলে তাঁর ধারণা, তিনি লক্ষ করেন যার একটি হলো জৈবিক সত্তা। জৈবিক সত্তার নীতি হলো ভোগবাদ বা সুখবাদ, সে শুধু সুখ পেতে চায়। তার নারীরা

সুখচারী, ভোগবাদী, স্বার্থান্বেষী। আমাদের চিরচেনা কোমল হৃদয়ের কন্যা-জয়া জননী'র সাথে মিলাতে গেলে হতাশ হতে হবে।

'বাসর শয্যার পাশে' গল্পে প্রেমের দ্বন্দ্বিক রূপের সফল উপস্থাপনা খেয়াল করি। নীহার কণা ও দেবব্রত'র বিয়ে হয়। বাসর ঘরে নীহার এসে জানালার দিকে মুখ করে বসে থাকে। দেবব্রত বিরক্ত করে না। কোথা থেকে উড়ো খবর শুনেছিল নীহার তাকে দেখে পছন্দ করেনি তাই সংকোচ দ্বিধা তাকে ঘিরে ধরে, কাছে যেতে পারে না। এখানে বাসর রাতের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। বাঁশির শব্দ শোনার পর দেবব্রত একাধিক প্রশ্ন করেও নীহারের কাছ থেকে কোন সাড়া পায় না। বাঁশি ছেড়ে যখন গানের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল তখনও কয়েকটি প্রশ্ন করে সে কোনো জবাব পেল না। বিনা বাক্যালাপে বাসর শয্যার প্রথম রাতটা কাটলো। শহরে আসার পরই দেবব্রত নীহারের অন্যরূপ দেখলো। এ পরিবর্তন চোখে পড়বার মত। যেখানে গ্রামের বাড়িতে একটি কথাও বলেনি সেখানে শহরে একদিনের ব্যবধানেই মুখরা হয়ে উঠলো। নতুন বউয়ের দরকার সম্পর্কে সে যে ফিরিস্তি উত্থাপন করছে তা হাস্যকর। জল নতুন বউয়ের লাগে পুরানো বউয়েরও লাগে। আসলে সে চায় কর্তৃত্ব ফলাতে। সে যখন বলে যে সে কাউকে কেয়ার করে না, তখন তার এ অকস্মাৎ পরিবর্তন আমাদের বিস্মিত করে। কলকাতা কি মানুষকে পাল্টে দেয় এভাবে?

সেদিনের রাতের বাঁশিওয়াল গায়ক সম্পর্কে দেবব্রতের প্রশ্নের পিঠে প্রশ্নে নীহারকণা অকস্মাৎ বলে বসে যে সে চারুকে ভালোবাসে। কিন্তু একি তার স্বীকারোক্তি নয়? কারণ দেবব্রত শুধু জানতে চেয়েছিল বাঁশিওয়ালার পরিচয়, তার সাথে কী সম্পর্ক তা নয়। কথা প্রসঙ্গে নীহার তিনবার বলছে, 'চারুকে আমি ছ-বছর ভালোবেসেছি ঠিক ভাইয়ের মত।'^{১৫}

ভাইয়ের মতো ভালোবাসাতো বিয়ের পরও চলতে পারে। তার বিয়ের সাথে সাথে ছ'বছরের মাথায় তা শেষ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কখনো আবার সে বলেছে, 'এখনতো আমি পরস্ত্রী... আমি জানতাম পাড়াগাঁয়ে আমি বিয়ে করবো না।'^{১৬} এলোমেলো কথা তার বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগায়। কেন সে পাড়াগাঁয়ে বিয়ে করতো না এ প্রশ্নে জবাবে যা বলছে তা আরো অভিনব:

'এ রাম, চারুদের সেই খোঁড়ো ঘর; আর একটা দ্বিধি ধ্যাড়ধ্যাড়ে মাগী দিনরাত হাঁড়ি ঠেলে, সে হতো আমার স্বাশুড়ি। যেইনা বউ হয়ে যেতাম আর একেবারে পেয়ে বসতো আমাকে কাকে যেমন করে ময়নার বাচ্চা ঠোকরায়।'^{১৭}

এখানে কেন চারুর কথা আসছে? সে তো বলছে চারুকে ভাইয়ের মতো ভালোবাসতো; তাহলে বিয়ের প্রসঙ্গে কেন চারুকে টেনে আনা? আসলে নীহার চারুকে ভালোবাসে। প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল তাদের মাঝে। চারুর ভালোবাসা তাকে উদ্বেল করেছিল। তাই বিয়ের রাতে চারুর বাঁশি নীহারের হৃদয়ের তন্ত্রীতে বিষাদের সুর তুলেছিল। নইলে শহরে বিয়েই যদি তার কাম্য হয়ে থাকে, শহরে স্বামীর সাথে বিয়ের রাতে একটি বাক্যও বিনিময় হবে না এ অসম্ভব। মেয়েটি আসলে সুখচারী। সে স্বচ্ছন্দে থাকতে চায়। প্রেমের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা তার ধাতে নেই। এ তার প্রেমের এক দ্বন্দ্বিকরূপ, নারীর অন্তর দুর্জেরয়। দাশ নারীর অন্তরের সেই দুর্জেরয় সত্তাটির স্বাক্ষর করেছেন একেবারে ফ্রয়েডিয় চণ্ডে: Unexpressed emotions will never die. They are buried alive and will come forth later in uglier ways.^{১৮}

'বাসর ও বিচ্ছেদ'-গল্পেও স্বামী প্রসাদের যৌন চাহিদার প্রতি স্ত্রী অমলা এ রকম প্রতিরোধপরায়ণ, যার সঠিক কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্ত্রীরা মুখরা হয়, শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাদের কাছে অপছন্দের হয়, কারণে-অকারণে তাদের দশকথা শুনিয়ে দেয়, স্বামীকে কজা করে রাখে সবই হলো কিম্ব যৌন প্রতিরোধ কেন? এও এক নাগরিক জটিলতা।

‘সুখের শরীর’ গল্পেও দেখি পারিবারিক সংকট সৃষ্টিকারী বউ। দেমাগী-বদমেজাজী ঠোনা দেওয়া বউ। ‘বাসর ও বিচ্ছেদ’-এর অমলার মতোই সুখের শরীর ইন্দিরার। এরা উভয়েই ভোগবাদী চরিত্র। স্বামীর প্রতি এদের আচরণ অনেকটা গৃহপালিত পশুর মতো। শুধু চাহিদা মেটাতেই প্রয়োজন।

এই গল্পে আর একটা বিশেষ বিষয় লক্ষণীয়। নানাবিধ নারী চরিত্রের সমাবেশ এখানে, এবং নারীর প্রতিদ্বন্দ্বী নারী, তার কড়া সমালোচক নারী। অবিবাহিতা কমলা নতুন বউ ইন্দিরার হাতকাটা ব্লাউজ পরা সমর্থন করছে না। বউ হলে তারইবা আচরণ কি হবে ঠিক আছে কিছ? বয়োজ্যেষ্ঠরা তাদের সাংসারিক দায়িত্ব পালনই বধূর কর্তব্য জ্ঞান করেন। লক্ষ করি এখানে প্রাচীনা ও নবীনার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দূরত্ব। দুই সময়ের মানুষ দুই ধরনের মানসিকতার দ্বন্দ্ব।

উপসংহার

শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জীবনানন্দ দাশের গল্পের রচনাকাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়। রুশ বিপ্লবের আদর্শ, যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়, বেকারত্ব, নৈরাজ্য, নৈরাশ্য, হতাশা, নিঃসঙ্গতা, প্রেম, যৌনতা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, প্রচলিত মূল্যবোধের পতন তাঁর গল্পের প্রধান উপজীব্য। মানুষের অন্তর্বিরোধ, দ্বন্দ্বিকতাকে দেখেছেন মধ্যবিভেদে অন্তর প্রতিবিম্বে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে দেখি প্রেম ও তার বিচিত্র গতিবিধি, নানা অলিগলিতে পরিক্রমণ। জীবনানন্দ দাশের গল্পে ধরা পড়েছে তার দ্বন্দ্বিকরূপ। সবসময়ই আমরা আশংকার মধ্যে কখন সম্পর্ক ভেঙে পড়ে। যৌনতা এসেছে তার

গল্পে পরিশীলিত উপস্থাপনায়। জীবনের জটিলতার কারণগুলো অনুসন্ধানের চেষ্টিয় রত ছিলেন তিনি, যে জটিলতা এই আধুনিক সভ্যতার দান। T. S. Eliot’র কথায় এর অনুরণন শুনতে পাই:

Our civilization Comprehends great variety and complexity and this variety and complexity playing upon a refined sensibility, must produce various and complex result...^{১৯}

এই জটিল সাংসারিক জীবনের সামগ্রিক চেহারা উন্মোচন ছিল দাশের লক্ষ্য। শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম যে কথাসাহিত্যে তিনি তাঁর নিজস্ব ডিক্শন খুঁজতে তৎপর ছিলেন। তাই তাঁর পথচলা একটু ভিন্নপথে। বিস্তারিত বর্ণনায় না যেয়ে আভাসে বলেন। যে সংকটের কথা তিনি বলতে চান তা ভাষায় বিস্তারিত না বলে পাঠকের উপলব্ধিতে নিয়ে আসেন। তাঁর গল্পে কাহিনী খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে। কারণ তাঁর গল্প কাহিনী-নির্ভর নয়, চরিত্র-নির্ভর। কাহিনী আকারে প্লটের আঁকাবাঁকা পথে তাঁর গল্প এগোয় না। বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনে অথবা ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু ঘটনার ভিতর দিয়ে তাঁর গল্পের ভিত নির্মিত হয়। তাই হয়তো তাঁর গল্প কিছুটা গতিহীন। আর যথেষ্ট তত্ত্বভারাক্রান্ত। সুমিতা চক্রবর্তীও তেমনই মনে করেন:

জীবন সম্পর্কে তাঁর জটিল কিছু চিন্তা যা তিনি কবিতায় ধরতে পারছিলেন না বলে মনে হয়েছিল তাঁর তিনি গদ্যে প্রকাশ করতে চাইছিলেন বারবার। একারণেই একই কথা বারবার বলা হয় তাঁর গল্প-উপন্যাসে। উপন্যাসগুলিকে গল্পের বড় সংস্করণ মনে হয়। একই ধরনের চিন্তা-পদ্ধতি, সংলাপ, ঘটনাসংস্থান বারবার আসে। তাঁর গল্প ঠিক জীবনরসে রসময় নয়, তত্ত্বভাবনায় জটিল।^{২০}

এগুলোকে ক্রটি মানলেও জীবনানন্দ দাশের গল্প আমাদের সামনে কিছু সামাজিক সংকটের চিত্র নিয়ে হাজির হয়। তার গভীর উপলব্ধি পাঠকের কাছে জীবনের একটা সামগ্রিক অস্তিত্ববাদী চেহারা উন্মোচন করে। আর এখানেই জীবনানন্দের সফলতা।

তথ্যসূত্র

১. সমীরণ মজুমদার, *জীবনানন্দ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মোদিনীপুর, ১৯৯২, পৃ. ১১
২. জীবনানন্দ দাশের *শ্রেষ্ঠ গল্পসমগ্র*, সম্পাদনা বদরুল হায়দার, স্বদেশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৫২
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৫. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য বিচার: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১১১
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৭. জীবনানন্দ দাশের *শ্রেষ্ঠ গল্পসমগ্র*, পৃ. ১১৫
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
১৪. Jean Paul Sartre : Basic Writings, Edited by Stephen Prist, Routledge, London, 2001, p. 37
১৫. জীবনানন্দ দাশের *শ্রেষ্ঠ গল্পসমগ্র*, পৃ. ৮৯
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
১৮. Sigmund Freud ... <https://www.goodreads.com/quotes/422467->

unexpressed-emotions-will-never-die-they-are-buried-alive-and

১৯. T. S. Eliot, *The Metaphysical Poets*, Times Literary Supplement, 20 October 1921
২০. সুমিতা চক্রবর্তী, *জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২৩



BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

English Section

Contents

English Section

- ◆ Studies on Ecological Aspects and Polluting Effects on Biodiversity with Special Reference to Shellfish and Finfish Fauna in Wetlands of Southwestern Bangladesh
Dr. Bidhan Chandra Biswas, Neetish Chandra Shil & Dr. Ashis Kumar Panigrahi 105-118
- ◆ Lurie's Transformation in *Disgrace* : Conversion of a Predator into a Philosopher
Bam Dev Adhikari (Ph.D.) 119-134
- ◆ Teachers' and Learners' Perception of Feedback Strategies in Classroom Teaching
Mahadi Hasan Bappy 135-147
- ◆ Searching the "I" through the Female Characters in selected Novels (Translated) of Sangeeta Bandyopadhyay
Rupsa Mukherjee Banerjee 148-158
- ◆ The Changing Pattern of Social Relationship for COVID-19 in India and Bangladesh
Dr. K. M. Rezaul Karim & Dr. Samita Manna 159-172
- ◆ Water-Logging in *Bhabadaha* : A Search for the Cause of Its Persistence
Sankar Biswas 173-185
- ◆ Impact of COVID-19 Pandemic on Adolescent Mental Health : A Brief Review
Dr. Mrinal Mukherjee 186-195
- ◆ Sustainable Development Goals and Socially Excluded Groups : End of Poverty and Inequalities in Marginalised People
Dr. Dilip Kumar Bhuyan 196-212



Volume -III, Issue-I, July 2021

Government
Brajalal College
Khulna
Bangladesh

BL College Journal

ISSN

ISSN : 2664-228X (Print)

ISSN 2710-3684 (Online)

Volume -III Issue-I

July 2021



Studies on Ecological Aspects and Polluting Effects on Biodiversity with Special Reference to Shellfish and Finfish Fauna in Wetlands of Southwestern Bangladesh

Dr. Bidhan Chandra Biswas, Neetish Chandra Shil & Dr. Ashis Kumar Panigrahi

Abstract

Wetlands are vital for holding biodiversity, supply of protein, groundwater recharging, attenuate floods, nutrient recycling, and climate purification. The southwestern part of Bangladesh is blessed with plenty of wetlands originated from the Ganga-Padma river system, which characterized by many diverse types of water bodies as marshes, swamps, and canals, etc. These remarkable water bodies are degraded day by day because of rapid urbanization, population growth, and changes in hydro bioecology. The study was attempted to understand the role of wetland ecology. There is an urgent need to protect and restore of those precious wetlands of this area.

Dr. Bidhan Chandra Biswas
Associate professor
Department of Zoology
Govt. Brajajal College Khulna, Bangladesh
e-mail: bidhan.biswas67@gmail.com

Neetish Chandra Shil
Assistant Professor
Department of Zoology
Govt. Brajajal College Khulna, Bangladesh
e-mail: neetishshil@gmail.com

Dr. Ashis Kumar Panigrahi
Professor
Aquaculture fisheries and ecotoxicology
Lab, Department of Zoology
University of Kalyani, West Bengal, India.
&
Pro Vice-chancellor
University of Burdwan
West Bengal, India
e-mail: panigrahi.ashis@gmail.com

Keywords

Ecology, Pollution, Wetland, Fish, Southwestern Bangladesh

Introduction

Wetlands are the most productive habitats of rich biodiversity. The wetlands support the life and livelihood of millions of people around the globe. The total area of wetlands is about 6.8 million sq. km,

which is covered about 6% of the earth's land surface. They are considered one of the most threatened natural ecosystems¹. In Bangladesh, rivers, floodplains, lakes, swamps, marshes, moorlands, quagmires, ponds, low-lying areas, etc., are generally

treated as wetlands. The definition of wetlands is:

‘Wetlands means any land where water remains as the level of surface or close to it and which inundates with shallow water from time to time, and where grows such plants that may usually grow and survive in marsh land.’²

Water is a building block of life and a natural resource of immense importance in Bangladesh. Rivers, wetlands, and seasonal floods are the lifeblood of this country. However, the availability of fresh water depends on the periodic flow of rainfall, whether a monsoon climate mainly administers the weather of Bangladesh. Bangladesh is a low riparian country of having widespread aquatic resources estimated as 47,12,205 hectares of inland fisheries. The distribution pattern of water bodies is scattered throughout the country. There are roughly 500 water bodies in the form of *baors* (oxbow lakes) in the southwestern part of Bangladesh, an estimated 5,488 hectares.³ These wetlands offered similarities in colour, taste, and flora and fauna. Several researchers worked on the ecology of wetlands and their management system concerning limnology, biodiversity, and conservation.⁴⁻⁷

The formation of oxbow lakes (*baors*) occurs mainly in the river’s lower stretches because of the high discharge of

water during monsoon in the lower deltaic region. The word marsh is mostly used for a pond-shaped wetland with lotic habitat. These wetlands are considered one of the most diverse ecosystems. Additionally, they also play a significant role in maintaining biodiversity, groundwater recharging, flood control, supply of drinking water, pollution reduction, cattle rearing, supporting the livelihood of the rural people. Furthermore, these wetlands also enhance biodiversity, as they play a vital role in the survival of many threatened and endangered species.⁸ These aquatic resources hold rich floral and faunal diversity and support significant fisheries in the concerned region.

Finfish and shellfish are not usually the victim of intentional poisoning. Except for designed use in freshwater bodies and research, the anthropogenic substances that harm living resources are waste or byproducts from industry, agriculture, transportation, and domestic activities.

According to Odum (1971):

‘Pollution is an undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of air, land and water that may affect the human life.’⁹

The pollutants cause undesirable physical and biological changes. It is connected with unfavorable alterations in the ecology and causes toxic effects on living and

non-living resources. Pollution results in human health hazards and responsible for killing bio-resources like fishes, prawns, molluscs, and several organisms.¹⁰

Surface water of freshwater bodies was contaminated by xenobiotics responsible for changing water chemistry, reduced productivity of the water body, responsible for loss of biodiversity, including finfish and shellfish. Wetlands in Bangladesh were rich in freshwater species, which consist of 260 indigenous species, 12 exotic species, and 24 freshwater prawns.¹¹ For considering this point of view, the present study has been undertaken to assess the current condition of these wetlands and their conservation for the well-being of human existence and proper maintenance of the wetland ecosystem.

Materials and Methods

Study Area

Although there are plenty of wetlands in the lower course of the Ganga-Padma river system and its tributaries in Bangladesh, some are considered for analysis. These are as follows:

Table-1: Selected wetlands and their geographical position

No.	Name of wetlands	Upazila & District	Latitude/ Longitude	Elevation (meters)	Area (hectars)	Type of Waterbody
1.	Kayetpara Baor	Horimakundu Jhenaidah	23°39'48.44"N 89° 0'43.05"E	5	163	Oxbow Lake
2.	Chandor Beel	Jhenaidah Sadar, Jhenaidah	23°29'7.05"N 89°13'16.16"E	6	151	Shallow lakes

3.	Joydia Baor	Kotchandpur Jhenaidah	23°26'36.78"N 88°56'39.77"E	6	341	Oxbow Lake
4.	Boluhar Baor	Kotchandpur Jhenaidah	23°24'37.83"N 88°59'8.23"E	6	290	Oxbow Lake
5.	Dubli Beel	Mohespur Jhenaidah	23°20'55.68"N 88°58'30.58"E	5	352	Shallow lakes

STUDY AREA WETLANDS OF SOUTH WESTERN BANGLADESH

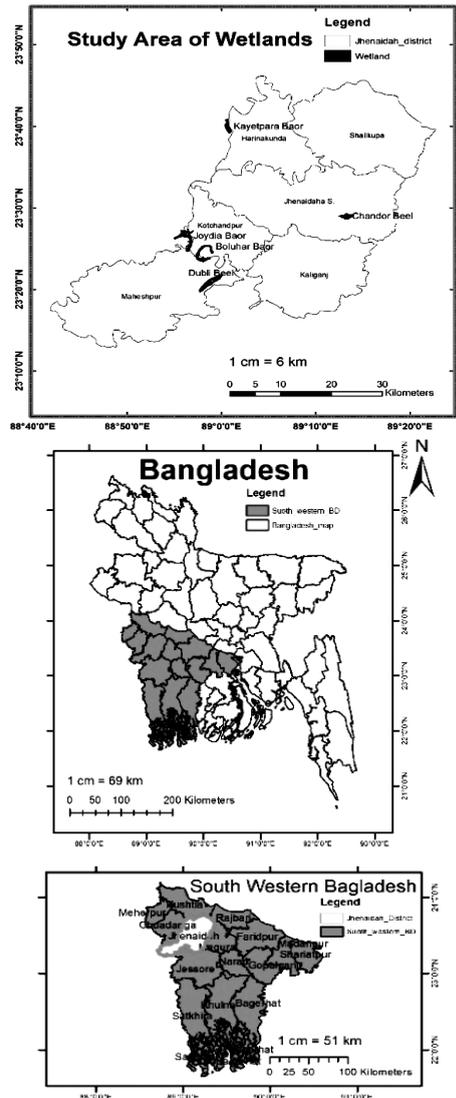


Figure 1: Selected water bodies of Southwestern Bangladesh.

Sampling Method and Identification

The study was carried out from July 2014 to June 2016. The present status of the aquatic community, especially of finfish and shellfishes, will be studied with its deviation on three different seasons: viz-pre-monsoon, monsoon, and post-monsoon. The fishes were collected from the fishermen of other points of the water bodies during conducted the survey. The collected specimens were identified based on morphometric and meristic characters following Rahman,¹² Talwar,¹³ and IUCN.¹⁴

The shellfish were collected by hand picking method on the wetlands. Sample sites were selected based on their availability, distribution pattern, and habitat and vegetation of the water bodies. Available keys and literature¹⁵ made identifications of shellfishes based on morphological features of the shell.

Besides those, the invasion of an enormous amount of water hyacinth in the water bodies will be appropriately studied. The impact of migratory waterbirds on different water quality parameters will be investigated thoroughly.

Study of Physicochemical Characteristics

Water samples were collected from the different point sources of wetlands. The seasonal variations of Limnological parameters with and other parts of

the same water body will be studied according to APHA,¹⁶ and Trivedi.¹⁷ The PH value of water bodies was used to calculate by the Hanna device. The study was conducted on primary and secondary sources of data and literature. Vast areas of croplands around the water bodies affect the wetlands of agricultural runoff, principally insecticide, herbicides, and pesticides on the aquatic ecosystem, will be analyzed. The proper scientific procedure will survey the effects of jute retting and various anthropological activities on physicochemical parameters of the water body.

Fish Diversity Analysis

The diversity indices of fishes were calculated in the present work by Shannon-Weaver index (H').¹⁸

Shannon Weiner's diversity index considers both the number of species and the distribution of individuals among species. The formula of H is given below:

$$H' = \sum P_i \times \log P_i,$$

where $P_i = n_i/N$

Where n_i is the number of individuals of each species in the sample, N is the total number of individuals of all species in the model.

Statistical analysis: The collected data were analyzed using Microsoft excel 2010 and presented in tabular and graphical

forms. PAST (paleontological Statistics) version 3 was used to assess biodiversity indices.

Results and Discussions

Several pollution sources were identified during the period of survey, which are depicted in the table-2.

Table-2: Sources of pollution and nature of pollutants of the selected wetlands

No.	Name of wetlands	Source of Pollution	Nature of pollutants
1.	Kayetpara Baor	Agricultural run-off Domestic sewage	Pesticides, Insecticides, herbicides and fertilizer Soap, detergent, washing of cattle, cow dung, washing of fertilizer bag and pesticides container.
2.	Chandor Beel	Agricultural run-off Silt	Pesticides, Insecticides, herbicides and fertilizer Clay
3.	Joydia Baor	Bricks fields Jute Retting Domestic sewage	Fly ash Organic wastes Soap, detergent, washing of cattle, cow dung, washing of fertilizer bag and pesticides container.
4.	Bluhar Baor	Domestic sewage Jute Retting Bricks fields	Soap, detergent, washing of cattle, cow dung, washing of fertilizer bag and pesticides container. Organic wastes Fly ash
5.	Dubli Beel	Silt Agricultural run-off Jute Retting	Clay Pesticides, Insecticides, herbicides and fertilizer Organic wastes

It was observed from the study that 5 species of Gastropods and two species of Bivalvia were identified during the study period. The common species were *Bellamya bengalensis*, *Pila globosa*, *Thiara scabra*, *Lymnaea luteola*, *Lymnaea accuminata*, *Lamellidens marginalis*, *Lamellidens corrianus*.

A similar observation was found to the findings of BC Biswas¹⁹ and K. Sharma.²⁰ Molluscs are common components of benthic communities. Understanding their role in the aquatic ecosystems and their contribution to biomass production is deficient²¹. Realizing the ecological importance of this insufficiently explored phylum Mollusca, the present work was undertaken to enlist the molluscan wealth of freshwater bodies and perceive the impact of some Physicochemical variables for a study period.

It is important to note that the most sensitive species are those that are characterized by particular life-history traits, such as strict habitat specialization, restricted geographic range, long maturation time, low fecundity, obligate parasitic larval stage on gills or fins of host fish and longevity²². These traits prevent species from adapting to significant alterations of the natural habitat, including but not restricted to changes in flow regimes, siltation and pollution. In contrast, ecologically more generalist competitors, such as introduced species, will benefit from the anthropogenic influence.²³

The influence of temperature and pH is essential for the distribution and abundance of shellfishes, especially for *Lymnaea* sp. in the lotic environment, and a suitable pH range was 6-7.5.

Sufficient calcium ions in water play a significant role in the distribution process of malacofauna. Juvenile shellfishes in the aquatic ecosystem were used as good food for catfishes like *Mystus tengra*, *Ompok pabda*, *Heteropneustes fossilis*, etc.

The study reveals that molluscs face a threat because of anthropogenic disturbances, excessive use of agrochemicals, large agricultural practices by the side of the river, over-harvesting of shellfishes for production of lime and poultry feed, over-extraction of water for irrigation and excessive temperature during summer cause the mass mortality of shellfishes.¹⁹ Furthermore, migratory waterbirds used shellfishes as their primary food during winter, causing harm to the population of shellfishes. In the case of finfishes, 43 species under 8 orders belong to 17 families were identified from the wetlands. During the study, it was observed that Cyprinidae was dominant among all families with 13 species, followed by Channidae and Bagridae with four species, Ambassidae and Osphronemidae, with three species each. Clupeidae, Notopteridae, Siluridae and Mastacembelidae with two species each whereas, Aplocheilidae, Gobiidae, Nandidae, Anabantidae Belonidae, Clariidae, Heteropneustidae and Tetrodontidae were each represented by a single species. This study was like the observation of Chakrabarty²⁴ and R

Das.²⁵ Some of them are *Gudusia chapra*, *Corica soborna*, *Amblypharyngodon mola*, *Esomus danricus*, *Osteobrama cotio*, *Salmophasia acinaceus*, *Catla catla*, *Cirrhinus cirrhosis*, *Labeo bata*, *Labeo calbasu*, *Labeo rohita*, *Systomus sarana*, *Puntius sophore*, *Pethia ticto*, *Aplocheilus panchax*, *Notopterus chitala*, *Notopterus notopterus*, *Glossogobius giuris*, *Channa marulius*, *Channa punctatus*, *Channa striatus*, *Chanda nama*, *Pseudambassis lala*, *Pseudambassis lala*, *Pseudambassis ranga*, *Nandus nandus*, *Anabas testudineas*, *Trichogaster fasciatus*, *Trichogaster lalius*, *Trichogaster chuna*, *Xenentodon cancila*, *Mystus cavasius*, *Mystus tengara*, *Mystus vittatus*, *Ompok pabda*, *Wallago attu*, *Clarias batrachus*, *Clarias batrachus*, *Heteropneustes fossilis*, *Macrognathus aculeatus*, *Macrognathus pancalus*, *Tetraodon cutcutia*. From this study, a maximum fish diversity index was recorded during the monsoon season ($H=2.785$) due to water availability and ample food as compared to the pre-monsoon ($H=1.132$) and post-monsoon ($H=1.829$), due to shrinkage of water distribution. These water bodies remained well connected to the other floodplains of the wetland complex during the monsoon, but these are well separated from each other during the rest of the seasons. Variety of different fishes enters the marshes from other wetlands

during monsoon due to open migratory routes, which helps fish assemblage in a wonderful quality resulting in a higher value of fish diversity indices.

The same findings were also reported by²⁶ in wetlands of Assam, India. The present study of fish fauna showed that most of the fish species recorded were widely distributed in the rivers and streams of all freshwater bodies in Bangladesh. Therefore, the present investigation reveals that Cyprinid fishes are the more dominant group than others, supported by other studies 19.²⁷ Some of them are considered commercially essential and cultivable fishes from the recorded fish species, including *Ompok pabda*, *Notopterus notopterus*, *Cyprinu carpio*, *Oreochromis mossambica*, *Labeo rohita*, *Cirrhinus cirrhosus*, *Catla catla*, *Heteropneustes fossilis* *Channa striatus* and *Channa marulius*. The current study has also shown that the water bodies inhabit ornamental fishes like *Puntius sp.* *Chanda ranga*, *Trichogaster sp.* which have bright colours and small, can be treated as aquarium fishes to decorate the room and hobby, giving immense pleasure during rearing. Three exotic species viz., *Cyprinus carpio*, *Ctenopharyngodon idella* and *Oreochromis mossambicus* were recorded in the present study during the study period. However, due attention should be paid to the presence of these

species, as they may dominate and even eliminate the native fish fauna of the wetlands.

The species of *Clarias*, *Channa*, *Mastacembelus*, *Heteropneustes*, etc., have air-breathing organs that can tolerate high pollution.

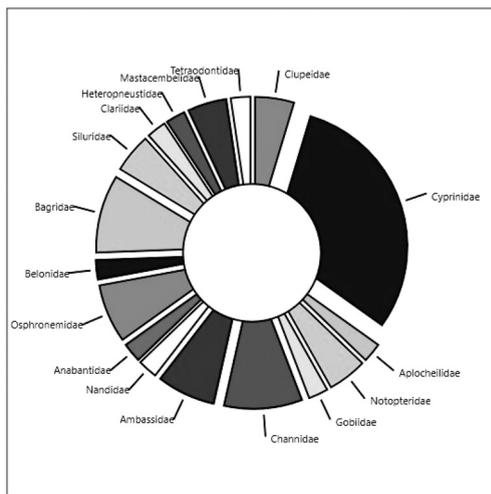


Figure 2: Graphical Presentation of family wise distribution of fishes.

However, *Nandus nandus*, *Notopterus chitala*, *Labeo calbasu* found to be a rare species in the present study. With the onset of the Southwest monsoon, a heavy influx of freshwater occurs in the wetlands in early July, developing a freshwater isostatic habitat. Human anthropogenic activities and overexploitation lead to a rapid decline in fish diversity. Though commercially essential species are available, they are not abundant to make fishery commercial and economical.

Conservation measures require a forestation program by the side of the water bodies and educate people to create awareness on illegal fishing and killing of brood fishes and juveniles.

Water pollution is a global threat to humans and other animals' populations, which interact with aquatic environments.²⁸ Adequate information is available on the concentrations of many pollutants or toxic substances responsible for killing fish and other aquatic organisms.²⁰

The severity of the damage depends on the potentiality of a particular compound accumulated in the organs. Therefore, exposure to these toxicants may adversely affect different systems in fish, which could ultimately affect organs such as blood, liver, gill and kidney that could impair behaviour, growth and development.

The diversity of the fishes mainly depends upon the biotic and abiotic factors and type of the ecosystem, age of the water body, mean depth, water level fluctuations, morphometric features, and bottom have significant implications. The hydro-biological features of the collection centers also play an influential role in fisheries output to a greater extent.

The study findings showed that the fish diversity of the study area is reduced with the increase of pollution on water quality. As a result, the declining of the

fish production of native species occurs responsible for creating the extinction of several species.²⁹ These consequences finally generate instability in the socio-economic sector of the study area in terms of increased poverty of local fishers. It postulates a rapid decline in fish diversity at discharged zone (polluted) of the *baors*. Such observation has also been supported by the findings of koul.³⁰ In the contaminated water condition, bodies of the tolerant species such as *Oreochromis mossambicus* are thriving well commercially essential and sensitive native species such as *Wallago attu*, *Labeo calbasu*, *Puntius sp.* etc., are considered being threatened by increasing water pollution. This investigation would control water pollution tools and conserving the fish species in the water bodies.

The health condition of a water body depends on its Physico-chemical parameters. Total floral and faunal diversity changes vary with the fluctuations of different parameters at different seasons.²⁰ Water quality parameters and nutrition play a significant role in shaping the distribution pattern and species composition of phytoplankton and Zooplankton. The productivity of the water quality depends on.³¹
³² Temperature, penetration of light, soluble solids and dissolved gases are

treated as physical factors of the aquatic environment, and chemical factors include PH, hardness, salinity, Phosphate and nitrate, are essential for the reproduction of phytoplankton on which Zooplankton and other animals depend for their survival.^{33, 34} The seasonal deviations in water quality parameters show a profound effect on the distribution pattern of biota.⁹ The temperature of water fluctuated round the year with its seasonal variations depending on day temperature, day length and radiation of the solar.

At that time, increasing energy consumption resulted in greater oxygen use of fish and other aquatic organisms. Excessive production of phytoplankton will lead to algal bloom. Aquatic organisms suffered respiratory and other undesirable effects such as clogging of gills and further internal damage.¹⁹

Animals in the aquatic environment feel stressed when the temperature changes rapidly because of not getting sufficient time for their physiological adjustments to seize the reproduction and behaviour of biota in the wetlands. According to renowned limnologists Boyd^{33, 34} a decrease in temperature also positively correlates with the increase in DO levels in the water. The temperature in the water is more or less 35° Celsius, treated as high temperature in water. High temperature speeds up the biodegradable process

resulting releases toxic substances like ammonia and poisonous gases.

Water quality parameters	Pre-monsoon	Monsoon	Post monsoon
Temperature (Celcius)	32±0.21	29±0.31	20±0.16
PH	7.12±0.09	7.37±0.07	7.82±0.04
Hardness (mg/l)	144±0.42	117±0.32	124±0.21
Alkalinity(mg/l)	188±0.36	192±0.27	178±0.41
Dissolved oxygen (Do) mg/l	4.4±0.02	4.69±0.03	4.89±0.05

It was observed from the study (table-3) that there were distinct seasonal fluctuations among all season's pre-monsoon, monsoon and post-monsoon. The seasonal variation of water quality parameters was observed from the findings of many researchers.³⁵⁻³⁷ The temperature varies with the changes in atmospheric temperature, shallow depth and solar radiation. A high temperature was observed in summer, but a low temperature was observed in winter. A high degree of alkalinity and hardness was observed in pre-monsoon compare to other seasons.³⁵

During the monsoon, water turbidity was increased because of surface runoff and encroachment inhibit the light penetration of the wetlands resulting from the block of photosynthesis and respiration of biota. Silt deposited in the bottom layer of wetlands affected the eggs, larva and benthic communities. pH is determined by the presence of H⁺ ion concentration in water and expressed acidic and

alkalinity in nature.^{38,39} The pH value is 7 is called neutral, and the range 6 to 9 is suitable for fish production. A high value of pH was reflected in post-monsoon compared to another season. The amount of alkalinity is influenced by the increased rate of nitrogen and phosphorus because of large agricultural practices by the side of the water bodies.³⁵ The presence of phytoplankton and vegetation in wetlands plays an essential role in the photosynthesis process by absorbing CO₂ and releasing O₂.

Jute retting is one of the significant problems in those wetlands. After the monsoon period, this activity is done on a large scale in different sites of the water bodies. This may increase BOD, COD and turbidity, as a result, decrease DO level in the water. The water becomes turbid, reducing the sunlight penetration in water to hamper the primary productivity.

In recent years water hyacinth invasion is a modest problem in the water body. Water hyacinth on a large scale may reduce the dissolved oxygen level in the water and block the sunlight penetration. Besides these, natural migratory processes are blocked affect auto stocking. So, it may affect the biodiversity and total productivity of the lake ecosystem.

It is well known that the ox-bow lakes are the unique type of lakes which comprise

both Lake and riverine ecosystem and these are one of the most productive ecosystems. These ecosystems are recently susceptible to become polluted by sewage disposal from surroundings and various other anthropological activities because of rapid urbanization and industrialization. So we should give special attention to revitalize those unique ecosystems.²⁹⁻⁴⁰

The contamination of surface water by agrochemicals reported worldwide and constituted a significant issue at local, regional, national, and global levels.^{41,42} There are several ways by which agrochemicals reach the aquatic environment by surface runoff, aerial spraying, aerosol carried by the wind, washing of container, etc. Those bio non-degradable chemical products that contain heavy metals may severely affect the lives of biota through bioaccumulation and biomagnifications. It may also affect the food chain in the ecosystem.

Toxic property of some of these chemicals causes environmental and ecological damages, reducing their benefits. The excessive, uncontrolled and unregulated use of fertilizers has increased groundwater contamination with nitrate that in huge concentration is poisonous to humans and animals. Additionally, the runoff fertilizers and pesticides

into surface waters responsible for the formation of algal bloom, which causes a detrimental effect on the ecosystem.^{29-43, 44}

During the winter season, a variety of waterbird species aggregate in these water bodies. The aggregation of massive migratory waterbird species in such water bodies resulted in significant water quality changes because of an extra load of nutrients during the winter seasons. The organic load of these water bodies will be increased because of the accumulation of bird guano and other activities. So, the aquatic environment at that time will be degraded.²⁹

The best scientific methods for conserving the species are conveying information about protection to fishes, retailers, traders and other stakeholders about the danger of extinction of the indigenous species. Policymakers, civil society, fish biologists, limnologists, ecologists, and conservationists have a significant role in creating public awareness and support for conservation mechanisms for the species to do a successful implementation.

Conclusion

Our prime need is to protect the available indigenous fishes bearing significant importance of ecology, and appropriate steps should be taken to enhance the quality of the cultivable species. High-risk areas of wetlands should be identified

for effective monitoring and sustainable conservation practices.

References

1. Matthews, E., & Fung, I., Methane Emission from Natural Wetlands: Global Distribution, Area, and Environmental Characteristics of Sources. *Global Biogeochemical Cycles* 1 (1)1987, Pp. 61-86
2. Bangladesh Water Act. Pub. L. No. 14 of (2013). Bangladesh, 2013
3. DoF, National Fish Week 2020 Compendium (In Bengali). Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Government of Bangladesh 2020; Pp. 167
4. Abdullah-Bin-Farid, B. S.; Mondal, S.; Satu, K. A.; Adhikary, R. K.; Saha, D., Management and Socio-Economic Conditions of Fishermen of the Baluhar Baor, Jhenaidah, Bangladesh. *Journal of Fisheries* 1 (1)2013, Pp. 30-36
5. Chakraborty, B.; Azad, S.; Siddiqua, A.; Moinul, K., Conservation Status of Finfish and Shellfish in Haria Beel in Bangladesh and Prospect for Utilizing the Beel for Conservation and Production of Fish. *Journal of Crop Weed* 9 (1) 2013, Pp. 38-51
6. Leopold, A., Wilderness as a Land Laboratory. *Living Wilderness* 6 (3) 1941, Pp. 287-289

7. Patra, A.; Santra, K.; Manna, C., Limnological Studies Related to Physicochemical Characteristics of Water of Santragachi and Joypur Jheel, WB, India. *Our nature* 8 (1) 2010, Pp.185-203
8. Mitsch, W. J.; Gosselink, J. G., *Wetlands*. 5th ed.; 2015; Pp. 704
9. Odum, E., *Fundamentals of Ecology*. Third Edition ed.; W.B. Saunders Co: Philadelphia, 1971; Pp. 546
10. Kalita, G. J.; Sarma, P. K.; Goswami, P.; Rout, S., Socio-Economic Status of Fishermen and Different Fishing Gear Used in Beki River, Barpeta, Assam. *Journal of Entomology* 3 (1) 2015, Pp. 193-198
11. DoF, National Fish Week 2013 Compendium (In Bengali). Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Government of Bangladesh: 2013; Pp. 135
12. Rahman, A. A., *Freshwater Fishes of Bangladesh*. 2nd ed.; Zoological Society of Bangladesh: 2005; Pp. 412
13. Talwar, P. K.; Jhingran, A. G., *Inland Fishes of India and Adjacent Countries*. Vol. 1 & 2, 1st ed.; CRC Press: 1991; Pp. 1158
14. IUCN, Red List of Bangladesh Volume-5: Freshwater Fishes. IUCN, International Union for Conservation of Nature, Bangladesh Country Office, Dhaka, Bangladesh. 2015, Pp. 360
15. Subba Rao, N., *Handbook, Freshwater Molluscs of India*. Vol. 9, Zoological Survey of India: 1989; Pp. 289
16. APHA, *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 21 th ed.; 2005
17. Trivedy, R. K.; Goel, P. K., *Chemical and Biological Methods for Water Pollution*. 1984; Pp. 250
18. Shannon, C.; Weaver, W., *The Mathematical Theory of Communication*. University of Illinois Press, Urbana. 1949, Pp. 54
19. Biswas, B. C. Effect of Different Agrochemical Products on Fin Fish and Shell Fish of Fresh Water Bodies. PhD Thesis, Department of Zoology, University of Kalyani, West Bengla, India, 2016
20. Sharma, K.; Bangotra, K.; Saini, M., Diversity and Distribution of Mollusca in Relation to the Physico-Chemical Profile of Gho-Manhasan Stream, Jammu (JK). *International Journal of Biodiversity Conservation* 5 (4) 2013, Pp. 240-249
21. Supian, Z.; Ikhwanuddin, A., Population Dynamics of Freshwater Molluscs (Gastropod: Melanoides Tuberculata) in Crocker Range Park, Sabah. *ASEAN Review of Biodiversity Environmental Conservation* 1 (1) 2002, Pp.1-9
22. Strong, E. E.; Gargominy, O.; Ponder, W. F.; Bouchet, P., *Global Diversity of Gastropods (Gastropoda; Mollusca)*

- in Freshwater. In *Freshwater Animal Diversity Assessment*, Springer: 2007; Pp. 149-166
23. Garg, R.; Rao, R.; Saksena, D., Correlation of Molluscan Diversity With Physico-Chemical characteristics of Water of PpRamsagar Reservoir, India. *International Journal of Biodiversity Conservation* 1 (6) 2009, Pp. 202-207
24. Chakraborty, B.; Mirza, M., Study of Aquatic Biodiversity of Gharia Beel of Bangladesh. *Journal of Crop Weed* 3 (1) 2007, Pp. 23-34
25. Das, R.; Roy, M.; Khan, A.; Nandi, C., Ecology and Macroinvertebrate Faunal Diversity of Some Floodplain Wetlands of River Ganga in West Bengal. *Rec. Zool. Surv. India* 109 2009, Pp. 65-72
26. Kar, D., WETLANDS AND THEIR FISH DIVERSITY IN ASSAM (INDIA). *Ransylvanian Review of Systematical Ecological Research* 21 (3) 2019, Pp. 47-94
27. Das, R. K., Fish Diversity and the Conservation Status of a Wetland of Cooch Behar District, West Bengal, India. *Journal of Threatened Taxa* 10 (3) 2018, Pp. 11423-11431
28. Svensson, B.-G.; Hallberg, T.; Nilsson, A.; Schütz, A.; Hagmar, L., Parameters of Immunological Competence in subjects with high consumption of Fish Contaminated with Persistent Organochlorin Compounds. *International Archives of Occupational Environmental Health* 65 (6) 1994, Pp. 351-358
29. Das, S.; Chakrabarty, D., The use of Fish Community Structure as a Measure of Ecological Degradation: A Case Study in two Tropical Rivers of India. *Biosystems* 90 (1) 2007, Pp. 188-196
30. Koul, V., Effects of Industrial Effluents and Gandhinagar Sewage on Abiotic and Biotic (Macroinvertebrates and fish) Components of Behlol Nullah, Jammu. Ph.D Thesis, University of Jammu 2000.
31. Foote, A. L.; Pandey, S.; Krogman, N. T., Processes of Wetland Loss in India. *Environmental Conservation* 1996, Pp. 45-54
32. Ganesan, L.; Khan, R., Studies on the Ecology of Zooplankton in a Floodplain Wetland of West Bengal, India. *Proceedings of Taal* 2007, Pp. 67-73
33. Boyd, C. E., *Water Quality Management for Pond Fish Culture*. Elsevier Scientific Publishing Co.: 1982; Pp. 318.
34. Boyd, C. E.; Tucker, C. S., *Pond Aquaculture Water Quality Management*. 1998th ed.; Springer 2012; Pp. 715
35. Rahman, A. L.; Islam, M.; Hossain, M.; Ahsan, M., Study of the Seasonal Variations in Turag River Water Quality Parameters. *African Journal of Pure Applied Chemistry* 6 (10)2012, Pp. 144-148

36. Sarkar C, S. N. C., Seasonal Variation of Water Quality Parameters and Their Impact on Fish Biodiversity Indices of Hasadanga Beel: A Case Study. *Curr World Environ* 16 (1) 2021
37. Mahboob, S.; Sheri, A.; Sial, M.; Javed, M.; Afzal, M., Seasonal Changes in Physico-Chemistry and Planktonic Life of a Commercial fish farm. *Pakistan Journal of Agricultural Sciences* 25 1988, Pp. 25-27
38. Jalil, M.; Njiru, C. In *Water Demand Management at Household level: Problems and Prospects*, Proceedings of the International Symposium on Environmental Degradation and Sustainable Development, Published by Centre for Environmental Resource Management, BUET, Dhaka, 2010; Pp. 31-37
39. Swingle, H., Standardization of Chemical Analysis for Waters and Pond Muds. *FAO Fish. Rep* 4 (44) 1967, Pp. 397-421
40. Suvramanium, V., *Asian journal of Water Environment and Pollution* 1 (1) 2004, Pp. 41-54
41. Cerejeira, M.; Viana, P.; Batista, S.; Pereira, T.; Silva, E.; Valério, M.; Silva, A.; Ferreira, M.; Silva-Fernandes, A., Pesticides in Portuguese Surface and Ground Waters. *Water research* 37 (5) 2003, Pp. 1055-1063
42. Spalding, R. F.; Exner, M. E.; Snow, D. D.; Cassada, D. A.; Burbach, M. E.; Monson, S., Herbicides in Ground Water Beneath Nebraska's Management Systems Evaluation Area. *Journal of Environmental Quality* 32 (1) 2003, Pp. 92-99
43. Biswas, B. C.; Panigrahi, A. K., Impact of Anthropogenic Activities on Wetlands and its Management Strategies. *Pioneer Journal of it and Management* 10 (1) 2014, Pp. 304-307
44. Biswas, B. C.; Panigrahi, A. K., Ecology and zooplankton Diversity of a Wetland at Jhenidah District Bangladesh. *International Journal for Innovative Research in Scienceec and Technology* 1(9) 2015, Pp. 246-249



Lurie's Transformation in *Disgrace* Conversion of a Predator into a Philosopher

Bam Dev Adhikari (Ph.D.)

Abstract

Prof. David Lurie, the protagonist of J.M. Coetzee's novel Disgrace, is portrayed as an enigmatic character. In the initial reception, the readers find him as a virile person, who gives much importance to his sexual pleasure. A professor at Cape Tech. University in the profession and a divorced man in his family life, Professor Lurie balances his emotional and intellectual life by teaching in the university and visiting professional sex workers once a week. His sexual engagement with different kinds of women in the preliminary phase of the novel makes him "a sexual predator". However, the balance begins to deteriorate when Prof. Lurie seduces Melanie, a student in his university. The white professor seducing a black girl in post-apartheid South Africa becomes meaningful in the novel. As the plot develops, Lurie faces difficult situations: his sexual scandal with Melanie works as an exciting force, the case in the university and his dismissal from the job as rising action or complication, his daughter being raped by the black men as the climax and his acceptance of a job in animal euthanasia as the resolution of the plot. These different plot stages correspond with Prof. Lurie's different phases in the novel: indulgence phase, denial phase, confrontation phase, realization phase, and finally, the reconciliation phase. The reconciliation phase works as the resolution and brings a paradigm shift in the protagonist's destiny, culminating to a philosopher's stage.

Bam Dev Adhikari (Ph.D.)

Associate Professor
Tribhuvan University
Kathmandu, Nepal
e-mail : adhikaribamdev@gmail.com

Keywords

Indulgence, Denial, Confrontation, Realization, Reconciliation, Transformation
Predator, Conversion, Philosopher

Introduction

David Lurie is a professor at the University of Cape Town in the transition period when South Africa is casting off its colonial color and establishing a new identity. Prof. Lurie, a white man of fifty-two, is portrayed as a residue of apartheid Eurocentric white man. South Africa has reinstated the black people in the governance, but Lurie, as a white man, is intact in his prestigious university job. The novel presents Lurie in a degraded status as he cannot preserve his former position as a white man in a post-apartheid country. Different circumstances play roles in degrading Lurie's moral and professional integrity. Several factors work in shaping Lurie's thoughts, feelings and attitudes. First, Lurie himself is the architect of his destiny. His action, *Karma* is the principal factor of his fall from grace. Second, the hierarchy between white men and black men has been ruptured. Third, coincidences or chance events also play a great role to bring changes in his thoughts and attitudes. Circumstances force Lurie to make amendments in his attitudes and lifestyles. Prof. Lurie has been portrayed as a round character in the novel and adjusts himself to changed situations. Finally, he appears as a profound, wise man, disgraced in the eyes of society, but he surpasses himself from the level of grace and disgrace and metamorphoses

into a philosopher. This essay tries to explore how Lurie undergoes these different phases of transformations and frees himself from the label of "disgraced."

Indulgence Phase

The novel's onset presents Lurie in a sexual relationship with a prostitute named Soraya, the term "Soraya" is used as a metaphor rather than a proper noun. The novel begins with a comment on Lurie's sexuality: "For a man of that age, fifty-two, divorced, he has, to his mind, solved the problem of sex rather well" (1). There is no difficulty understanding "sex" as one of the tropes by which Coetzee stakes his protagonist in the novel in the context of post-apartheid South Africa. As per the comment, Lurie seems to have solved sex only "to his mind" without a real sense of solution. The preliminary description of the novel depicts Lurie totally self-absorbed and routinely engaged in consulting women indiscriminately-from professional sex workers to his staff and student-to make the balance of his skull and temperament, "two hardest parts of his body" (2). For Lurie, sex is a drive that he finds difficult to resist. On Thursday afternoons, he has interludes with a professional sex worker, supplied to him by an agency called Discreet Escorts. For him, "In the desert of the week, Thursday has become an oasis

of *luxeeetvolupe*" (Disgrace 1). Similarly, "Without the Thursday interludes, the week is as featureless as a desert" (11). Without fulfilling his sexual desire, Lurie cannot balance "two hardest parts of his body".

Lurie thinks he has solved the problem of sex, yet sex remains a perpetual problem for him, and this unsolved problem makes him a predator. Marian Dekoven remarks, "In the absence of the sexual appeal around which he had constructed his erotic life, Lurie becomes a sexual predator" (850). Pamela Cooper agrees with Dekoven and adds, "Lurie finds his assumptions about sex as controllable and governed basically by the principles of the hunt" (23). Lurie's predatory errand begins when his routine work of sexual indulgence gets disconnected.

His longing makes him restless and he loses the balance of his "skull and temperament." Now the question is, why does sex become a kind of fetish for him? His background gives some clues to his obsession with sex:

His childhood was spent in a family of women. As mother, aunts, and sister fell away, they were replaced in due course by mistresses, wives, a daughter. The company of women made of him a lover of women, and to an extent a womanizer. With his height, good bones, olive skin,

and flowing hair, he could always count on a degree of magnetism. If he looked at a woman in a certain way, with a certain intent, she would return his look; he could rely on that. That was how he lived, for years for decades that was the backbone of his life. (7)

This description of Lurie's character and temperament shows that, to some extent, he seems to have been the product of his environment. Lurie's environment shaped a kind of character type that resulted in seeking a promiscuous relationship. The narrator adds explicitly, "He existed in an anxious flurry of promiscuity. He had affairs with the wives of colleagues, he picked up tourists in the bars on the waterfront or at the Club Italia, he slept with the whores" (7). These two descriptions from his personal history show Lurie as a virile predator, yet his background won't be sufficient enough to prove him right or wrong. There are specific instances in the novel in which Lurie indulges in sexual intercourse with professional sex workers, his staff, Dawn, and his student, Melanie Isaacs.

Soraya is a kind of metaphor for sex workers in *Disgrace*. Lurie meets Soraya regularly as clockwork on Thursday afternoon. He seems to be living in two worlds: the one the world of his job in the university and outside as a scholar and the

other, the world with Soraya at flat No.113 in Windsor Street. Soraya's public world is unknown to him, and their routine private world does not inquire about each other's shared world.

Lurie's public and private worlds don't come in confrontation as long as his routine works are undisturbed. He believes himself happy, but he has not forgotten the last chorus of *OedipusKing*: "Call no man happy until he is dead" (qtd in *Disgrace* 2). Lurie's life, in a sense, is balanced by self-evaluation or self-judgment, but this balance is threatened and, soon, Lurie begins to go along aberrant ways.

The balance of public and private worlds is endangered when he finds Soraya shopping in the market with her two little sons. Their personal and public lives collide; the bedmates of a flat at Windsor Mansions come face to face with each other at the undesirable place. The embarrassment caused by the unexpected encounter makes Soraya disappear from the gallery of Lurie's pleasure forever. Once again "the two hardest parts of his body" come into confrontation as he cannot continue his routine work. Self provoked to irritability and anxiety because of the loss of a quarry in stock, the predator sets out in search of another prey and spends an evening with a

woman, "another Soraya"(8) in a hotel room. Perplexed by his inability to make routine work intact, Lurie seeks other sexual partners indiscriminately.

In no time, Lurie comes in contact with Dawn, a new secretary in his university department. Lurie sleeps with her in their second meeting at his own house. Unfortunately, his act with Dawn becomes ineffectual even though she "works bucking and crawling in the forth of excitement" (9). This sexual failure gives a kind of shock, and Lurie begins to think differently.

A new vexation enters Lurie's mind and he suffers from another anxiety. At one point, he thinks "he ought to give up, retire from the game" (9) but later, he thinks retiring is not the elegant solution. Living an asexual life does not fall under his province. Though his failure gives Lurie a shock, he does not accept that he has become sexually inactive.

Once his potent masculine self comes into suspicion, he decides to examine his body and tries to find Soraya by telephoning her, but in vain. An unidentified woman chides him for harassing her at her own house. The telephone conversation has been compared with the vixen-predator relationship: "But then what should a predator expect when he intrudes into

the vixen's nest, into the home of her cubs" (10). After that, a new idea harbors in Lurie's mind and he makes a plan to seduce a dark girl, Melanie Isaacs, one of his students in his romantic course in the university.

Lurie seduces Melanie Isaacs very quickly in a short-lived affair. First, he invites her to his flat for a drink and tries to entice her with music, Italian food, and poetry. At the first meeting, he makes a desiring gaze at her; he almost says, "Stay, spend the night with me" (16). He misuses his education, position, and power to impress Melanie. He repeats Shakespeare's lines "From the fairest creature we desire increase, that beauty's rose might never die" (16). At the second meeting, Lurie takes her out for lunch, brings her back to his flat, and seduces her. This is their first sexual intercourse. Next, Lurie follows her to her flat and takes her in his grip without her consent at all. Melanie begs for her release: "No, not now! My cousin will be back" (25), but Lurie does not hear her. In his act, he feels as if he is having intercourse with "the apparition on the stage" (25). The third time, he sleeps with her in his own daughter's room and harasses her mentally, physically, and morally. Lurie's acts with Melanie make him fall into the abyss of moral degradation in the readers' eyes.

When we consider Lurie's sexual affairs with the prostitutes, they cannot be dragged under ethical/rational scrutiny because he pays them for the offers.

Though it may help make him a predator, his relationship with Dawn does not give any sense of ethical violence as it is based on two adult people's agreement. Of course, Lurie's affairs with Melanie make him a predator in the truest sense because his sexual acts with her are based on coercion. Melanie is his student, under his tutelage. Further, his relationship with her is no more than a predator-prey relationship because Lurie breaks the epistemic principle of sex, borrowing Cooper's words, "the aesthetic logic of sexual desire" (25). Sex is the matter of mind, body and heart. A nonconsensual sexual relationship is regarded as rape, a crime even if the partner is legal.

Lurie's sexual act with Melanie cannot be rationalized in any excuse. It is not accidental. It's preplanned and deliberately acted. Mike Marais supports this view saying "he posses her against her will" (76). In Anker's views, Lurie has violated the assumptions of conventional human rights by aggressively and coercively seducing her in a short-lived affair (236). Despite his being much senior in age and learning, Lurie exploits Melanie as a predator devours its prey, albeit in a different form.

Thus, beginning his sexual indulgence with a professional sex worker, Lurie comes in contact with his colleague and finally with his student. Lurie engenders a precarious situation for him because of his indiscriminate sexual affairs that result from his inability to control his desire. His sexual matters with Melanie become public after she lodges a formal complaint against him in the university and Lurie is dragged into defending his acts in public, where he denies giving the precise reason for his affair.

Denial Phase

Once the Lurie-Melanie affair becomes public, it is sensationalized by the media, and Lurie has to defend it step after step. Lurie does not disown his experiences with Melanie, but he refuses to confess it as an immoral act as he later tries to rationalize it as “rights of desire” (89). His attempts or excuses of escaping from people who come to talk to him, make him a stubborn or an obstinate person. As a violator, Lurie has to save himself from the individuals as well as the institutions.

First of all, Lurie faces Melanie’s revolting boyfriend, Ryan at the university premises. Ryan appears in front of Lurie, furious and vengeful. He threatens him: “And don’t think you can just walk into people’s lives and walk out again when it suits you” (30). Ryan’s warning cannot scare Lurie

and he simply tells him to go away. He does not think it worth explaining to this young man. His white arrogance does not allow him to give justification to a black man.

Afterward, Mr. Isaacs, Melanie’s father meets Lurie in the latter’s office at the university. Mr. Isaacs complains, “We put our children in the hands of you people because we think we can trust you. If we cannot trust the university, who can we trust” ? (38) Mr. Isaacs’ words sound like the throbs of an anguished heart and those words should create penetrating effects in Lurie’s heart too, but he seems untouched and unmoved as if the words were addressed to somebody else. Instead of giving any response of apology, Lurie stands tongue-tied, “the blood thudding in his ear” (38). Lurie just dismisses Mr. Isaacs and goes ahead saying he has “some business to attend” (38). Lurie tries to escape from the issue by ignoring Melanie’s father too.

Next, Lurie comes into confrontation with his ex-wife, Rosalind. She scolds him: “You are what fifty-two? Do you think a young girl finds any pleasure in going to bed with a man of that age” (44). Rosalind opines that the whole thing is disgraceful, “disgraceful and vulgar” (45). He just listens to her but does not give her any reply. All these informal dealings cannot

bring any sense of guilt or regret to Lurie. The time comes when he is forced to stand for his defense formally.

Finally, Lurie appears before the hearing committee in response to Melanie's formal complaints. He ignores the individuals one after another but he cannot do that with the formal authority of the university. He confesses the act before the committee, saying, "suffice it to say that Eros entered. After that, I was not the same" (52). He just tries to avoid it in excuse of Eros. When a woman in the hearing committee makes a cross-question, he clarifies, "I was not myself, I was no longer fifty-two-year-old divorce at a loose end. I became a servant of Eros" (52). Lurie tries to confuse the committee with the words like "Eros" and "ungovernable impulse". The hearing committee is convinced that being a teacher allows a person certain positions of power and Lurie has misused it. The committee concludes that David Lurie confesses his guilt that he could not resist an impulse but he does not mention the pain he has caused to the young woman. They decide it would be futile to ask Lurie to confess his guilt done to Melanie.

As Lurie comes out of the hearing room, a crowd of reporters surrounds him, and he feels like a strange beast circled by a group of hunters (56). However, he goes ahead, defying and dismissing the reporters. The

hearing committee chair's suggestion of writing a plea "in the spirit of repentance" (58), is dismissed by Lurie, as he thinks "repentance belongs to another world, to another world of discourse" (58). The hearing committee is formed in the spirit of the Truth and Reconciliation Committee (TRC), a committee formed in post-apartheid South Africa for amnesty purposes. Had he written a plea, he could have saved his job in the university, and he would not have been given severe punishment. Lurie does not do so, and as a result, he falls from academic grace that causes his dismissal from the job in the university.

Lurie falls from grace because of his inability to make a compromise with his ego. His ego is the product of apartheid South Africa, where, before the revolution, black people were subservient slaves of white people. Lurie is a white man whose mindset is the product of European enlightenment humanism. Being a white man, he thinks, he has got special privilege over the dark races in post-apartheid South Africa too. As Cooper suggests, "Lurie's seduction of Melanie is an attempt not only to reclaim sexual privilege but to emphasize the traditional patriarchal procedures of the European culture" (25). It must not be forgotten that both Soraya and Melanie are dark, and he does not hesitate to exploit them.

In addition to his crime, Lurie's vanity or hubris as a white man is responsible for his downfall and dismissal from the job. He does not come in reconciliation with the hearing committee simply because of his pride as a white man. It must not be forgotten that all the members of the hearing committee were black. Coetzee seems to be deliberately sparing Lurie for more severe pain and suffering that's why Lurie remains stubborn even at the cost of his livelihood. However, the iron wall of Lurie's determination begins to crack after his daughter Lucy is gang-raped by three black rapists. Then, Lurie comes to confrontation within himself.

Confrontation Phase

Trials and tribulations follow Lurie's arrival in Lucy's smallholding. Within a few days of his arrival, Lurie is incarcerated in the toilet, and three black people rape Lucy. Though he does not eyewitness the violation, he knows what happened with Lucy. He comes to confrontation within himself because he has not been able to save his daughter from the violation. The incident brings Lurie's past to the present, and he begins to be conscious of his acts with Melanie. Marias argues, "The gang rape of Lucy which serves as a structural parallel in the novel to Lurie's rape of Melanie, is the mechanism through which Coetzee

challenges his protagonist's assumption of autonomy and freedom" (76). Ironically, the incident of Lucy's rape occurs on the same day when Lurie tries to rationalize his acts on Melanie as "rights of desire." Earlier, he had talked to Lucy, "My case rests on the rights of desire, on the god who makes even the small birds quiver" (89). Lurie's explanation turns out to be ironic within a few hours when Lucy is gang-raped.

After Lucy's rape Lurie suffers from intrapersonal conflict, confrontation within his mind as the circumstances bring a reversal of the situation. In Dekoven's opinion, Coetzee purposefully sets up the situation of the rape to manifest fierce and unbearable irony (860). In the same way, Marais gives his judgment, "Lurie who knows what it is like to be a rapist, does not know what it is like to be a rape victim" (76). Coetzee puts his hero in a precarious juncture so that it could pave the way for his final transformation. Lurie confronts not only because of his daughter's rape but because Lucy does not want to follow his suggestions.

A wide rift can be seen between father and daughter from the very beginning. Lucy does not trust him as a fully reliable person. When Lurie is not ready to follow Lucy's suggestion before her rape, she calls him, "Mad, bad and dangerous to

know” (77). As Lucy refuses to discuss her victimization with him, Lurie suffers from a sense of isolation with his daughter. Being insisted on by her father, she replies, “David when people ask . . . you tell what happened to you, I tell what happened to me” (99). Lucy’s refusal makes Lurie restless and begins to daydream, which reveals the suffering of his heart.

Lurie has the symbolic vision of Lucy, “Come to me, save me!” (103). He imagines Lucy, a small trotting girl, desperate for his help. In Kimberly Segall’s assessment, “Following the rape of his daughter and the attack on himself, symbolic figures appear in Lurie’s dream reminding him of the past” (43). His past comes to the collision with the present making him aware of his limitations. As Segall evaluates, Lurie’s wild predatory errands in the past come to his mind in symbolic forms. The symbolic figure of an oppressed woman, according to Segall, becomes subtle propulsion for Lurie to consider the larger issues of female subjugation (44). As a father, Lurie confronts her refusal to describe or explain to him what happened and thinks that he has fallen from his parental duty to protect his daughter. Pamela Cooper argues, “Faced with an implied parallel between his sexual coercion of Melanie and Lucy’s violation, humiliated by his inability to help his daughter, Lurie feels

rebuked as a man, a father“(25). Lucy is supposed to be a lesbian and Lurie thinks raping a lesbian is worse than raping a virgin. From this incident onwards, Lurie has a traumatic experience from which he hardly recovers. Lurie’s former determination of sticking up to his idea slowly begins to erode and he goes deeper and deeper into the abyss of his conflicting thoughts.

For the first time in life, Lurie begins to feel weaker. Troubled by possible consequences of Lucy’s rape, the risk of pregnancy, or venereal infections like HIV, he thinks,” inside him, a vital organ has been bruised, abused” (107). Lucy has not even laid a charge with the police, which gives him a sense of injustice; the culprits can go free. Lucy wants to deal with this problem on her own accord without his help. Lurie’s heart aches when Lucy responds to him, “what happened to me is a purely private matter. In another place another time it might be held a public matter. At this time, it’s my business, mine alone” (112). Lucy’s words “another time” and “another place” make Lurie realize the ground of white people like him in post-apartheid South Africa. Lurie finds one of the therapists at a party at a neighboring house but he cannot take any action against him because Lucy intervenes: “Stop David, I don’t need to defend myself before you” (134).

Lurie, a white man and a father, cannot take action against a black offender, his own daughter's rapist. Lurie is agonized within him and thinks, "I have been the least protective of fathers" (140). Lurie's confrontation brings unbearable agony in his heart as a father. Can he do anything to soothe his anguish?

Lurie decides to give a decisive turn to his life after his experience with his daughter's rape. Ever since he left the university, he becomes dependent on Lucy for his food and shelter. Some engagement becomes imperative for Lurie even to lessen the pain caused by Lucy's rape. His desire to find a kind of anchor to hold on to and earn his bread himself pushes him to another phase of his life, where he realizes his limitations and ambition more closely than ever.

Realization Phase

Lurie knows he won't be able to find any scholarly job after his scandal with Melanie. He talks to Lucy earlier: "The scandal will follow me, sick to me. No, if I took a job, it would have to be as something obscure, as ledger clerk if they still have them or a kennel attendant" (88). As he guesses earlier, Lurie becomes a kennel attendant at Bev Shaw's Animal Welfare Clinic, where he volunteers her in euthanizing unwanted animals.

A professor of literature in an established university by vocation and an imaginative writer by creativity, Lurie becomes a menial worker in the clinic but does not feel any sense of humiliation, and hence he begins to know who he was and who he is. Bev Shaw assigns him the task of disposing the dead animals to the hospital incinerator. His work gives him a feeling of satisfaction in saving the animals from being disgraced. He thinks he "saves the honor of the corpses. There is no one else stupid enough to do" (146). In Dekoven's opinion, "Lurie's work with the dog becomes a pathway for his ethical and aesthetic rebirth" (862). Lurie thinks he has begun the life of a dog-man, a word once he used to call Petrus, Lucy's neighbor and a black man: "he has become a dog-man, a dog undertaker, a dog psychopomp; a *Harijan*" (146).

Lurie begins to get sympathy from the reader because he accepts the work willingly; neither has he felt detestation nor compares it with his earlier scholarly work in the university. Cris Danta observes, "Even if Lurie begins to redeem his public shame by treating abandoned dogs honorably in death, this real action does not yet open onto the possibility of personal grace" (732-33). Lurie begins to remake and reshape his disgraced image by his sympathetic treatment of the dead dogs, and he even strengthens

his attitude after he identifies himself in Lucy's position. In a sense, Lurie has a kind of meditative vision of his daughter being raped in her room. His work with dogs awakes him in the real world, and his vision of Lucy's rape makes him more self-reflective. Only after these experiences, Lurie begins to amend his former attitudes and views.

When Lurie is introduced to Bev Shaw for the first time before he begins the work of a dog-man, he unconsciously compares and contrasts her with the women he came in contact with earlier. He does not find anything exotic and erotic in her. Contrary to Bev Shaw, Melanie and Soraya were not only dark and young to be called his daughters; they were more exotic and erotic than her. In Lurie's perspective, Bev Shaw appears as, "... a dumpy, bustling, little woman with black freckles, close-cropped, wiry hair and no neck." (72). Earlier, non-exotic and non-erotic women were excluded from the gallery of their sexuality. He never thought of Melanie and Soraya beyond erotic sexual objects. But circumstances bring Lurie to a situation when he sees them from a different perspective. According to Dekoven, "Lurie comes through excruciating experience to be able to see de-exoticized and de-eroticized new order" (853). A new realization occurs in Lurie's mind that there are other

perspectives from which a woman can be judged.

Lurie's sexuality takes a new turn from the moment he sleeps with Bev Shaw in her animal operating room. Coetzee deliberately chooses the operating room to give a new turn to Lurie's sexuality. Cooper's observation seems reasonable: "By having sex in the operating room where she destroys animals Lurie seals his movement from desire to dissolution" (36). In a sense, Bev Shaw, an unattractive woman, seduces Lurie and brings his white-nonwhite sexual relationship to a white-white one. After the act, Lurie accepts this promiscuous relationship as purely private matter and stops calling Bev Shaw "poor." He thinks, "If she is poor, he is bankrupt" (150). Lurie's predatory life is narrowed, and his sexual relationship is confined only with Bev Shaw. Lurie no longer remains a predator. To correct his mistakes made earlier, Lurie undertakes two missions.

Lurie's first mission is designed as a repentance mission to the Isaacs' house and the second one is a journey to Cape Town, to his former university and residence. Lurie identifies himself with Mr. Isaacs as both of them now are the fathers of victimized daughters. The realization of the effects of his rape on Melanie and her family does not come

to him earlier. Marais rightly signals, “he is discovering the effect of his rape of Melanie on her family because he now finds himself in their position” (76). Lurie denied speaking anything to Mr. Isaacs at the university only a few weeks earlier but the same person goes to Isaacs’ house with the spirit of repentance. A person, who refused to say sorry to Mr. Isaacs earlier, asks him for forgiveness by touching his head to the floor. A dramatic shift occurs in Lurie’s thinking. He understands the irony of his fate well because “he is inescapably implicated to both as the perpetrator and as a victim” (Randall 216). The Isaacs family’s generosity and forgiveness overwhelm him. He does not know how to respond to the words of Mr. Isaacs over the telephone, “I am phoning to wish you strength for the future” (173). After the interaction with the Isaacs, Lurie feels as if he has dropped some heavy load from his heart. Buoyed by the ideal response of the Isaacs family, Lurie sets out for Cape Town, determined to correct the course, “to close out his old life for good” (Dekoven 867).

In Cape Town, Lurie’s house is vandalized and a young scholar occupies his office in the university. The changes in his home and his university signal the end of his scholarly lifestyle. However, the speed of Lurie’s transformation accelerates after he witnesses Melanie’s performance in a

comedy show, where he is surprised by the wit and vitality in her acting. He no longer sees her as an exoticized and eroticized sexual object. Lurie makes a kind of review of his contacts with women in his life. The word “enriched”, which he used while talking to the reporters, reverberates in his mind with new meaning, and he begins to feel enriched, “*Enriched*: that was the word the newspapers picked on to jeer at. A stupid word to let slip, under the circumstances, yet now, at this moment, he would stand by it”(192). He thinks as if a vision has come in his mind; he fell into the abyss of disgrace because of women, but he seems to be climbing the lofty mountain of wisdom. He develops a broader view of life and death; nothing seems to be troubling him. Ryan, Melanie’s boyfriend warns him that Melanie would spit in his eye (194), but he does not react against such a verbal attack; instead, he feels these things are “the shock of existence”. He thinks, “He must learn to take them more lightly. Why not, on this night of revelations” (194). True to his words, Lurie realizes that he has a series of revelations. The revelations bring complete changes in his attitude towards black people, animals, creative writing, and women.

Through his traumatic experience concerning Lucy’s rape, Lurie understands the place of white people like him in

post-apartheid South Africa. Lucy calls the gang of three men “rapists cum tax-gatherers, roaming the area attacking women indulging their violent pleasure” (199). He understands why Lucy made that statement earlier. She had said, “That is the price one has to pay for staying on” (158). Moreover, he changes his attitude towards Petrus. Earlier Lurie knew him as a subservient black laborer, Lucy’s gardener, and dog man. He comes to identify Petrus as the descent of African land, not an object of subjugation. The ghost of Eurocentric colonialist subject position no longer haunts his mind. As a result, he does not react strongly when Lucy decides to become Petrus’s third wife. Lucy tells him that she should start at ground level. She adds, “With nothing. No cards, no weapons, no property, no rights, no dignity” (205). Lurie does not question her but agrees with her saying “Like a dog” to which she echoes him “Yes, like a dog” (205). Lurie understands that he has to make an inevitable compromise with black people and his mind to stay in South Africa.

As a creative writer, Lurie writes a chamber opera on Byron in Italy with his mistress Teresa Guiccioli in the center. Lurie cannot go ahead with the earlier version. His earlier vision cannot be rendered in writing the opera. Lurie’s intellectual stagnation has been

commented on in the novel: “The project has failed to engage the core him. There is something misconceived about it, something that does not come from the heart” (181). Lurie cannot go ahead with the original plan, and he changes the track in a completely new way. It seems a heavy shift has occurred in his creative faculty, and his perspective comes to complete transformation after he tries a new track.

In the new track, Lurie picks Teresa in the middle age abandoning the pages of notes he has written. Teresa is living with her father, and Byron is long dead. Dekoven comments on this changed track, “Byron long-dead suggest the death of Lurie’s disastrous Byronic persona” (869). In the same spirit, Marais puts in, “It is no longer about the predatory Byron and his young Teresa but Teresa in the middle age after the death of Byron” (77). As these two essayists suggest, Coetzee wants to chastise his protagonist by making him cast off his predatory self. Neither there is a predatory self nor predatory perspective in his creativity. Lurie’s creative vision does not take the final shape before the night of “revelation”. Lurie wants to change not only the characters but also the music of the opera.

The piano music was chosen for the earlier version of the opera, so it does not suit the new version because the piano is a

Eurocentric instrument. Lurie finds Lucy's seven-stringed toy piano in the pile of old things and writes music for Teresa. With this new vision, he leaves Cape Town, and the final version of the opera is completed in the Animal Welfare Clinic yard.

Lurie's attitude begins to change after he starts working with Bev Shaw. A man who once saw women as eroticized and exoticized objects realizes that they too have their own identity. His phallic attitude towards women transforms. Once the servant of Eros, Lurie has finally got a new realization of women, as Dokoven remarks, women no longer remain in his "masculine prerogative, always to act upon his desire" (869). His new realization sees women in their work: Bev Shaw in animal euthanasia, Lucy in her farm and Melanie in African comedy. Lurie's attitudes mainly in four areas prepare a ground for his final reconciliation, a prophet's phase.

Reconciliation Phase

Lurie returns from Cape Town with newfound zeal and enthusiasm, ready to face the world from a different perspective. He stays alone renting a stuffy room; separates himself from Lucy to lead an independent life. It is in the animal refugee yard, where the final version of the opera takes the complete shape. Though there was no idea of a dog in the original version, Lurie includes a crippled

dog in it. Lurie argues, "Why not? Surely in a work that will never be performed, all things are permitted" (215). After all the opera is not going to please anybody, neither the publisher nor the audience. Lurie no longer remains an ambitious writer to produce a best seller book. In Dekoven's observation, "He becomes proficient at his art, an art which is now crucially gratuitous, far-free, purged of egotism" (871). He does not want to write like a phrasemonger but he wants to write to satisfy himself.

David Lurie, who began the life of a predator, acted upon the impulse of Eros and tried to rationalize his acts as rights of desire at one stage of life finally metamorphoses himself into a profound person, a proficient worker, and artist. A middle-aged person, for whom, once, sex was a problem, no longer finds sex a problem at all. His sexual affairs narrow down from the moment he slept with Bev Shaw but finally, as Coetzee signals, he dismisses Bev Shaw too from the realm of his sex. Earlier, he excluded Bev Shaw from the gallery of his sexuality because she was not "attractive", but later he seems to have liberated himself from sexual pleasure as such. After returning from Cape Town, "They embrace like tentative strangers. Hard to believe once they lay naked in each other's arms" (209). Finally, "two hardest parts of his body:

The skull followed by the temperament” come under control. His body is no longer his enemy and there is no necessity of “exercising himself on the body of a woman” (9). Instead of thinking about sex, he “concentrates all his attentions on the animals they are killing. . .” (219). The animals, in a sense, provide him energy to live.

Lurie’s activities are confined within the periphery of the clinic, hospital incinerator, and Lucy’s farm. When he is free of his work with the dogs, he visits Lucy, working like a peasant on the farm. Contrary to his earlier attitudes, he comes to love people working on the farm. He sees Lucy’s future in South Africa in the role of a good mother, though he could not become a good father.

Lurie becomes impartial towards worldly desires and pleasures, and so he develops an entirely disinterested outlook. His disinterested perspective is reflected while euthanizing a crippled dog. A dog with a withered hind quarter is loved by Lurie more than other dogs. Bev Shaw believes that he would spare the dog, wouldn’t bring it to the table but, on the contrary, the dog is submitted to the needle. Being surprised, Bev Shaw asks, “Are you giving him up?” to which, he replies, “Yes, I am giving up” (220). Commenting on Lurie’s sacrifice of the last dog, Marias argues

“Lurie must give up the dog because it is in the dog’s interest that he does so. His own needs, desires, feelings, predilections and predispositions are immaterial” (78). Lurie has realized that his life hereafter is the life of sacrifice and so he selflessly sacrifices the crippled dog he loves.

So the roles of David Lurie really seem enigmatic. As a man of Eros, engaged in seducing women indiscriminately, he faces critical situations one after another, loses his job, grace, and personal security. A white man, who enjoyed hierarchical prerogatives in South Africa, becomes a simple dogman. Despite his engagement with the works of a dogman, he does not feel any sense of humiliation, for he comes to the stage of reconciliation when all kinds of hierarchies are blurred. He reaches the stage of sublimity, the stage of wisdom and above all the stage of a prophet, a sage or a philosopher. As Sew Kossew points out, his transformation occurs “not through grand revelation but through attending everyday needs of the disparate dogs” (161), Lurie becomes a self-learned person, a philosopher through his vicissitudes of life. In the end he renounces everything except his works with the dying dogs. He learns the limitations of being a white man in South Africa from his experience with his daughter’s rape case; he knows the *power* (my emphasis) of male sexuality

from his experience with Bev Shaw and he learns the meaning of his arrogance over animals from his experience with the dying dogs. He is metamorphosed into a wise and profound person, a philosopher and he is ready to spend the rest of his life in South Africa, as Lucy says, "like a dog" beyond the level of material happiness.

Works Cited

Anker, Elizabeth S. "Human Rights, Social Justice and J.M. Coetzee's *Disgrace*."

Modern Fiction Studies, vol. 54, no. 2, summer 2008, pp. 233-267. *Project MUSE*, doi:10.1353/mfs.0.0020

Coetzee, J.M. *Disgrace*. Vintage Books, 1999.

Cooper, Pamela. "Metamorphosis and Sexuality: Reading the Strange Passions in *Disgrace*." *Research in African Literature*, vol. 36, no. 4, summer 2005, Pp. 22-39. *Project MUSE*, doi:10.1353/ral. 2005. 0160

Danta, Chris. "Like a Dog . . . Like a Lamb: Becoming Sacrificial Animal in Kafka and Coetzee." *New Literary History*, no. 38, vol. 4, autumn 2007, Pp. 21-737. JSTOR, www.jstor.org/stable/20058036

Dekoven, Marianne. "Going to the Dogs in *Disgrace*." *EHL*, vol. 76, no 4, Winter 2009, Pp. 847-875. JSTOR, www.jstor.org/stable/27762965

Marais, Mike. "J. M. Coetzee's *Disgrace* and the Task of Imagination." *Journal of Modern Literature* vol. 29, no. 2, winter 2006, Pp. 75-93. JSTOR, www.jstor.org/stable/3831793

Randall, Don. "The Community of Sentient Beings: J. M. Coetzee's Ecology in *Disgrace* and Elizabeth Costello." *English Studies in Canada*, vol. 33, no. 1, March/June 2007, Pp. 209-225. DOI: 10.1353/esc.0.0054.

Segall, Kimberly Wedeven. "Pursuing Ghosts: The Traumatic Sublime in J. M.

Coetzee's *Disgrace*." *Research in African Literature*, vol. 36, no. 4, Winter 2005, Pp. 40-54. DOI: 10.1353/ral.2005.0175

Sew, Kossew. "The Politics of Shame and Redemption in J.M. Coetzee's *Disgrace*." *Research in African Literature*, vol. 34, no. 2, summer 2003, Pp. 155-162 JSTOR, www.jstor.org/stable/4618299



Teachers' and Learners' Perception of Feedback Strategies in Classroom Teaching

Mahadi Hasan Bappy

Abstract

Assessing students and giving them feedback are usual academic practices. This statement is same for the students while responding to the provided feedback by the teachers. In teaching and learning, feedback refers to the corrective response given by the teacher, either written or oral, to any task of the learners to improve the skill and quality of learning. In Bangladesh, teachers and students are found in confusing perceptions regarding the process, amount, and importance of giving feedback in the classroom to improve the quality of learning. This qualitative research attempts to reveal teachers' and students' perceptions of the practice of feedback strategy to improve students' learning. Findings from the interviews and FGDs with 8 students and 4 teachers from the undergraduate level shows that all the respondent teachers and students possess positive perceptions regarding the importance of feedback strategies for improving students' learning. It also reveals that factors like time limitation of the session, inappropriate institutional and curriculum setting, irregularity of students, and the unwillingness of both teacher and learners are causing challenges to the successful feedback practice in the classroom. Therefore, regular practice of non-judgmental, descriptive, online, specific, adequate, and interactive feedback strategy is recommended in this study to improve students' learning experience. The curriculum and institutional authority should take the necessary steps to start regular feedback practice in learning both inside and outside the classroom.

Mahadi Hasan Bappy

Lecturer

Department of Economics
Government Brajalal College

Khulna

e-mail : bappyku@yahoo.com

Keywords

Perception, Feedback Strategies, Student, Teacher, Learning

Introduction

Preamble: Students and teachers are the major constituents in the classroom environment. Interaction between these two participants determines the volume of successful learning. Of all the forms of interactions among teachers and students in the classroom, feedback is one of the most effective tools to measure positive learning outcome¹. According to Thorsteinsen², feedback refers to the reply given to the person who is in the learning process where the receiving a person of the response performing a task, either written or orally, intended to improve his skill, and ability in learning. Askew³ defines feedback as the judgment about performing another as written, oral, or through any other assessment process.

To be effective, research by Kluger & DeNisi⁴ found the importance of feedback to be appropriate for students' proficiency, timely and formative. Awareness of teachers is not the only responsible factor to use feedback as a successful learning tool. The quality of feedback as learning equipment largely depends on the efficiency of the learners and their belief in the feedback as a useful element of their learning. Besides, it is also the responsibility of the teacher to use understandable and suitable feedback for a certain level of students for ensuring a quality learning environment. It is

essential to overcome all forms of the distance among teachers and students in terms of the way of giving feedback and the words used for feedback in the classroom. For this reason, it is important to determine the type of feedback that students accept as important and re-align the study according to it, use it for the improvement of their learning quality.

In Bangladesh, teachers and students are found at different standing for feedback practice in the classroom. Both of them are in some confusion about the significance of the practice of providing feedback in the classroom. So, it is important to have an in-depth study to understand the teachers' and learners' views on feedback practice in Bangladesh. This study intends to reveal the actual perception of both teachers and students about the feedback practice in the classroom of undergraduate level in Bangladesh.

Statement of the Problem: Feedback seems to be an essential strategy of learning experience and the value of feedback on learning has already been established through a number of researches⁵. Feedback is not exactly assessment; rather, it is an important element in transforming assessment into a successful instrument for future learning⁶.

Feedback has largely two major categories such as written feedback and corrective

feedback⁷ which are having some basic components specific to the classroom. Erkillä⁸ mentioned two categories of feedback, which are formative and summative; where formative feedback is given during the process of preparation of the lesson, the summative feedback is given at the end of the lesson preparation through grading or summative comments. The primary goal of giving both formative and summative is to provide feedback either for instant work or for continuous tasks by the learners.⁵

A research project by Burnett⁹ defined various types of feedback practice in the classroom. They are non-targeted feedback, e.g., excellent, that's great, well done; negative feedback, e.g., not good, untidy work, effort feedback; e.g., you are working well on your task, correct this thing of your task; and ability feedback, e.g., you are superb at this section of your task. A study by Bitcher et. al¹⁰ also found two types of feedback named direct, or explicit feedback, and indirect feedback strategy. Direct feedback happens when the teacher diagnoses the error and gives feedback as a correction. While indirect feedback strategy occurs when the teacher identifies an error made by the learner in the task but not provides any correction, rather leaving and showing the student to diagnose and correct it by themselves. Findings from survey¹¹ revealed that both

students and teachers have a preference for direct or explicit feedback rather than implicit feedback practice. While a study by Rowe and Wood¹² found students realize the importance of feedback and correct and improve their lesson, but are confused about the expectation by the teacher from their tasks exactly. Meanwhile, Masson¹³ found a wide range of responses pointing out that students prefer feedbacks beneficial to their learning which is not similar to what the teachers offering to them.

According to an analysis¹⁴, effective feedback should be given with sufficient time to correct the task and complete instruction for the student to fulfill the goal of the lesson. Therefore, based on the feedback strategies, Nicol and Macfarlane-Dick¹⁵ pointed out that good feedback practice should have the following seven basic principles; First, feedback should facilitate the improvement of self-assessment in learning. Second, feedback should have encouragement for teachers and learners around learning. Third, feedback should assist to clarify the goals, criteria, and standards of excellent performance. Fourth, feedback should have opportunities to reduce the space between the desired and current performance. Fifth, feedback should provide quality information to the learners about their learning outcomes.

Sixth, feedback should enhance the self-esteem and motivational beliefs of the students. Lastly, feedback should help the teachers to shape the teaching by providing information. To get a positive perception of both teachers and students about feedback as well as to get a positive learning environment in the classroom through good feedback practice, these strategies can be helpful. For these reasons, it is very important to understand teachers' and students' perceptions on feedback practice in the classroom for an improved learning environment.

The Rationale of the Study: Studies show significant differences in the perception of learners and teachers about the feedback strategies in the classroom.⁴ The research based on students' perceptions of feedback strategy lacks in number compared to the research based on teachers' belief in feedback.¹² Meanwhile, the study by Burnett and Mandel¹⁶ found a significant difference in the perception of teachers and learners about the different feedback strategies. Researchers' cognizance of feedback practice has come out with increasing awareness in teachers' feedback practice in the classroom, as well as learners' perception and reactions of teachers' feedback in specific classroom context¹⁷. Bashir et. al¹⁸ in their study threw light on improving the feedback process in higher

studies where they found a significant effect of feedback in personalizing teaching in the higher education level. They have also found teachers' unwillingness of giving significant feedback and students' dissatisfaction over the traditional feedback given by the teachers in the classroom.

In Bangladesh, because of a lot of inconvenience in the academic structure, the learning environment in the classroom is often found unfavorable for both the teachers and students. Teachers are found reluctant to give any formal feedback to the students in the classroom rather, they are anyhow trying to complete the syllabus in time. This scenario is very common at the undergraduate level where the teachers have to complete a vast syllabus within a fixed time and the students focus on crossing the hurdle of examination and obtain a certificate rather than having quality learning. Feedback does not matter or have any significance to any of these two sides engaged in the learning process. However, in some classes of the undergraduate level of Bangladesh, teachers and students are trying to start a feedback strategy in the classroom where the teacher gives oral and informal feedback to the students. Systematic and formal feedback techniques are practiced on a tiny scale at the undergraduate level. Meanwhile, from the observations

and previous experience at my college, it is found that a few teachers use some types of feedback here, but most of them are insensitive to its significance in the classroom. Inconsistent with the previous studies, students and teachers have different perceptions about the strategy and the amount of feedback provided in the classroom by the teacher. They have some different thinking about the success and effectiveness of providing feedback in the classroom as well. In Bangladesh, research about perception on feedback strategy still lacks in number. Therefore, this study will find out the teachers' and learners' perception of feedback strategy in the classroom for students learning in Bangladesh.

Research Questions: This study is intended to find out the answer to some specific research questions;

1. What is the preferred feedback strategy by the teachers and students in the classroom?
2. To what extent are feedback strategies important for student's learning?
3. What should be the ways to improve the feedback practices in the classroom?

Answering the above-mentioned research questions will reveal teachers' and students' preferences regarding their

choice and the extent of the importance of the feedback practice in the classroom to have a quality educational environment. Finally, the answers will disclose the recommendations regarding the practice of feedback strategy from the viewpoint of teachers, students, and the researcher.

Methodology

To conduct this Qualitative Research, the following methodological procedure is maintained :

Site of the study: Carrying out this research in Bangladesh, my working college is selected as the site of research. In this college, undergraduate students are studying¹⁹ in different subjects. It was convenient and trouble-free to collect primary data from my student and colleagues at my workplace during office days.

Sampling: A sample of 8 students is purposively selected from 1st year to 4th year (two from each year) of the undergraduate level in my department. Besides the students, 4 teachers were also selected purposively from this college as the respondents of this study.

Data Collection Methods: The procedure of Semi-structured interview schedule and Focus Group Discussion (FGD) were used for collecting data for this study. All the selected students took part in separate

interviews and FGD as a whole about their perception of feedback strategy. The selected four teachers were also invited to take part only in a focused group discussion about the matter. Peterson and McClay¹⁹ used these instruments of data collection for their study on assessing feedback. A study by Masson¹³ was also found using a semi-structured interview schedule to reveal student's perceptions about feedback. In this research, the same set of semi-structured questions was used in both case of individual interviews and FGD with students to get more complete, in-depth, and cross-checked information with each other about their responses to the research questions.

To maintain the research ethics related to this study, an information letter and acknowledgement form were provided to the teachers and the students over 18 years, permission was taken from both the college principal and the students themselves.

Data Analysis Techniques: Collected data were analyzed to design qualitative research. Information froms, the recorded interviews and focused group discussions were summarized and briefly explained under each interview question. The result from the analysis is presented according to the response from the interviews and FGDs in table. It presents what is the preferred feedback strategy by the

teachers and students. It also reveals the opinion of the teachers and students about the significance and improvement of feedback practice.

Findings and Discussion

The following part of this study presents the overview of the responses from students and teachers about their perception of feedback strategy. All the in-depth interviews and focus group discussions are rearranged and briefly presented here.

Teachers' Perception

In this section, teachers' responses on their perception revealed during interviews are presented in the following table, under some broad categories.

Table 1: Teachers' Perception on Feedback Strategies

Category	Response/Perception
Preferred feedback strategy	<ul style="list-style-type: none">- Giving written feedback may consume a lot of time and effort. Teachers are not also interested in online feedback through email or other virtual communication system.- Most of the teachers prefer oral feedback during class time and written feedback only after the completion of the syllabus in the form of grading or result.

<p>Perception on importance of feedback for improving students' learning</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Almost all the respondents are agreed that feedback focuses on the most vital aspects of learning that can help and improve students' learning. - Few teachers do not notice much progress in the students' skills through feedback, hence are reluctant to and not considering regular feedback very effective for improving learning quality. 	<p>Students interest and understanding on given feedback</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Though feedback is crucial for improving skills and learning, sometimes the students do not understand that feedback helps to improve their quality of learning, and ignorant about what to do with the given feedbacks. - Most of the students show no respect or interest in the feedback given to their task hence, do not plan to develop their skill when the feedback is provided. - Some students want feedback and start arguing if they are not provided any significant feedback to their tasks during the lesson.
<p>Considerations on time and content for giving feedback</p>	<ul style="list-style-type: none"> - One of the respondents provide regular feedback during the lesson preparation. - Most of the teachers do not give feedback until the students ask any question to them. - Summative feedback in the form of final assessment result is the common practice of feedback giving among them. - Most often teachers face inadequate skill to give effective feedback to the students. 		

(Source: Data collected from interviews and FGD)

Students' Perception : In this section, students' responses on their perception revealed during interviews and FGDs is presented in the following table, under some broad categories.

Table 2: Students’ Perception on Feedback Strategies

Category	Response/Perception
Preferred feedback strategy	<ul style="list-style-type: none"> - Almost all the interviewed students confirmed that written feedback in a specific and understandable form about their regular class work can definitely improve their classroom learning environment. - In the current age of internet, students are interested in getting online based e-feedback from their teachers to improve their learning outside the classroom as well.
Perception on importance of feedback for improving learning quality	<ul style="list-style-type: none"> - All the students in this study seem to be positive about feedback in classroom learning and thought that feedback develops their learning skills. - Since the students are made conscious about the learning, feedback motivates them on the need of improving their tasks. - Every time the teachers give feedback on their task found constructives, and helpful to learn and self-development.

Teachers’ attitude towards providing effective feedback	<ul style="list-style-type: none"> - Asking for feedback is not welcomed by most of their teachers, and spending time for giving feedback in the classroom is considered the waste of class hours. - Some of the feedbacks provided by the teachers seem positive, constructive and in right amount and words. But, most of feedbacks are found too much confusing and overwhelming by the students. - A large numbers of teachers in this college are reluctant to give any significant feedback to the students. Hence, they depend on just a one way learning method where listening to the lectures in the classroom is the only way of learning.
Evaluation and understanding on given feedback	<ul style="list-style-type: none"> - Most of the time, common, in general and non-targeted feedback is provided by the teacher in the classroom, which is not proved to be effective because it is not directly connected to any special task or completion to the task to any individual student.

	<ul style="list-style-type: none"> - Written feedback is provided on every course when the syllabus is over and a written test is taken. Though this types of feedback helps them to avoid mistakes in the future but has found little impact on the improvement during the learning process. - In the present summative feedback system, the preparation process of the lesson is not taken under consideration which does not mean much for the students for the current learning.
--	--

providing feedback in the classroom fosters positive motivation and self-esteem. It can also provide scaffolding to support achieving the students' desired aim of the study. Third, feedback can help students understand what is called outstanding performance. It provides information to the learners about their learning. Fourth, feedback provides opportunities to reduce the gap between teachers' expectations and students' delivery. Hence, sometimes it shows to the teacher about understanding the knowledge level of students in the class as well. Finally, feedback can play a dual role in learning. It can enhance teachers' teaching quality, as well as creating responsive learners.

(Source: Data collected from interviews and FGDs)

Importance of feedback practice in the classroom: This section is going to present some basic importance of providing feedback in the classroom, which is mentioned by both the teachers and students during data collection. Perception about the importance of feedback practice in the classroom in Bangladesh is discussed below:

First, feedback provides the information of the teacher's expectation from the task of the student. It facilitates and simplifies student's improvement process of self-assessment of their learning. Second,

Challenges to successful feedback practice in the classroom: In an undergraduate study in Bangladesh, feedback giving practice in the classroom to improve learning quality often faces a lot of challenges from different perspectives. The challenges to successful feedback practice, according to the teachers and students, are presented below;

Time limitation of the session is one of the most significant challenges to a successful feedback strategy. In Bangladesh, the enormous size of the class is another hindrance to provide effective feedback. Besides, students are very often found

unwilling to get and respond to the feedback provided by the teacher, which makes the feedback process less effective.

Moreover, the irregularity and absence of the students make the teachers uninterested in giving any feedback to them. Students often receive the corrective comments in given feedback negatively and show reluctance to ask for any kind of feedback in learning from the teacher. In Bangladesh, the national curriculum is not supportive to go with modern feedback strategies in the classroom.

Again, inappropriate institutional structure and lack of supporting attitude from the higher authority is one of the biggest challenges to effective feedback practice in Bangladesh. Lack of understanding and communication between teachers and students is another challenge of feedback strategy. Insufficient learning equipment may also cause a challenge to feedback practice in the classroom.

Discussion on the findings: Giving feedback in the classroom has been proven to improve student's outcomes and increase learning for them.¹⁸ Feedback can guide the learners smoothly towards the objectives of the lesson if it is given correctly. It usually sends a message to the students that the teacher has a concern about their learning, which allows the students to become more involved and

engaged in the classroom. According to Mcfadzien,⁶ feedback practices are especially influenced by teachers' views and perception of what makes up good teaching practice within the local context and the broader context of education and learning environment.

Transforming the findings from the responses of interviewed teachers and learners perceptions on feedback into the discussion, this study has got the following basic answers to the research questions :

First, the teachers do not think they are giving sufficient feedback in the classroom, mainly due to lack of time. Teachers are mainly involved really in error correction rather than giving effective feedback. They are reluctant to feedback mostly because of the student's unwillingness and negligence of using the provided feedback effectively.

Second, all the teachers and students are willing to have a quality learning environment in the classroom. In this process, they are interested in starting significant feedback techniques in the learning process. Besides, the respondents believe that positive feedback is essential, and it gives the learners encouragement and motivation towards learning objectives.

Finally, oral feedback and discussion along with the written one both online and offline make the learning more effective. Both should be used in the classroom but in a synchronized way and relating to the lessons.

Findings also suggest that some factors should be kept in mind at the time of providing feedback in the classroom. Careful attention should be given to the type and process of the feedback given by the teacher in the classroom. While providing feedback for various types of students, different strategies may need to be taken. In this study, it might be suggested that the teacher should provide more specific, targeted, and significant feedback in the classroom to make a comfortable learning environment. The students should also be more attentive, regular, and interactive in the classroom to respond to the provided feedback by the teacher. Finally, both the learners and the teachers should remain positive towards feedback strategy to achieve the desired goal of the lesson and to ensure a successful learning environment.

Recommendations and Conclusion

Recommendation for significant feedback practice in the classroom: From the findings of all the interviews and focused group discussion with teachers' and learners' about their perception on

feedback strategy we can summarize the desired characteristics of significant feedback recommended by both the teachers and students of undergraduate level in my college in the following way:

Feedback should point the key issues of the lesson under consideration, guiding the students and teacher towards the goal of the lesson. Feedback should be placed in adequate time and amount as well.

An interactive feedback strategy should also be incorporated as a part of this practice to ensure the best quality of learning environment in the classroom. Learners should not be humiliated by the critical corrections given through the feedback process by the teacher.

An online e-feedback giving system should be introduced to get most outcomes from feedback practice both in the classroom and outside the classroom.

Feedback should be given both individually and collectively to have a better result. During presentation, the content of the feedback should be focused clearly and specifically. It should be delivered in various modes like written, oral, visual, or demonstration, so that it can not be monotonous.

A descriptive and rightly directed feedback is preferable to the learners for going with the instruction of the teacher.

Besides, students should be regular in the classes to get a better result from the feedback from the teacher.

A non-judgmental, supportive, and positive approach to feedback should always be conveyed by the teacher. To do so, both the class-size and class-hour should be adequate and appropriate to practice effective feedback in the classroom.

The principle of practicing feedback in the classroom regularly should be included in the national curriculum and strictly be followed. Preparing rubrics of feedback can be a successful approach to giving significant feedback.

Concluding Remarks: In conclusion, it can be said that the absence of feedback hampers the effective learning process for the learners in the long run at every stage of education. The initial result of this study shows that there is a variation in perception among teachers and students prospect of feedback strategy. Nowadays, quality education is the major requirement in education sector and it has added a new challenge to both teachers and students. So, the teachers, learners, and the authority engaged in to education also must transform themselves to meet new trends of learning. Through several effective steps of improvement, teachers can provide significant feedback

to improve the learning environment for each type of learner who enters the classroom. Cooperation from the learners is also required to make the feedback practice successful. To get long-term sustainable learning for the students, a significant feedback strategy should be implemented by the concerned authority in education. Further investigation and in-depth research are needed immediately to start an effective feedback process in the classroom for all sectors of education in Bangladesh.

References

1. Hattie, J., *Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-analyses Relating to Achievement*, New York: Routledge, 2009
2. Thorsteinsen, L., *An Interview Study of the Usage of Written Feedback in English Education, The Students' and the Teachers' Points of View*, English Thesis, 2010
3. Askew, S., *Feedback for Learning*, Florence, KY, USA: Routledge, 2000
4. Kluger, A. N., & DeNisi, A., The effects of feedback Interventions on Performance: a Historical Review, a Meta-analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory, *Psychological Bullentin*. 119(2), 1996, Pp. 254-284
5. Carless, D., Differing Perceptions in the Feedback Process, *Studies in Higher Education*, 31(2), 2006, Pp. 219-233

6. Mcfadzien, N., Why is Effective Feedback So Critical in Teaching and Learning, *Journal on Initial Teaching Inquiry*, Vol. 1, 2015
7. Anderson, C. J., A synthesis of SLA and General Education Feedback Research: a working paper, *Kyushu Sangyo University Language Education and Research Center Journal*, 6, 2011, Pp. 59-68
8. Erkkila, M., Teachers Written Feedback: Teachers' Perception of Giving Feedback, Thesis Paper, Department of Language, University of Jyväskylä, 2013
9. Burnett, P. C., Elementary Students' Preferences for Teacher Praise, *Journal of Classroom Interaction*, 36 (1), 2001, Pp. 16-23
10. Bitchener, J., Young, S. & Cameron, D., The Effect of Different Types of Corrective Feedback on ESL Student Writing, *Journal of Second Language Writing*, 14, 2005, Pp. 191-205
11. Ferris, D. R., & Roberts, B., Error Feedback in L2 Writing Classes: How Explicit Does it Need to be, *Journal of Second Language Writing*, 10, 2001, Pp. 161-184
12. Rowe, A. D., & Wood, L. N., Student Perceptions and Preferences for Feedback, *Asian Social Science*, 4(3), 2008, Pp. 78-88
13. Masson, M., Collecting Students Perceptions of Feedback Through Interviews, *Proceedings of The 16th Conference of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics*, 2011
14. CIRT, Effective Feedback in the Classroom, Center for Innovation in Research and Teaching, Web Page, 2019, Retrieved in 25.10.2019
15. Nicol, D. & Macfarlane, D., Rethinking Formative Assessment in HE: A Theoretical Model and Seven Principles of Good Feedback Practice, *IEEE Personal Communications*, IEEE Pers. Commun. 31, 2004
16. Burnett, P. & Mandel, V., Praise and Feedback in the Primary Classroom: Teachers' and Students' Perspectives, *Australian Journal of Educational & Developmental Psychology*. Vol 10, 2010, Pp. 145-154
17. Lee, I., Feedback in Writing: Issues and Challenges, Editorial, *Assessing Writing*, Science Direct 19, 2014, Pp. 1-5
18. Bashir, M. M. A., Kabir, M. R. & Rahman, I., The Value and Effectiveness of Feedback in Improving Students' Learning and Professionalizing Teaching in Higher Education, *Journal of Education and Practice*, Vol.7, No.16, 2016, Pp. 38-41
19. Peterson, S. S. & McClay, J., Assessing and Providing Feedback for Student Writing in Canadian Classroom, *Assessing Writing*, 15, Science Direct, 2010, Pp. 86-99



Rupsa Mukherjee Banerjee
State Appointed College
Teacher of
Ranaghat College, Nadia
West Bengal, India
e-mail : rupsarmail@gmail.com

Searching the “I” through the Female Characters in selected Novels (Translated) of Sangeeta Bandyopadhyay

Rupsa Mukherjee Banerjee

Abstract

When the translated version of Sangeeta Bandyopadhyay’s novel ‘Panty’ hit the book market of Kolkata, many book worms seemed to get repelled by the image of the panty, the cover of the book held at that time. But repulsion can never conceal the truth. And, needless to say, sexuality and body politics do not signify pornography. Now, “India’s Elena Ferrante” made me feel that somewhere we, the women, need to consider and re-consider the issue of politics of sex and sexuality to go beyond the social “me” and search for the subject “I”. Mead has rightly opined that the social “me” and the subject “I” are not the same. The search for the topic “I” has always been the concern of feminism.

Feminist theorists from Simone de Beauvoir to Bracha Ettinger --- all talked about this “I”. Sangeeta’s characters wildly search for this “I” (self). Knowledge of the “I” is never complete without knowing the sexual abilities of the “I” in a woman. Drawing references from Luce Irigaray, Julia Kristeva, Helene Cixous, Bracha Ettinger, and Simone de Beauvoir, I intend to show that the women in Sangeeta’s Panty, Hypnosis, Abandon are trying to be the “I”. Kierkegaard has said that subjectivity is synonymous with truth. “I” of a woman flares out when the subjective “I” encounters with her plurality of sexuality to conquer the singularity of the “phallus”. Nothing is there beyond the body. Sangeeta’s characters know this. They dare to break the social apparatus for the eternal subjective “I”.

Keywords

Sexuality, Plurality, "I", Self, Search, Truth, Subjective

Women as Educated Subordinates of Men in Bengal

The colonial empowerment of women in Bengal started by men was politically organized to subdue educated and literate women's bodies within patriarchy's cages. Women were taught to murmur Bengali and English poems softly and mildly to soothe men's ears; they should have deity-like self-control, their minds and bodies should get disciplined to gain a national and patriarchal pride. (Borthwick 105) This schooling of modern Renaissance women by men was the "politics of nationalism". (Chatterjee 235) When the question of ultimate national faith came, India got recognition as the *Bharat Mata* who wanted to get her soul and her body safeguarded by her nationalist sons. The *Bharat Mata* painting by Abanindranath Tagore can be mentioned in this context, where the *Bharat Mata* as a female body with calm and quiet body language, mournful facial expression with drooping eyes — symbolical enough to theorize the colonized helpless structure of a nation has been shown discursively. The nation became the emblem of a mournful woman haplessly seeking refuge. Sumit Sarkar has opined that patriarchy, very shrewdly, controlled women's emancipation issues

only to produce better and obedient wives, mothers, and daughters. (Sarkar 155) There has always been an effort to domesticate the body – body has always been the site of patriarchal discourse. (Thorner and Krishna Raj 327)

Scope of Feminism in India/Bengal

Discrimination and atrocities against women have always been the potent uneven force in society. But feminism as a theory has a strong foreground in western philosophy. In India, feminism as a theory has primarily no distinction. (Chaudhuri 125) Feminism in India is not an "ahistorical ideal". (Ibid. xvii) Colonialism and patriarchy were double stresses for women in Bengal during the Renaissance. Sylvia Walby rightly has said that colonialism just changed the course and code of dominance and exploitation of women by men. (Walby 9) Feminism as a theoretical praxis did not progress much in India as the colonizers' new laws adhered strictly to the scriptures of Hinduism that promotes women's subordination. (Bagchi 3-8) The colonizers were political not to include the western feminist praxis in India's legal codes and conduct because the women of the colony if gets subjugated, the near and far-fetched generations could also remain

subjugated and thus under the control of the British Raj. (Liddle and Joshi 149)

Under the domestic fearlessness and right to independence mottos of Mahatma Gandhi, the feminists of indigenous India asserted to become visible by actively working for their country; it was as if they tried to become the “visible” bodies acting saviors for the country. According to me, this was the first visible step of Indian women towards feminist activism within the nationalist project. Here came the mingling of the ‘private’ and the ‘public’ sphere. In Bengal, we have women writers like Kamini Ray, Santa Devi and Sita Devi, Swarnakumari Devi, Anurupa Devi, Nirupama Devi, whose feminist perspectives of their writings showed women the politics of nationalist patriarchy. Through their novel *Udyanlata* (Garden Creepers), the Chatterjee sisters dreamt of active socialization between women and men; they dreamt and talked about co-educational institutions. (Datta 10) I, personally, will say that a socialist and liberal Indian feminism was in the air of Bengal, where women writers advocated women’s education. We have the outstanding example of Rassundari Devi educating and liberating herself through *Amar Jiban* (The Story of My Life). But the patriarchal assumptions were/are strong enough. We need more and more radical steps.

Contextualizing Sangeeta Bandyopadhyay

Due to shortage of scope in this article I have to skip through a plethora of notable Indian and Bengali women writers who has gone a long way in advocating feminism as a strong force in the Indian soil and jump quickly in to the epicenter of my paper — the writings of Sangeeta Bandyopadhyay; what made me think of Sangeeta Bandyopadhyay as a powerful feminist in the history of this present century Bengali women writers? As I have said earlier, the lamp’s lighting has been completed, but one must need to fuel the lamp — radical steps are required to fuel the light of the feminist struggle. Sangeeta Bandyopadhyay is that passionate fuel for the feminist struggle.

Sangeeta Bandyopadhyay is an internationally famous Bengali feminist writer who is best known for her works *Panty* (2015) and *Abandon* (2017). Arunava Sinha, the winner of the Crossword Translation Award, translated Sangeeta’s *Panty* (same title in the translated work), *Sammohan* (as *Hypnosis*), and *Ruho* (as *Abandon*), Sangeeta is from Kolkata. Niven Govinden compared her with Elena Ferrante. Sangeeta is “India’s Ferrante”. Born in 1974, she became a poet at the age of thirteen. Her first novel, *Sankhini* (2004), was an immediate success, and

after that, she went on writing novels. She is a woman who loves to write with a pen on paper and then spoil her writing with the spill of a glass of water on it. She loves to read Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Doris Lessing, and Angela Carter. (Goyal) She loves to talk and write about things that give her "jouissance". She has that explosion and rapture within her writings that advocate pleasure--the pleasure of being a female physically, mentally, and spiritually. Analysis of some of her works will clear this out.

Stepping into the Know the Body (I) with Panty

Panty begins with an end — the end of a dream. The notion of heterosexual love proves to be a faux pas for the female protagonist whose male lover "didn't kiss" her and "raced away towards a deserted Park Street." (Bandyopadhyay Panty 173) For her, "the dream ended after fourteen years." (Ibid.) We have the imagery of death and blood at the very beginning chapter of the novel that, very oxymoronically, connotes a beginning of something, something "new" that is not known. Existentialism as a philosophical nuance individualizes death as one of the crucial developments in a person's way of "being" — death instigates self-awareness and initiates responsibility for his actions. (Harris 227- 230) If death

and its responsibility are levied upon a subject, then that existentialist subject begins to consider death as her own. That is what the protagonist exclaims, "[. . .] I made the death my own. ' This is my death.'" (Bandyopadhyay *Panty* 174) Death as a recurrent theme pervades the whole of the novella; sometimes death comes as a fret, sometimes as an awful ignorance, sometimes as a nasty rejection, and sometimes as a wishful, willful and blissful acceptance. It is as if Sangeeta's woman narrator or the women in *Panty* are parading with Plath's *The Bell Jar* in her/their hand (s) and chanting the famous hymn on death by Plath:

Death must be so beautiful. To lie in the soft brown earth, with the grasses waving above one's head, and listen to silence. To have no yesterday, and no tomorrow. To forget time, to forgive life, to be at peace." (Plath, *The Bell Jar*)

According to Heidegger, knowledge can only be complete through the wisdom for death; this wisdom for death can usher in the knowledge of the universe. In this twenty-first century, death and the non-clarity of remaining alive form the epicenter of life. Therefore, it is beneficial to know death than to avoid the knowledge of death. If there were Existence, then the knowledge of the Inexistence should be there. So death is a positive force of life.

(Heidegger, What is Metaphysics? 302-303) Heidegger's theory of Dasein (Being, Existence) revolves around this argument of the essentiality of death's knowledge. Death is the Existence that documents the unreliable uncertainties of life (Ibid.) Dasein leads to nothing (Death), and this is the only possible surety of Existence. But death comes to us as an experience of "they" — the "they-self"; the "my-self" different from the "they-self" never tends to understand the actuality of death because death comes to the living cells as an experience to the encounter of death by "they" and "them". (Heidegger, *Being and Time* 297-309) So, if death as knowledge comes to the "they-self", the "I-self" remains unacknowledged with existence. This negotiable existence (read Non-existence) is something that Sangeeta's female protagonists hate to experience. So she/they want to die.

But actual death of the body only leads to the annihilation of any possible positivity. So, how can a woman know the "my-self"? A possible encounter with a woman's sexuality can make the body "visible". Baula (might be the protagonist's name as the novella unclearly suggests) slipped into the leopard-print black and yellow panty. Immediately she felt that she fell on "her womanhood" (Bandyopadhyay *Panty* 183). The panty was a "soft", "perfect fit", and "as though tailored

especially for" Baula. (Ibid.) She began to experience womanhood through an amazing sexual fantasy with the panty, symbolic of the woman to whom it originally belonged. It is as if Sangeeta created a Bengali Celia who encountered her "female" self with Shug Avery. (Celia and Shug Avery are the dynamic characters created by the Pulitzer Prize Winner American writer Alice Walker in her novel *The Color Purple*.) The panty becomes the messiah for Baula, which helped her to encounter her multiple sexualities. (Irigaray 23-34) Luce Irigaray conceptualized the power of plural feminine sexuality over the singularity of the phallus. Female autoeroticism has been given utmost importance to know the power of the "female". Women's sexuality is "diffused", "silent," and "multiple". (Irigaray 27-29) Irigaray puts it wonderfully in her own words:

"[. . .] if you ask them insistently what they [women] are thinking about, they can only reply: Nothing. Everything. [. . .] Woman always remain several, [. . .]" (Irigaray 29)

For Baula slipping into the panty is a normative sexual encounter with another woman. Panty is the medium for the play of trans-subjective femininity. Ettinger argues that the unconscious is the space for the co-habitation of images where

constant over-lapping of the archaic m/other figures occur. This overlapping of the images of the m/other figures occurs prior to abjection. (Ettinger 368- 395) Baula encounters with myriad images on her flat wall; she experiences the horror and eternal dissatisfaction of heterosexual love. Her m/others weave stories of their own on the wall of the flat; stories and experiences alike. Recognition with the archetypal mother figures occurs when Baula talked about the insecurities of patriarchy that "made her a 'woman'". (Bandyopadhyay *Panty* 234) "I seemed to become 'her'. In my way, I became her." (Ibid. 254); Baula confesses. Ettinger's concern is Kristevan — she wants to explore the dark feminine semiotic matrix of the unconscious. Her paintings like 'Eurydice', 'Medusa', 'The Graces', try to project the unreadable trans-subjective matrixial tissue where there is no split. The images of the archaic m/others overlap. The course of Sangeeta's novella, the myriad overlapping and intermingling of characters within the novella, forms a cobweb of archetypal m/other figures tending not to reject but to commute with each other. Heterosexuality is a compulsory ideological procedure a woman has to experience in her life; it brings total detachment with the "myself". Sangeeta, very politically, questions the hegemonic idea of satisfaction a

woman gets in drinking semen from the penile cup; the patriarchal concept of sucking out womanly pain from nipples with a man's mouth gets problematized.

Playing with Queerness in Hypnosis

Hypnosis reveals the same anarchic status of Illona Kuhu Mitra. Illona wants sex in her life. She is not a virgin, and she has had ample scope for sexual voyages in her life. Death as a positive force is also present in this novella's course. Sunetra, Illona's friend, says, "I wish I would die." (Ibid. 4) Sunetra, like Baula in *Panty*, questions the scope of heterosexual love:

"[. . .] does sleeping with more than one man amount to having a great sex life? [. . .] How much pleasure did I actually get?" (Ibid. 5)

Sisterhood and identification with each other's emotions form the basis of *Hypnosis*. Sangeeta breaks the politics of heterosexuality by demystifying the pleasure principle of heterosexual love through Illona Kuhu Mitra. Sex is a metaphysical activity that permeates from the body to the soul. What matters then is the bodily contact. Patriarchy prioritized heterosexuality for the issue of reproduction. Sex as a metaphysical act has no importance in patriarchy. If a woman's body can't be the slave of the reproductive process, then the body is of

no use. Sex as a pleasurable entity exists only for men; for women, sex is a pre-session for having progenies. Sangeeta breaks this standpoint with her feminist conclusions with the voice of Illona:

“What [sex] starts with the body and ends with the body. That’s why I can’t believe in all these clearly defined identities like homosexual or bisexual. Anything and anybody can give you that pleasure.” (Ibid.)

Now this is queer. Patriarchy must be having a hard slap with this comment. Eve Sedgwick’s notion of “queer” aims at anything or anyone that problematizes patriarchy’s hegemonic discourse. When Illona says that a homosexual or bisexual body can also give or acquire pleasure, the static patriarchal heteronormativity dismantles and destabilizes to give way to a mesh of strange resonances; she begins to think beyond normativity across the boundary. (Sedgwick 67-93) Illona makes us rethink the heteronormative stability of sexuality. Illona surpasses the heteronormative sexual orientation. Her identity is getting destabilized. She is searching for the subject “I” in her. Through the touching of the labia and friction of clitoris with the act of rocking her body on a chair, she was experiencing the power (read plurality) of her female sexuality:

“[. . .] the leg rose and fell, and there was a thump each time” (Bandyopadhyay *Panty* 5)

She is getting to know the power of feminine sexuality; she can experience pleasure without the touch of that singular phallus; she is about to complete her search for her subject “I” when her patriarchy mother and her patriarchy teacher slaps her for making noise with the rocking chair. Getting to know the plurality of female sexuality is a dangerous thing for patriarchy. Women are only allowed to generate pleasure for the phallus. Or else the whole system of heteronormativity will collapse.

From that very day of scolding and spanking, her search for the “I” is going on and on. Her longing for sex becomes imagery for the search of her ultimate sexual power within her own body that is going to provide her a metaphysical fulfilment. Her world of dream and reality gets blurred. She dreams wild. A whole lot of Sayan or Meghdoot cannot satiate her urge for her subject “I”. She needs hypnosis to rise above heteronormativity for searching and communicating with her archaic m/other figures for her subject “I”.

Emancipation is true knowledge of self; and this knowledge will make a woman a saint. Kierkegaard famously asserts

that subjectivity is synonymous with truth. (Kierkegaard 182) The crowd (read patriarchal world) is untrue as it hinders the path of "being" the "I" for a woman. What is important here is not the solemnity of acquiring the knowledge itself, but the urge, the method, and constant wish and will to know the "being" in herself. This is what the hypnotherapist tried to make Illona understand when she uttered these saintly lines:

"You want to be purified? [. . .] You'll have to give everything up. [. . .] it's a very difficult path. [. . .] This world will also get wiped out in your head."
(Bandyopadhyay *Panty* 166)

Hypnosis, a trance state leads the path to salvation; by salvation, I mean the effort of being a "female"; whether you pass or fail in the process is unimportant.

Elaine Showalter enumerates the course of women's literature, giving it three very distinct phases: the Feminine phase (1840-1880), the Feminist phase (1880-1920), and the Female phase (1920-the present). Self-discovery forms the basis of this Female phase. Sangeeta's novels are right to be categorized in this contemporary Female phase where the female voice comes out for women's cultural analysis. Here lies the justification of introducing her to the list of canonical Bengali women

writers of the 21st century. Her characters are "female" to commute with the pangs of women outside.

Ishwari's Attempt to Write a Woman's Text in Abandon

Mead proposed that the social self is the "me" and the "I" as the inner self is the answer to the social "me". The self as an individual gains clarity and introspection through continual interaction with the other individuals and the surrounding environment. The process of socialization includes the self's constant reconciliation with the social group. (Mead 172-175) For women, this constant interaction with the social group leads to the destruction of the "I". Society regards a woman's "self" as the "Other". Beauvoir's seminal theoretical work *The Second Sex* enumerates this patriarchal politics of signifying women as "Others".

Society has kept "transcendence" for men; for women, society has kept a claustrophobic world termed by Beauvoir as "immanence". (Beauvoir 35-38) Now women as beings should have access to "transcendence". Ishwari in *Abandon* tries her hand for "transcendence". She gives birth to Roo — and appropriation of her "me" self, an assignment of bearing and rearing child given to her by the society.

On the other hand, she has to become a “female” writer — the way she wants to become visible by the expression of creativity and productivity to the universe. Ishwari wants to create; she struggles to find her place. Ishwari runs away from home so that she can devote herself to create a novel. She wants to be a writer; her immense struggle is to break society’s shackles; may be she wants a space where she can write with her own body; she wants to innovate a language of her own to communicate with women outside. She wants to write a woman’s text with a woman’s body as an identity. Hélène Cixous talks about “Écriture féminine” which indicates using a woman’s body to create a “feminine text”. (Cixous 873) A woman should write with her “white ink”; this “white ink” can only be the signifier of female authorship. Women should write for themselves with their bodies. Thus women must innovate new modes of writing that go against the “logos”. (Cixous 881-882)

Ishwari is in search of this queerness as a writer. She wants to get her body visible in her writing. This is an eternal search. She wants to delve deep into the “chora” to get that white ink with which she can write. Julia Kristeva defines the semiotic stage as the pre-symbolic matriarchal sub-lingual stage where the speaker’s inner drives get shapes. It is that space where the structure

of language cannot evade. This is the zone of power. (Jones 57-59) Ishwari wants to invade this zone to get some white ink. But Roo, her son, a discursive entity of the responsibility patriarchy has given her, is waiting for Ishwari. She is ready to give up her patriarchal prejudices in search of the “I”. So, she eventually to decides to loosen “her grip — [. . .] she loosened her meaningless grip on relationships, one responsibility, on love, on trust, on duties, loosened her hold on her right to life. Roo went further ahead, and she retreated.” (Bandyopadhyay *Abandon* 173) The novel ends with a genuine note:

“She [Ishwari] knew that every artist had to sacrifice her soul at one time or another in order keep living as a practiced, professional entertainer.” (Ibid.)

Ishwari is Baudelaire’s “flâneur” like figure who objectively looks at the urban world, detached from societal bonds. Ishwari’s only objective is to say the truth through her work’s fiction by acutely and appropriately observing the urban society.

Conclusion

It is the readers’ choice whether they will accept Sangeeta Bandyopadhyay as one of the canonical writers of 21st century Bengal or dump her writing as merely B-grade novels with stories of nakedness, sex and brutality. One thing we must

accept that truth is naked. M.F.Hussain's painting of nude Saraswati, though it had created a furor when it first appeared, has been successful in establishing the fact that truth is knowledge and knowledge is naked. Sangeeta does not intend to write pornography. Her novels are poetics on the politics of body and sexuality. It is high time for us, Bengal women, to communicate our congruous and incongruous experiential appropriations and create communicative and convincingly interactive platforms for Sangeeta Bandyopadhyay's work.

References

Bagchi, Jasodhara, editor. *Indian Women: Myth and Reality*. Sangam Books, 1995.

Bandyopadhyay, Sangeeta. *Abandon*. Translated by Arunava Sinha, Harper Perennial, 2013.

Bandyopadhyay, Sangeeta. *Panty*. Translated by Arunava Sinha, Penguin Random House, 2015.

Beauvour, Simone de. *The Second Sex*. Translated by Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier, Vintage Books, 2011.

Borthwick, Meredith. *Changing Role of Women in Bengal*. Princeton University Press, 1984.

Chatterjee, Partha. "The Nationalist Resolution of the Women's Question (1989)". *Empire and Nation: Selected Essays*. Columbia University Press.2010.

Chaudhuri, Maitrayee, editor. *Feminism in India*. Kali for Women, 2004.

Cixous, Hélène. "This Laugh of the Medusa". Translated by Keith Cohen and Paula Cohen, *Signs*, vol. I, no. 4, Summer 1976, Pp. 875-893, The University of Chicago Press. <https://www.jstor.org/stable/3173239>. Accessed 20 Aug. 2014.

Datta, Dipannita. *A Caged Freedom: the Novels of George Eliot Santa Devi & Sita Devi*. Writers Workshop, 2001.

Elaine, Showalter. "Towards A Feminist Poetics". https://historiacultural.mpbnet.com.br/feminismo/Toward_a_Feminist_Poetics.htm. Accessed 10 Jul. 2013.

Ettinger, Bracha Lichtenberg. "The feminine/prenatal weaving in matrixial subjectivity-as-encounter". *Psychoanalytic Dialogues*, vol. 7, no.3, 1997, Pp. 367-405. 10.1080/10481889709539191 . Accessed 11 Jul. 2019.

Goyal, Sana. "Sangeeta Bandyopadhyay: 'India's Elena Ferrante'." *Livemint*, 31 Mar 2018, <https://www.livemint.com/Leisure/pO0j4C71pcOPozKV3gNiEM/Sangeeta-Bandyopadhyay-Indias-Elena-Ferrante.html>. Accessed 11 Feb. 2020.

Harris, Kenneth A. "The Political Meaning of Death: An Existential Overview." *OMEGA - Journal of Death and Dying*, vol. 2, 1971, Pp. 227-239, <https://doi.org/10.2190/55XD-EMY8-7EHK-TM8F>. Accessed 12 Jan. 2020.

Heidegger, Martin. *Being and Time*. Translated by J. Macquarrie and E. Robinson, Basil Blackwell, 1962.

Heidegger, Martin. *What is Metaphysics?* Translated by Siavash Jamadi, Phoenix Publishing, 2014.

Irigaray, Luce. *This Sex Which Is Not One*. Cornell University Press, 1985. <http://kunsthalleszurich.ch/sites/default/files/downloads/irigaray-this-sex-which-is-not-one.pdf>. Accessed 11 Jun. 2014.

Jones, Ann Rosalind. "Julia Kristeva on Femininity" *The Limits of a Semiotic Politics.* *Feminist Review*, vol. 18, 1984, Pp. 56-73. <https://doi.org/10.1057/fr.1984.48>. Accessed 13 Apr. 2015.

Liddle, Joanna and Rama Joshi. "Gender and Imperialism in British India." *South Asia Research*, vol. 5, no. 2, Nov. 1985, Pp. 147-156, <https://doi.org/10.1177/026272808500500206>. Accessed 01 Feb. 2019.

Mead, George Herbert. *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviourist*. Translated by Charles W. Morris, University of Chicago Press, 1967.

Sarkar, Sumit. "The 'Women's Question' in Nineteenth Century Bengal". *Women and Culture*, edited by Kumkum Sangari and Sudesh Vaid, SNDT Women's University, 1985, Pp. 157-172.

Sedgwick, Eve Kosofsky. *Epistemology of the Closet*. University of California Press, 1990.

Soren, Kierkegaard. *Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments*. Translated by David F. Swenson and Walter Lowrie, Princeton University Press, 1941.

Thorner, Alice and Maithreyi Krishna Raj. *Ideals, Images and Real Lives: Women in Literature and History*. Orient Longman, 2000.



The Changing Pattern of Social Relationship for COVID-19 in India and Bangladesh

Dr. K. M. Rezaul Karim & Dr. Samita Manna

Abstract

The world is facing one of the biggest challenges due to COVID-19 after the World War II causing a crucial health crisis to human life and distortion of livelihood (EIU, 2020). The WHO declared COVID-19 a pandemic disease on 11 March 2020. COVID-19 threatens our physical and mental health, isolates us from family, relatives, and friends, and disorganises society too. This pandemic has affected thousands of people who are either sick or are being killed due to the spread of such deadly infectious Virus. Personal and professional lives are under full of strains and stresses that make the individuals perplexed. These challenges are faced globally and nationally. In fact, the COVID-19 pandemic has affected day-to-day life and is slowing down the global economy. As a result, it changes our social structure imbued with new forms of social relationships among the people of global and local. India and Bangladesh are not set apart from it. The only way to control and defeat this pandemic is to make people follow social distancing and also to restrain them from moving out to avoid social contact. The current paper mainly is based on secondary data. It tries to assess the changing pattern of social relationships among the people of India and Bangladesh due to COVID-19.

Dr. K. M. Rezaul Karim

Associate Professor
Department of Sociology
Government M M College,
Jashore, Bangladesh
e-mail : rezakarim.km@gmail.com

Dr. Samita Manna

Professor
Department of Sociology
Kalyani University,
Nadia, West Bengal, India.
e-mail : samia.manna@gmail.com

Keywords

COVID-19, Changing pattern, Social Relationship, Social distancing, Global economy

Introduction

I

The COVID-19 has badly affected the entire world, and India and Bangladesh also have borne the brunt of the same. Like other countries, COVID-19 has changed the lives and livelihoods of the people of India and Bangladesh (Titumir, 2021). The COVID-19 has caused tremendous consequences in the economy by threatening millions of livelihoods and damaging the earning sources of around 50 million people in the informal sector in Bangladesh (Akhter, 2020). It is estimated that 122 million people lost their jobs in April 2020 and three-quarters of these were small traders and wage labourers, mainly in the informal sector in India (Thomas, 2020). The unemployment rates in India are expected to rise to 8.5% in the financial year 2021 (Suneja, 2020). Due to the COVID-19, social life of the country's people, especially vulnerable groups are facing different challenges. The COVID-19 and its containment measures have posed a challenge to the interpersonal social relations of the individuals and community interactions imposing social distancing measures and isolation (Sing & Sing, 2020). We don't know what will happen in near future. The governments of India and Bangladesh have already over-concerned about the

pandemic situations and adopted many comprehensive responsive plans for protecting the health, socio-economic and psychological conditions of the people.

II

India's first Covid case was detected in Kerala's Thrissur on 30 January 2020. On the next day, the WHO declared coronavirus a 'global emergency of international concern'. On 31 January, the government decided to airlift its citizens from China's Wuhan, where the outbreak started. An Indian aircraft reached Wuhan at 8 pm and left with 324 passengers at 4 am on 1 February. On 29 December 2020 the Union health ministry said 6 passengers who recently returned to India from the UK have tested positive for the new coronavirus variant (Grewal and Chakrabarti, 2020).

Bangladesh is one of the densely populated countries in the world, which also has come under attack by COVID-19. The first case of COVID-19 patient was detected here on 8 March 2020. In Bangladesh, more than 8462 people died and almost 5,42,674 people are tested positive (www.worldmeter, 20 March 2021). According to the Health and Family Welfare Ministry over 4.2 million people have been administered the first dose of the vaccine in Bangladesh. The COVID-19 pandemic situation has an impact on every aspect of

social life as well as the social relation of the people in Bangladesh.

The most common symptoms of this viral infection are fever, cold, cough, joint pain, and breathing problems that ultimately lead to pneumonia. For protection, washing of hands, avoiding face-to-face interaction, keeping social distance, and wearing masks are our daily measures to stay safe. Most of the countries are imposing lockdown and enforcing strict quarantine to control the speedy havoc of this contagious disease. In earlier, India and Bangladesh have been hit by many major outbreaks like HIV/AIDS, Dengu, Chikungunya, SARS, Swine flu, etc., But none of the outbreaks was so widespread and fatal as Covid-19.

III

The social relationship is the most fundamental aspect that makes the society vibrant, dynamic, and active. There fore, the social relationship is essential for making society alive. But the nature, function, and form of social relationships vary in time and space dimensions focusing on the notion of change. In general, social relationships denote dynamics of social interactions bounded and regulated with social and cultural norms having social positions and performing different social roles.

Each society has its own structure along with its institutions and organizations. Many studies are done continuously by social scientists and especially by sociologists to understand the changing social relationships. In his classic work Charles Cooley stated, ‘By primary group, I mean those characterized by intimate face-to-face association and cooperation’. (Cooley, 1915). Social relationships are an end in themselves. In primary groups, the individual personalities with each other are fused so that the group to a large extent manifests a common social life and purpose. On the contrary, secondary groups are introduced by other scholars to refer to “group relationships where the personal association is more casual, less frequent, more directed to special and narrow goals and more compartmentalized” (Bertrand, 1973).

Toennies’(1887) *Gemeinschaft* expresses a real natural community life based on the ties of kinship and has a moral cohesion often founded on common religious sentiments. On the other hand, his *Gesellschaft* often announces an artificial social arrangement based on heterogeneous relationships of different groups of people having their personal ego and individualistic approach; Sumner’s in-groups (we belong) and out-groups (we do not belong) (Sumner, 1906). Marx’s economic developments of

various groups play an important role to change the nature of social relationships (Smelser, 1975). Apart from Marx, Pareto's non-logical action is mainly guided by sentiments and non-logical factors (Aron, 1970). Simmel in the field of Sociology emphasizes that "conflict is built into many social relationships and may, in fact, be an essential element in their stability" (Giddens, 1963). Parsons conceived of 'culture as the major force binding the various elements of the social world, in his action system. Culture mediates interaction among actors and integrates the personality and the social systems' (Ritzer, 1996:). Weber (1922), and many postmodern thinkers like Baudrillard (1998), Derrida (1967), Foucault (2001), Loytard (1979), etc., study society with their own perspectives pointing out changing aspects of society to understand the new social relationships. It emphasizes pluralism and relativism and rejects any certain belief and absolute value; it conflicts with essentialism and considers human identity to be a social construct. Postmodernism rejects the concept of rationality, objectivity, and universal truth (Beyer, 1992). After reviewing all these studies it can be stated clearly that there is no question about the ubiquitous nature of social relationships. Society moves in its own way just like the growth and development of a human

baby. According to Spencer (1908a) 'evolution of societies, society's growth in size. In his view, societies similar to a living organism, "begin as germs". Amid biological evolution and spontaneous change, induced change also play an important role to change society. History often says that great changes are done due to sudden natural calamities or unexpected epidemics. In this way, nature maintains its equilibrium (Malthus, 1798).

The COVID-19 pandemic is reshaped our personal relationships in unprecedented ways, forcing us to live closer together with some people and apart from others. According to WHO, the relationship is the determinant of mental and physical health. Life on lockdown has been forced to live the individuals in close contact with one's families and partners, but social distancing measures have isolated one from friends and wider communities.

COVID-19 has raised the question of human survival on earth. It has dramatically changed the social lives of the people in Bangladesh and India too like other countries of the world. The burden of disease and its death toll have had an impact on the healthcare and socio-economic condition of the people in the country. Social lives have been disrupted at the community and family level and the people have been faced with COVID-19

related sufferings and consequences of lockdowns.

Discussion

2.0 Changing Pattern of Social Relationships

Man is a social animal, and thereby social relations and interactions are necessary for his existence. From human survival, these social connections, interactions, and relations have become integrated into an individual's life. So, if there is an absence of such connection, it definitely leads to stressful states of loneliness, anxiety, depression, mental disorders, health hazards, and many other issues which impact the life of the individual and society as a whole. During the covid-19 pandemic situation, the economy and health agencies of India and Bangladesh are significantly affected. India is recognised as a land of diversity, so the impact of COVID-19 is diverse and complex. The existing situations due to COVID-19 have disrupted every aspect of the social life of the people of India and Bangladesh simultaneously.

“Social distancing refers to a host of public health measures aimed at reducing social interaction between people based on touch or physical proximity. It is a non-pharmaceutical intervention to slow the spread of infectious diseases in the communities. It becomes particularly important as a community mitigation

strategy before vaccines or drugs become widely available” (Mishra et. al, 2020).

The term social distance was introduced by park and Burgess in 1924 as a social science concept. It refers to the feelings or relations of ‘aloofness and unapproachability’, especially between members of different social strata (Jary & Jary, 1991). It is practised in all societies in varying degrees and forms. The concept was popularised by Bogardus (1933) formulated the social distance scale for measuring the extent of tolerance or intolerance between social groups.

Social distancing creates some sort of mental aloofness, feelings of avoidance, less cooperative mentality, and strengthens individualism. Gradually individual is withdrawing himself from doing community responsibility which makes him selfish and inhuman day by day.

COVID-19 has rapidly affected our day-to-day life, business organizations, socio-cultural and educational institutions. It negatively affects learning and growth, and it prevents people from effectively socializing, which is a fundamental human need. Due to this pandemic situation, educational institutions are remaining closed for an uncertain period. By closing schools, the pandemic is preventing many children and adolescents from socializing

with others. This affects their ability to make quality connections, which impacts their personal growth. Indeed, youth flourishes socially through connections and fulfilling relationships, which are also an integral part of their learning. Long-term isolation leaves these basic human needs unsatisfied and ultimately affects mental health (Sikali, 2020).

Man is a Social Being

Who is unable to live in society, or who has no need because he is sufficient for himself, must be either a beast or a god” (aristotle, 1915). It is one of the basic instincts of human behavior. But individuals living in lockdown have proved that man as a social being sustaining without ideal social relationships because standing lockdown as per requirement varies from country to country for about four months to more, have impacted people psychologically and provoked the people to live alone either in home quarantine or in isolation.

Guidelines on social distancing are advisory in nature. Lockdowns, in contrast, are enforced by the state according to the necessities. Lockdowns especially in India and Bangladesh appear to be a blessing and curse as well. It helps to stop the spreading of COVID-19 chains and restrict the movements of the people by halting activities. They also boost compliance with social distancing

guidelines, especially in public places. However, continuing with lockdowns for a long time would be ruinous to a country and its economy. COVID-19 is expected to last for more than years (Kissler et al., 2020).

Virtual platforms have created a new horizon of relationship and every organization throughout the world remains active through technology to make society functional. On-line classes, work from home, online doctors and medical services, reading epaper and online shoppings are very common nowadays. A new chain of service sectors has developed to make society alive. Religious organizations are also engaged in virtual worshipping with prayer and performing various forms of ritual obligation. Marriage, death, even birth rituals are successfully done on virtual platform as the urgent needs of the family. It is a known fact that the countries like India and Bangladesh are strictly stratified societies. Mainly caste and class type of stratification creates many divisions among the mass. This pandemic has also exposed the ubiquity of gender inequality. The cases of domestic violence have increased exponentially during the lockdown and mostly the women and children and dependent people are affected by it. This pandemic also creates another form of inequality in the field

of internet access. Most of the students in India and Bangladesh are not getting any internet access at home. A recent UN report estimates that two-thirds of school children worldwide have no internet access at home. The Executive Director of UNICEF has talked about it being a “digital canyon” rather than a “digital divide (UNICEF, 2020).”

Social Interaction

Social interaction is the focal point of sociology and as social life. But because of Covid-19 pandemic situation, people are maintaining social distance for a long period, for which social interaction pattern has been reshaped. Social distancing involves staying away from people to avoid transmission of the virus. It is a new emerging terminology that means avoiding the crowd. Eric Kleinberg, a New York University sociologist, stated, “we’ve also entered a new period of social pain. The rigidity of lockdown measures has radically changed social interactions, with virtual meetings replacing face-to-face meetings to reduce the risk of corona transmission; (Kleinberg, 2020). Children are mostly victimized by undesirable situations, because schools, parks, playgrounds all the gathering places for children are closed since the early stage of the COVID-19 pandemic while they are restricted to interact with their peer

group that constrains the natural growth of the future generation. Gender relations within the family are going to be changed in favour of greater sharing of domestic responsibilities between men and women. Women who are displaced, migrants or refugees, older adults, disabled and like others may particularly experience stress due to social distancing because of their physical dependency and emotional vulnerability. Working patterns are likely to become more flexible and promotive of social distancing. Human interaction based on digital technology is likely to increase. (Mishra, 2020)

Live for Others

Living for others is the basic motto of the human race. All religious institutions are persisting with the ideas for the welfare of the people. But under COVID-19 pandemic, human beings fear of their own species. They fear in such a way that near about all are not getting support from neighbors, relatives, friends, doctors, and nurses, even in some cases from family members also at the time of sickness with the symptom of COVID-19. All are anxious for their own safety and security. Some opposite scenarios are also seen during the corona crisis. For example, a number of voluntary persons or organizations show their social responsibility to minimize the adversity of marginal

people who are really hungry for food and other daily essential needs. Members of this group collected money or goods from the humanitarians. *Biddyanando*, a charity organization, provided per meal amongst the poor in return for TK.1 (Chowdhury, 2020). Like many, MCKS-Food for the Hungry- Foundation, a non-profit organization has been developed in New Delhi. The team's mission is simple that no one should that sleep hungry. To support the community, in New Delhi during the lockdown, organizations have increased capacity at the MCKS' Kitchen and delivered 60,000+ nutritious cooked meals only in 7 days. Each nutritious meal of approximately 450 calories, costs only INR 15/-. Medical professionals (doctors, medical students, pathologists, nurses) and other front-liners like police, bankers also serve the people ignoring their life risk equally in India and Bangladesh. Even more, than a hundred doctors died during the first wave of Coronavirus in India. Nurses, Police officers, and many front-line workers could not escaped from the virus attack.

Misinformation and Rumours

Misinformation about COVID-19 is a serious threat to global public health. Often the people of both countries are misled about the nature and treatment of the disease; they are less likely to observe

health advice and may thus contribute to the spread of the pandemic and pose a danger to themselves and others due to their poor socioeconomic status and little education. In the early period of the COVID-19 outbreak, a great panic surged in society. Initially, lack of trustful and official information about the affected positive cases and a frequent number of death cases, people are often confused about the real situation. Sometimes the rumors spread through social media like Facebook, Messenger, YouTube, Twitter, Whatsup, mobile phones, and many other ways. Contradictory information about the transmission of corona and possible protective measures, such as wearing face masks in public places create anxiety among the people. For example, some crazy people of the Kishorgonj district of Bangladesh attacked Rahim's house as he returned from Italy recently (Riaz, 2020). Actually, Rahim was not affected by COVID-19, but the people were afraid of the rumour that he was a corona patient. Such incidences always happen in different states of India too.

Loss of Humanity

Humanity is getting less value during corona. There are some instances where children have left their mother in the forest at night doubting her a COVID-19 patient. Wife and children have kept the

male member of the family noticing the symptom of fever confined in a room throughout the night without food and water. His reiterated request was turned down and the person was found dead in the early morning. As a result, people are losing their confidence in other members of family and society. Another incident happened in Narayangang district of Bangladesh where a man of the Hindu community died with corona-like symptoms. Neither of his relatives nor the neighbours of his community came forward for his cremation, Finally, his dead body was brought to the crematorium by the people of Muslim community, and they helped to cremate cadaver (Saha, 2020). It is undoubtedly inhuman behavior we noticed in our society after the covid-19 pandemic situation. India is not an exception. Many many immoral and pathetic incidents have taken place after detecting the covid patient. Many government hospitals closed treatment for them. Sometimes doctors were not available, nurses failed to do their duty. Gradually patient died. After death, the relatives and friends refused to identify the person. However, thousands of cases are mentioned each day in the peak period. Still people are experiencing a fluctuating situation.

But once again India and Bangladesh are now under the second wave. The

situation is worsening day by day. But the responses of the people have now changed. The hospitals are once again failed to provide beds for the critical patients. Unavailability of medicines is a regular feature in Indian hospitals, People are now daredevils. No one knows what will happen in the end.

Joblessness

Bangladesh is a densely populated country with 160 million people. The majority (85%) of the 60.83 million employees in the country work in the informal sector (Haider, 2021). Out of this number, an overwhelming 92% are women. The economy of Bangladesh is being significantly impacted by the COVID-19 pandemic, which has led to a decline in national and global demand for manufactured goods, particularly in the garment sector. It is revealed that by December 2020, 13% of garment workers have lost their job. During the pandemic crisis, people had to quit their jobs. More than 25 million of them already have left cities to their ancestral home to survive in a way or the other (Guerrero, 2020). Consequently, they became a sudden burden on their own relatives for the unknown period until getting an income source. It, indeed, creates an unexpected annoyance within the kinship which may go up to conflict for distribution of

inherited property. Under such a situation, crimes are on the rise. Economy may face negative per capita income growth in 2020 due to the Coronavirus pandemic, according to the IMF. In its recent forecast, the WTO indicated a clear fall in world trade between 13% and 32% in 2020, which is perhaps the worst fall since the Great Depression of the 1930s. There is also a disclaimer: no forecast is perfect when the pandemic is at its peak and changing the contours frequently. The IMF has also slashed the growth forecast for the Indian economy, projecting a GDP growth of 1.9% in 2020. In its recent World Economic Outlook, the IMF does project a rebound in the growth of the Indian economy in 2021, at a rate of 7.4%. So, there is hope! (De & Gupta 2020).

Alienation and Rise of Individualism

Maintaining social distance for a long time, people have developed alienation from their relatives, friends, colleagues, and society as well. Due to the covid-19 situation, alienation and individualism are being increased among the people in the society. Despite staying with family within the boundary of home, people nowadays are living alone, thinking alone, and confining themselves in a room in many cases. Therefore, they are becoming self-centered which will ultimately keep an impact on social relations in the future.

In migrant labour sectors, India has faced a tremendous crisis during the pandemic period. While the government says it has not maintained any data of those who died on their way home, Today India had prepared a database to document such deaths by tracking media reports during the migrant crisis. Migration as of May 28 2020, we had documented details of 238 migrant workers who died while trying to reach their homes. Among these, 173 were those whose identity information could be collected. In our database, we recorded information such as name, sex, age, place of death, source location, occupation, destination, mode of travel, the reason for death, and distance covered.

Among states, Uttar Pradesh saw the highest number of deaths (99), followed by Madhya Pradesh (34), Maharashtra (31), and Bihar (23). Since this data was collected from media reports, it is not exhaustive and it is possible that many deaths were not reported by the media or that we could not track all reports. Due to limitations of resources and the fact that many reports were in regional language media outlets, we do not claim to have documented all migrant workers' deaths (Rawat, 2021).

Increase in Mental Stress

In the age of globalization, people are living with different types of stress.

Besides, additional mental stress has been imposed on the human brain due to the covid-19 pandemic situation. The spread of COVID-19 and its outcome around the world has led people to experience fear, panic, anxiety, stigma, depression, psychological trauma, racism, and xenophobia. The outbreak of COVID-19 may be stressful for all people throughout the world. Fear and anxiety about the disease can be caused a strong emotional breakdown among the members of the family especially the aged and dependent people. The chronic stress due to coronavirus has also affected mental health. In Bangladesh, The Government imposes lockdown and quarantine at intervals. As a result, the employees spend their time in the family environment breaking the long-time regular practice; it also creates mental pressure on him and his family as well. Another feature is that trust and confidence are going down due to the covid pandemic as everyone is suspecting as a corona bearer among colleagues or clients. So, it is impacting interpersonal relationships for an uncertain period.

Distortion of Family Relationship

In previous days, India and Bangladesh used to live mainly in joint families. At that period, the number of family members was high and the family was considered a recreation center. But in the 21st century,

the number of people living in nuclear families is increasing day by day. Under socio-economic hardship, there is less opportunity to spend leisure periods with limited members in a nuclear family. As a result, they lead a monotonous family life, which has been turned to double monotonous in this pandemic situation. In the pandemic period, the pattern of familial relations has been changed at a significant level. The coronavirus crisis disrupted the family life also. Due to lockdown period, family clash has been increased by 74% in Italy. After starting lockdown (23 April-12 July) 16 women died due to family-violence in the UK. In Bangladesh, family clashes are also increased but at insignificant levels. As a result, the relationship among family members is disrupted. Besides some positive impact is shown in different family members. One of the housewives of Khulna said that the pandemic has allowed her husband, daughter, and her to spend much more time together. As a couple, they have been able to communicate frequently and as parents, that have been able to play with thir our daughter a lot more. So, she thinks they have emerged out of the crisis as a closer and more tight-knit family. The role of gender is turned to a new dimension where the male partner is coming ahead to help her female partner for household works

which was solely upon the women before the COVID-19 situation. In the absence of home servants, everything is going on with a sophisticated understanding of division of labor such as males are cleaning the floor and bathroom, washing clothes even taking care of babies which was very much rare in the pre-pandemic situation.

Rise of Social Stigma

Anxiety caused by lockdowns, unknown fears of being infected have given rise to stigma in local communities. People changed their behaviour patterns being afraid of discriminated treatments. That is why, they avoided corona tests, hid initial symptoms, and finally are exposed to family and commonly members. Thus they endangered the lives of others and it's a crime indeed. Again, the commonly people behaved in human with the covid-victims and it was unwise too. The house of Shila Rani Das, a senior staff nurse of Khulna Medical College Hospital was locked down by her neighbours because she was working in a hospital where a number of corona patients are under treatment (Daily Bangladesh, 9 May 2020). In many prosperous cities in India like Bengaluru, Delhi, Kolkata, and many others, the doctors, nurses, and paramedical staff are not allowed to stay in their homes as they are directly exposed to

Corona patients. but immediate steps have been taken from high authorities to solve the problem and it has been subsumed to a certain extent.

Conclusion

The pandemic of COVID-19 is severely impacting the livelihoods of individuals. As pandemics spread throughout the world, India and Bangladesh are not exceptional ones. When will it come to an end? The big question arises before us of this uncertainty of the pandemic situation. It is expected that Bangladesh will achieve SDG by 2030. The aim of SDG is to secure a sustainable, peaceful, prosperous, and equitable life for the people of the country at present and future. The goals cover global challenges that are crucial for the survival of humanity. The goals cover global challenges that are crucial for the survival of humanity. The Ministry of Health and Family Welfare of India has raised awareness about the recent outbreak and has taken necessary actions to control the spread of COVID-19. Though the governments of India and Bangladesh have already adopted a comprehensive responsive plan embracing health and socio-economic recovery measures to control and check the COVID-19 pandemic, still we have to walk a long way to get rid of this deadly pandemic situation. But right now,

we notice frustrating changes in social behaviour pattern globally.

References

Akhter, S. (2020). Covid-19 and Bangladesh: Thread of Unemployment in the Economy. *Journal of North American Academic Research*, Vol. 3 (8): 79-104.

Aron, R. (1970). *Main Currents in Sociological Thought*. New York: Basic Books.

Baudrillard, J. (1998). *The Consumer Society: Myths and Structures*. US: Sage Publications Ltd.

Bertrand, A. L. (1973). *Basic Sociology*. New York: Meredith Corporation.

Beyer, L.E. (1992). Discourse or Moral Action? A Critique of Post Modernism. *Educational Theory*. Vol. 42 (4).

Bogardus, E. (1933). 'A Social Distance Scale', *Sociological and Social Research*, 17.

Cooley, C. H. (1915). *Social Organization*. New York: Scribner.

Chowdhury, Mehrin Mubdi, Volunteering in Times of a Pandemic, *The Daily Star* (Dhaka), 31 March 2020

De, P. & Gupta, S. (2020). *Covid-19: Challenges for the Indian Economy: Trade and Foreign Policy*

Effects. New Delhi: Research and Information System for Developing Countries.

Derrida, J. (1967). *Of Grammatology*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Foucault, M. (2001). *Power*. France: New Press.

Giddens, A. (1963/2001), *Sociology*, UK: Blackwell Publishers Ltd.

George Simmel (1975). In *The Founding Fathers of Social Science* edited by Timothy Raison. London: Scholar Press

Grewal, K. and Chakrabarti, A. (2020). 'India's Covid calendar-a month-by-month look at how pandemic progressed in 2020', *The Print*, Accessed on 11.4.2021.

Guerrero, D.G. (2020). The Impact of Covid-19 on Bangladesh. *Global Justice Now*, 5 May, 2020.

Haider, A.A. (2021). Key socio-economic issues we must address to reduce poverty, *The Daily Star* (Dhaka). 11 February 2021.

Jary, D. & Jary, J. (1991). *Collins Dictionary of Sociology*. New York: Harper Collins Publishers.

Kannur, H. V. & Javadekar, P. 2020. The social Impact of COVID-19 on India. *The Bridge Chronical*. 1 May 2020.

Kissler, S. M., Tedijanto, C., Goldstein, E., Grad, Y. H., & Lipsitch, M. (2020). 'Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the post pandemic period'. *Science*. doi:10.1126/science.abb5793.

Kienberg, Eric, We Need Social Solidarity, Not Just Social Justice, *The New York Times*, 14 March 2020

Loyterd, J.F. (1979). *The Post Modern Condition*. Minnesota: University of Minnesota Press.

Riaz, Mahmud, *The Daily Tribune*, 20 April, 2020

Malthus, T.R. (1798). *An Essay on the Principle of Population of Population*. London: J Johnson.

Mehrotra, S. (2019). *Informal Employment Trends in the Indian Economy: Persistent Informality, but Growing Positive Development*. Geneva: International Labour Office.

Mishra, M. & Majumdar, P. (2020). 'Social Distancing During COVID-19: Will it Change the Indian

Society?', *Journal of Health Management*, SAGE, Vol. 22(2)

Rawat, M. (2021) 'Migrant workers' deaths: Govt says it has no data. But didn't people die? Here is a list', *India*

Today, 16 September 2021. Retrieved from: on 11.4.2021

Ritzer, G. (1996). *Classical Sociological Theory*. Singapur: The McGROW HILL International Edition.

Saha, Sanad, Coming Forward for Last Rites When No One Would, *The Daily Star* (Dhaka), April 26, 2020

Sikali, K. 2020. 'The Dangers of Social Distancing: How COVID-19 Can Reshape Our Social

Aristotle, 1915 *Eudemian Ethics*. The works of Aristotle; Volume 9, Translated by Solomon and Edited by WD Ross. Oxford; Oxford University Press

Experience', *Journal of Community Psychology*. Wiley.

Sing, J. and Sing, J. 2020. COVID-19 and Its Impact on Society. *Electronic Research Journal of Social Science and Humanities*. Vol.2 (1): 103-106.

Smelser, N.J. (1975). *Karl Marx on Society and Social Change*. Chicago: University of Chicago Press.

Smolinski, M. 2021. Wearing a Mask is a Sign of Mutual Respect During the Coronavirus Pandemic. *The Daily Tribune* (Dhaka), 15 February 2021

Spencer, H. (1908). *The Principle of Sociology*, Vol.1. New York: Apleton.

Sumner, W.G. (1906). *Folkways*. Michigan: University of Michigan.

Suneja, K. (2020). Jobless Rate to Hit 8.5% if Stimulus Not Widened. *The Economic Times*. 6 June 2020

The Economist Intelligence Unit, 2020

Thomas, J.J. (2020). India's poor may have lost Rs. 4 lakh crore in the coronavirus lockdown. Scroll.

in June 5.

Titumir, R.A.M. (2021). Where are we in achieving them? *The Daily Star* (Dhaka). 11 February 2021

Toennies, F. (1887). *Community and Association*. Michigan; Michigan State University Press.

www.worldmeter, 20 February 2021



Water-Logging in *Bhabadaha* A Search for the Cause of Its Persistence

Sankar Biswas

Abstract

This study reveals the history of water-logging in Bhabadaha and the steps taken so far for solving this problem to find out why the waterlogged situation persists there even after taking many steps. To get an insight into the problem, the nature of water logging in ten of the severely affected unions of Bhabadaha region is analyzed. Necessary data are collected through satellite images, secondary literature review, observation, Focus Group Discussions and Key Informant Interviews. The findings show that the bottoms of some of the low-lying marshes of Bhabadaha have reached the sea-level while the beds of the adjacent rivers have risen considerably because of siltation. As a result, the drainage system is damaged and water is trapped in the marshes. A possible immediate solution to these problems can be the continuation of Tidal River Management.

Sankar Biswas

Assistant Professor

Geography

Govt. T.T. College

Ph.D. Fellow

Institute of Bangladesh

Studies (IBS)

Rajshahi University

e-mail : procchad172@gmail.com

Keywords

Bhabadaha, Water-logging, Steps, TRM (Tidal River Management), Satellite, DEM (Digital Elevation Model), Persistence

Introduction

Bhabadaha is an area which has no clearly defined boundary. It is named after the Bengali term '*daha*' or the place where river *Hari* has taken a circular turn in between the villages of *Kalsikul* and *Bhabanipur*. The first part of the

name of the second village has somehow been associated with the *daha* of river *Hari* to include the entire people whose misery was caused by making a sluice gate across the river *Hari*. Once the area surrounded by *Mukteswari-Teka-Hari* and *Aparvadra- Harihar-Burivadra* river systems under *Monirampur, Keshabpur*

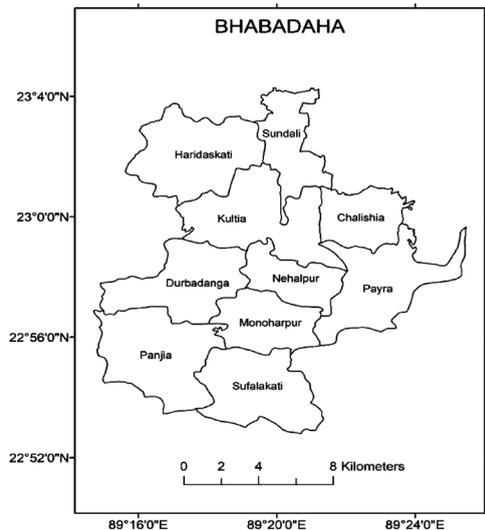
and *Abhaynagar* upazilas of *Jashore* district was called *Bhabadaha*.¹ The region encompasses eight upazilas, namely *Abhaynagar*, *Monirampur*, *Keshabpur* and part of *Sadar* under *Jashore* district; *Dumuria*, *Phultala* and *Daulatpur* under *Khulna* district, and *Tala* under *Satkhira* district.² The *Bhabadaha* region is experiencing the acute problem of water-logging over four decades. Two different steps are taken to address this problem. Some of these steps have been proved effective but could not continue. The rest has been proved futile. This study is an attempt to review the history of *Bhabadaha* water-logging along with the effect of the steps taken to solve this problems persisting in *Bhabadaha*.

Methodology

The present study is an exploratory research. Both primary and secondary data are used for this study. Primary data are collected through observations, Focus Group discussions (FGDs), Key Informant Interviews (KIIs), satellite images and LGRD maps. On the other hand, secondary data are collected from the reports of Bangladesh Water Development Board (BWDB), different books, and articles.

Figure 1. Study Area

For understanding the beginning of the water-logging of *Bhabadaha*, secondary



literature is reviewed and two FGDs and two KIIs are conducted. The FGDs are conducted with local elderly people who are mainly involved in farming. In each FGD, there were Seven participants. The KIIs are arranged with two local reporters who are dealing with the issue of *Bhabadaha* water-logging for about twenty years. In order to identify the nature of waterlogged areas of *Bhabadaha*, seven satellite images (Row 44 and Path 138) of respective study area during dry seasons (February) of 1972, 1980, 1987, 1997, 2003, 2013, and 2020 have been analyzed. Results have been showed in Table 1. Satellite images have

been analyzed in *IDRISI (Selva Edition 17.0)* and *ArcGIS (10.1)* field maps. The Landsat 8 OLI satellite images of different years have been downloaded from USGS GLOVIS website. Three base maps of three upazillas, namely *Abhaynagar*, *Keshabpur* and *Monirampur* were digitized and combined using *ArcGIS* software to create a new map of the study area so that information can be extracted from the downloaded satellite images. Besides, secondary data have been used to find out the steps taken for removing water-logging. Digital Elevation Model (DEM) is also used for bringing out the topographical condition of the study area so that the reason behind the failure of the steps taken for addressing the waterlogged situation can be identified.

Bhabadaha region is the broad study area of this research. The study area is in between 22°50' to 23°5' north latitude and 89°15' to 89°25' east longitude. Based on the intensity of water logging, ten unions (see *Figure 1*) of three upazillas in *Jashore* district under *Khulna* division in southwestern part of Bangladesh are selected as our sample study area. The unions of the sample study area are

- i. *Haridaskati*, *Kultia*, *Nehalpur*, *Monoharpur* and *Durbadanga* unions under *Manirampur* upazilla;

- ii. *Panjiya* and *Sufalkati* unions under *Keshabpur* upazilla; and
- iii. *Sundali*, *Chalishia* and *Payra* unions under *Abhaynagar* upazilla.

Water-logging in Bhabadaha: The Beginning

Bhabadaha region possesses a low-lying topography, and it had been unprotected for a long time from natural calamities like flood, tsunami, saline water of high-tide and flow-tide. As a result, crops and settlements of this area became frequently damaged. To reduce this damage, embankments were constructed in the early 17th century by the then Zaminders or landlords.³ These embankments were small. Wooden sluice gates were constructed around the area to protect the arable land from flooding.⁴ During the rainy season when the river water turned sweet because of the downward flow of rain water, farmers exchanged saline water from their fields with the river water. This traditional knowledge and practice of water management called Tidal River Management (TRM) was effective enough to balance sedimentation and subsidence in that area.⁵ That means, the key concept of TRM was unknowingly implemented by local people even before the formal introduction of TRM in this area. But these local structures were weak and required continuous maintenance. After abolition

of the Zamindari system, the maintenance of these structures became disrupted.⁶ As a result, the land water management problems became serious and crop failure occurred frequently.

During the British period, this region became unprotected again and remained such for a long time. To solve this problem, a large-scale project with a systematic approach was undertaken by the then Pakistani government in 1959 for constructing and maintaining permanent polders. The name of this project was **Coastal Embankment Project (CEP)** which started functioning in the 1960s under the authority of the then East Pakistan Water and Power Development Authority that later became Bangladesh Water Development Board.⁷ 90 polders were built; 39 of these polders are in the Khulna-Jashore region, enclosing an area of 1,014,100 acres by 1566 km of embankments with 282 sluice gates.⁸ 21-vent and 9-vent *Bhabadaha* Sluice Gate, constructed across the river *Hari*, between polder numbers 24 and 25 was the main regulator of the study area. The FGD data show this regulator helped remove the water of 27 *marshes* in the upstream areas and performed well for about 20 years after its construction.⁹

The entire program was undertaken to protect the existing settled agricultural land from deep flooding or from tidal

flooding with saline water, and to make it viable for crops to grow in the monsoon season. During the first few years, the CEP exploded the rice production in the region. But the Master Plan and its components were too narrow in concept and focus. It was primarily a civil engineering plan and not an agricultural development plan. For this reason, while implementing the CEP, some local people protested the project for its wrong design.¹⁰

The failure of the plan became visible when *Beel Dakatia* under polder number 25 became water logged. After that polder number 24 also became waterlogged. The temporary drainage congestion which first appeared in 1982 gradually became permanent. It increased so much that, by 1990, an area of 100,600 hectares in Khulna and Jashore districts was permanently waterlogged.¹¹

Steps Taken for Addressing the Problems of Water-logging

During Nineties, some steps were taken locally to get rid of the water-logging but the steps was not proved effective. Besides, drainage problem of *Bhabadaha* area in *Jashore* district became very acute. To solve the drainage problem of polder numbers 24 and 25, **Khulna-Jessore Drainage Rehabilitation Project (KJDRP)** was implemented during 1994-95 to 2001-02.¹² Although international

consultants had incorporated plans for controlled tidal flooding in early 1990s, **BWDB** did not include the practice in the **KJDRP**, arguing that it misrepresented the real problem and that it was not scientific.¹³ In 1998, for long-term solution of the waterlogged situation, the concept of **TRM** was formally introduced, but it was not instantly accepted by the local people. At the early stage, only **BWDB** thought **TRM** could be a long-term solution to the water logging problem in Bhabadaha area, but now most of the local people also think so. A key informant says,

There is no solution to this problem except TRM. Only TRM can reduce the amount of water in this area and make the marshes cultivable. The more the TRM is operated, the more is our relief. (KII 1)

However, two major surveys titled **Feasibility Study and Detailed Engineering Design for Long Term Solution of Drainage Problems in the Bhabadaha Area** and **Feasibility Study and Detailed Engineering Design for Long Term Solution of Drainage Problems in the Bhabadaha Area (2nd Phase)** were conducted under the supervision of the **BWDB** to take necessary steps to remove water-logging in the region through **TRM**.¹⁴ These projects could not be materialized. Much time has already been passed and now it is very

difficult to conduct **TRM** in the area next to *Mukteshwari-Teka* river system. Some local people wanted sequential operation of **TRM** in the low-lying *marshes* on the both sides of *Teka-Hari* river system. In this regard, another key informant says,

TRMs should be continuous. One TRM should follow another TRM. There should not be any gap between one TRM and another. Every gap counts. All the marshes from two sides of *Teka-Hari* should be brought under TRM. No marshes should be left. (KII 2)

IWM assessed the impact of the operation of **TRM** in *Beel Bhaina*. It was found that the land level of the marshes, tidal prism and drainage capacity of the river *Hari* were increased significantly because of the operation of *Beel Bhaina TRM* and the findings were disseminated to local communities and other stakeholders.¹⁵ **BWDB** accepted the concept of **TRM** and took steps to start the operation of **TRM** in *Beel Kedaria*, which was in operation from 2002 to 2004.¹⁶ However, operation of **TRM** was discontinued in 2005 having no *marsh* readily available for this operation. As a result, water-logging appeared again in the *Bhabadaha* area in 2005 and continued up to 2007.¹⁷

In East Beel Khuksia (**EBK**), the third **TRM** was started in 2006 according to the plan and design of **IWM**. Water-logging

was removed again in 2008 after three years' hard work of excavation, dredging and de-siltation in the river *Hari*, *Upper Bhadra*, *Buri Bhadra* and *Harihar*. Depth of river *Hari* was increased because of the operation of TRM at *West Beel Khukshia*.¹⁸ At this stage, excavation and dredging from *Bhabadaha* to *Sholgati Bridge* were conducted by the Bangladesh Army. Consequently, local people got bumper agriculture production.

At the end of the operation of TRM in EBK in 2009, a technical study was conducted by the IW marshes to select suitable marshes for operation of TRM to avoid time gap or discontinuation in between the end of a TRM and the beginning of another. *Beel Kapalia* was proposed for next operation of TRM in a quick study titled **Mathematical Modelling for Planning & Design of Beel Kapalia Tidal Basin for Tidal River Management (TRM) Sustainable & Drainage Improvement** submitted in 2008.¹⁹ IWM was involved by BWDB to find out a sustainable and long-term solution to get rid of the drainage congestion in the surrounding area of *Bhabadaha* in *Abhaynagar*, *Keshabpur* and *Manirarnpur* upazillas of Jashore district. The final report of the study **Feasibility Study and Detailed Engineering Design for Long Term Solution of Drainage Problems in the Bhabodah Area** was submitted in

December, 2010.²⁰ The outcomes of the study were some physical interventions including construction of embankments at both the banks of *Mukteswari-Teka*, construction of regulators and a plan for sequential operation of TRM in some selected marshes of *Teka-Hari-Teligati* and *Upper Bhadra* river-systems.

The TRM in EBK ended in 2009 but the operation of TRM in *Beel Kapalia* could not be started in schedule time of BWDB in 2010. Although construction of bordering embankment programme in *Beel Kapalia* was taken well ahead in 2009, but local people demanded fish and crop compensation of their land in advance. They obstructed BWDB contractors in implementing their works. The TRM in EBK had to continue beyond the schedule time because the TRM in *Beel Kapalia* could not be started in time because of opposition of landowners. A firm decision was taken in the **Ministry of Water Resources (MoWR)** not to proceed further for operation of the TRM in *Beel Kapalia* as the local people did not want it at all. In the meantime, local people including farmers and landowners of EBK became exhausted because of the operation of TRM for over 6 years which was scheduled for 3 to 4 years and ultimately, they closed the operation of TRM in EBK in February 2013 at their own initiative. After the closing of TRM

operation in EBK, siltation started in the rivers *Teligati, Hari, Teka, Upper Bhadra, Buri Bhadra* and *Harihar* posing a great threat to the repetition of water-logging as it happened in 2005.²¹ It was apprehended that the repetition of water-logging might start during the wet season of 2016 and it might continue onward if no measures were taken. The apprehension came true as severe water-logging took place in 2016. The TRM in *Beel Kapalia* could not be started till then.

The 2nd time survey titled **Feasibility Study and Detailed Engineering Design for Long Term Solution of Drainage Problems in the Bhabodah Area (2nd Phase)** was conducted by IWM focusing on the operation of TRM in *Beel Kapalia* and the excavation of silted rivers. BWDB again engaged IWM to carry out this study, which ended in April 2017. Unfortunately, the 2nd survey, like the 1st one, was also cancelled. Now BWDB has taken a new project to excavate 2.10 km from *Lakhaidanga* Bridge to *Teka* Bridge and 2 km from *Amdanga* Regulator to river *Bhairab*.

Although extensive projects failed, many minor projects continued. BWDB is excavating adjacent rivers and canals in this area every year as their routine work. During the last three years, 4-5 km of river *Harihar*, downstream of *Bhabadaha* Sluice Gate, has been excavated.

Table-2. Projects undertaken to solve the problem of water-logging in Bhabadaha

Sl. No.	Name of Project	Year	Funded by	Comments
1	KJDRP*	1994-95 to 2001-02	ADB	To solve the drainage problem of polder number 24 and 25
2	TRM	1997		Beel Bhaina, under Keshobpur Upazilla
3	TRM	2002 to 2004,	BWDB	Beel Kedaria under Abhaynagar and Monirampur upazila
4	TRM	2006 to 2008	BWDB	Beel khuksia, keshabpur,
5	South-west Area Integrated Water Resources Management Project	April, 2005- Dec, 2015	BWDB	Abhaynagar
6	Water Removal Project of river Kabadakha. (First Phase)	Jun, 2011- Jun, 2015	BWDB	Jessore, Khulna and Sathkhia Districts
7	Waterlogging Removal Project of Bhabadaha and adjoining beel areas under Jessore District	2012-2015	BWDB	Abhaynagar, Monirampur, Keshabpur and Sadar Upazilla
8	Waterlogging Removal Project of Aparbhadra, Harihar, Buribhadra rivers and adjoining canals under Monirampur and Keshabpur upazilas of Jessore district	Jan, 2018- June, 2021	BWDB	Monirampur and Keshabpur upazilla
9	Water Removal Project of Kabadakha river. (Second Phase)	April, 019- June, 2023	BWDB	Jessore, Khulna and Sathkhia Districts

Source: www.bwdb.gov.bd

Note: Bangladesh: Khulna-Jessore Drainage Rehabilitatio Project, Performance Evaluation Report, ADB, Nov. 2007.

Nature of Bhabadaha Water-logging

There was water-logging in *Bhabadaha* even before making polders during the 1960s. At that time, it was not a regular event. Sometimes flood-water used to create water-logging there; sometimes the saline water from the Bay of Bengal would enter the area with the high tide. After 20 years of building the polders, water-logging restored again in the 80s. Even after the reappearance of water-logging, it did not occur every year similarly.

Bhabadaha area was not waterlogged in 1972 and 1980 (Table 1). This region re-experienced the problem of water-logging in the last week of April 1984. There was no water-logging in 1985. It appeared and reappeared in three succeeding years from 1986 to 1988.²² During these years, water used to recede during dry season. In 1987 and 1988, a devastating flood inundated almost all the country. The impact of this flood was also visible in *Bhabadaha* region. During these years, water-logging in *Bhabadaha* was great not only in respect of its height but also regarding the area it affected.

There was no water-logging in *Bhabadaha* during the dry season of 1987. But the region started experiencing prolonged water-logging during the rainy season of

the same year. Until 1990, no step was taken against this problem. As a result, the area faced a miserable situation in the 1990s. During this period, the region experienced the problem of water-logging for 7 to 8 years at a stretch and there was little difference between the waterlogged situation of the dry season and that of the monsoon. The waterlogged area was 46.40% of total study area during the dry season (Table 1). After some steps (e.g., **TRM**) taken in 1998, the dimension of water-logging decreased for the next few years. For example, the waterlogged area was reduced to 18.71% of the total study area during the dry season of 2003 from 46.40% of 1997 (Table 1). However, this situation did not continue for long. Water-logging come back again in 2005 and it continued up to 2007. At this stage **TRM** was implemented and water-logging situation decreased again in 2008. Because of the discontinuation of **TRM** implementation, *Bhabadaha*'s waterlogged condition increased in 2013. The waterlogged area was 20.86% of total study area during the dry season (Table 1) but the rate increased in 2016 and 2017. Comparatively less waterlogged area was found in 2018. But from the monsoon of 2019, the condition of water-logging in *Bhabadaha* deteriorated.

Table-1. Water-logged Area in Bhabadaha in Selected Years.

Year	Total Area (ha)	Waterlogged Area (ha)	Percentage
February, 1972	20839.59	00	00
February, 1980	20839.59	00	00
February, 1987	20839.59	00	00
February, 1997	20839.59	9670.32	46.40
February, 2003	20839.59	3898.89	18.71
February, 2013	20839.59	4347.27	20.86
February, 2020	20839.59	3420.27	16.41

Source: Satellite images analyzed by the researcher.

At the beginning of 2020, the spatial dimension of water-logging decreased. The waterlogged area was 16.41% of total study area during the dry season of 2020 (Table 1). But during the monsoon in 2020, almost 50 villages of the study area went under water.²³

The Reason of Persistence of Water-logging in Bhabadaha

To Examine why water-logging persists in *Bhabadaha* region, a comparative study between the beds of the rivers next to the region and those of the marshes is required. For doing this, the height of the river-bed along with that of the marsh-bed is described in this section. Then, a comparison is made between the beds of the river and the marshes.

Height of the River-bed

Bhabadaha region is a part of the greater Ganges floodplain. The morphological

condition of the river systems of the study area is going through changes because of the heavy inputs of silt from the Bay of Bengal. Flood tide brings huge sediment into the river system during dry season and ebb tide cannot flush out this sediment load. Major siltation occurs in the river in between the tides when velocity becomes zero. Sedimentation mainly occurs in the river because silt laden tidal flow cannot spread over the floodplain because of human interventions and construction of polders and there is no upland water flow into the river system during dry season to flush out the incoming sediment. The rivers, namely *Middle-Bhadra*, *Upper-Salta*, *Hamkura* and *Jhapjapia* acted as very active flowing channels in the late eighties but now these rivers have no physical existence.²⁴ Sediment concentration in the rivers of the study area is quite high, especially during the dry season. Every river-bed is filled with silt. The bottom of the river next to the sluice gate of *Bhabadaha* is two to three meters higher than the bottoms of the upstream rivers and beds.²⁵

Height of the Marsh-bed

In order to measure the depth of the *marshes* of *Bhabadaha* area, Digital Elevation Model (DEM) is used. DEM of our study area shows that the area is lying between 0 to 18 feet above the *mean* sea

level.²⁶ The scale in Figure 2 indicates 0-18 feet, which is reflected in the main part of the figure with deep black to gray colours.

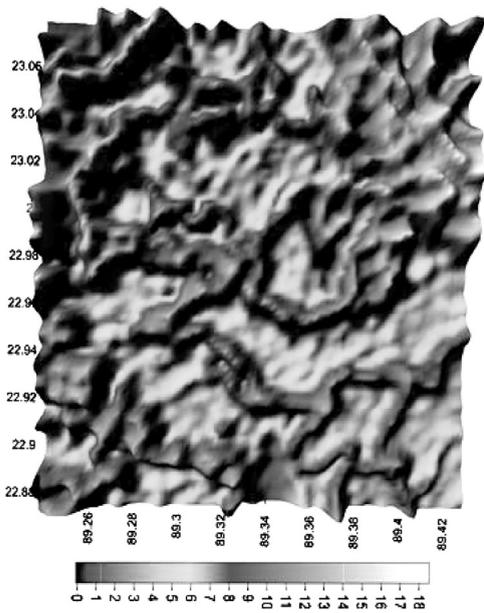


Figure 2. The Topographic Condition of Bhabadaha Region

Note: The colours on the scale show the height of land (from 0 to 18 feet) from the sea level.

Figure 2 shows that most of the study area especially low-lying marshes are within 7 feet from the mean sea level that is surrounded by villages lying in comparatively prime areas. These topographic characteristics of this region are favorable for water-logging.

Bhabadaha is topographically a plain land

of low-lying marsh areas that is shown in Figure 3 where digits indicate height from the mean sea level. The bottoms of some *marshes* like *Beel Kedaria* of *Kultia*, *Chalishia*, *Payra* and *Nehalpur* union parishad, *Beel Daharmashiahati* of *Kultia* and *Sundali* union, *Beel Bokorh* of *Sundali*, *Haridaskati* and *Kultia* union, *Beel Vaina* of *Sufalakati* and *Panjia* are almost close to the sea level.

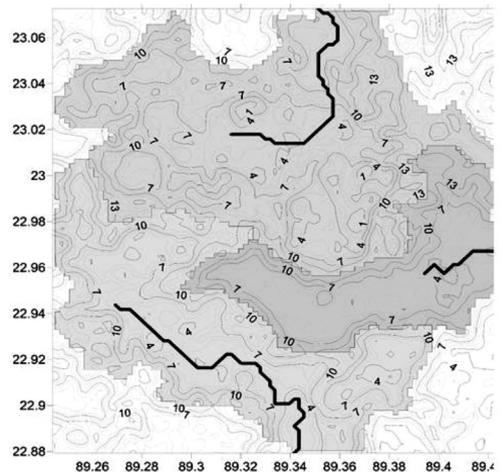


Figure 3: Area Prone to Water-logging in Bhabadaha

Areas along the bold blue lines are the lowest zones in the study area (Figure 3). That means these areas are close to the sea level. An area which is under water for a long time becomes *depressed*. Such depression has occurred in *Bhabadaha* as well. The bottom of some of the lower zones of this area has gone below the sea level but could not be shown in Figures 2

and 3 as DEM counts from 0 that stands for the sea level.

Comparison

The heavy load of silt carried by the tides settled on the riverbeds has gradually risen above the level of the lands within the polders and closed the exits of the sluice gates. Simultaneously, the inside of the polders has continued to subside without the compensating silt deposits. According to the IWM field measurements (2016), the bottom of the river next to the sluice gate of *Bhabadaha* is two to three meters higher than that of the marshes. The mismatch of the heights is shown in Figure 4.

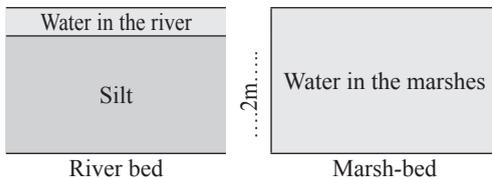


Figure 4: Comparison between the Heights of the River-bed and the Marsh-bed

The silt accumulated at the exits of the sluice gates denies the entry of the tides into the polders. As tides cannot enter the polders, they cannot carry silt with them to compensate the depression of the marsh-beds and maintain the balance. Besides, this silt chokes the water flowing to the downstream. Because of this characteristic, water-logging

in Bhabadaha has become almost a permanent problem that can't be removed naturally.

Conclusion

Silt has appeared as the major driving force in *Bhabadaha* water-logging. The riverbeds are raised because of this silt. On the other hand, the marsh-beds are depressed because of the lack of this silt. Water from the marshes cannot flow out because it is obstructed by the silt accumulated at the exits of the sluice gates. Similarly, water that can carry silt inside cannot enter the polders because of the same reason. So, the first thing needed to solve the water-logging problem is to realize the fact that the deposition of silt along with the lack of water-flow has damaged of the *Mukteswari-Teka-Hari* drainage system. To address this problem, the height of the river-beds should be decreased. At the same time, the height of the bottom of the waterlogged areas should be increased above the sea level. TRM has proved effective because it performs this dual function; it deposits silt at the bottom of the low-lying marshes raising their height and increases the flow of river water and solve the problem of drainage congestion. Future steps for solving the problem of *Bhabadaha* water-logging should be taken considering this reality.

References

1. Tahmina Rahman and Khondaker Hasibul Kabir, 'Effects of Embankments on the Habitation of the Southwestern Coastal Region of Bangladesh,' *Asian Journal of Environment and Disaster Management* 5, no. 1 (2013). Pp. 69
2. Mehedi Al Masud, Nurun Naher Moni and Abul Kalam Azad, 'Impacts of Water Logging on Biodiversity- Study on South-Western Region of Bangladesh,' *IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology*, Volume 8, Issue 9. Ver.1 (Sep.2014), Pp. 20
3. Ibid
4. Syed M. Tareq, M. Tauhid Ur Rahman, Syed Zia Uddin, A.F.M Jamal Uddin. 'Water-logging Threaten Biodiversity along the South-West Coastal Region of Bangladesh'. *International Journal of Business, Social and Scientific Research*, Volume 4, Issue 3, April-June 2016, Pp. 203
5. Tapan Biswas, 'Bhabadaha: Biponnaman obotarkrondan,' *Ganamukti*, Astamudyog, May, 2007. Durgata Janagosthisonkhya, Pp. 168
6. 'Waterlogging in the Southwest region of Bangladesh,' *IFI Watch, Bangladesh*, vol. 3, no. 2, December 2006, Pp. 4
7. Data collected from FGDs arranged in July, 2020
8. 'Waterlogging in the Southwest region of Bangladesh,' *IFI Watch, Bangladesh*, vol. 3, no. 2, December 2006, Pp. 4
9. 'Water-logging in the Southwest Region of Bangladesh,' *IFI Watch, Bangladesh*, vol. 3, no. 2, December 2006, Pp. 4
10. Bangladesh: Khulna-Jessore Drainage Rehabilitation Project, Performance Evaluation Report, ADB, Nov.2007, Pp. 40-41
11. Rocky et. al, '*Polder to De-polder: an Innovative Sediment Management in Tidal Basin in the Southwestern Bangladesh*,' (Department of Civil and Earth Resources Engineering, Kyoto University), DPRI Annuals, no. 61 B, 2018, Pp. 4
12. Final Report, 'Feasibility Study and Detailed Engineering Design for Long Term Solution of Drainage Problems in the Bhabodah Area (2nd Phase),' IWM, Bangladesh Water Development Board, April 2017, Pp. 20
13. Rocky et al, '*Polder to De-polder: an Innovative Sediment Management in Tidal Basin in the Southwestern Bangladesh*,' (Department of Civil and Earth Resources Engineering, Kyoto University), DPRI Annuals, no. 61 B, 2018, Pp. 5
14. Final Report, 'Feasibility Study and Detailed Engineering Design for Long Term Solution of Drainage Problems in

- the Bhabodah Area (2nd Phase),’ IWM, Bangladesh Water Development Board, April 2017, Pp. 21
15. Ibid, Pp. 21
16. Rocky et al, ‘Polder to De-polder: an Innovative Sediment Management in Tidal Basin in the Southwestern Bangladesh,’ (Department of Civil and Earth Resources Engineering, Kyoto University), DPRI Annuals, No. 61 B, 2018, Pp. 5
17. Final Report, ‘Feasibility Study and Detailed Engineering Design for Long Term Solution of Drainage Problems in the Bhabodah Area (2nd Phase),’ IWM, Bangladesh Water Development Board, April 2017, Pp. 22
18. Ibid, Pp. 22
19. Ibid, Pp. 23
20. Tapan Biswas, ‘Bhabadaha: Biponnamano botarkrondan,’ *Ganamukti*, Astamudyog, May, 2007. Durgata Janagosthisonkhya, Pp. 167
21. ‘Jashore Khulnar Dukkho BhabadaheAbaro Sthayee Jolaboddhota,’ *Vorerdak*, September 14, 2020. Accessed November 23, 2020. <https://bhorer-dak.com/>
22. Final Report, ‘Feasibility Study and Detailed Engineering Design for Long Term Solution of Drainage Problems
- in the Bhabodah Area (2nd Phase),’ Bangladesh Water Development Board, April 2017, Pp. 24
23. Ibid, Pp. 24
24. Topography of a Apecific Area is the Most Important Phenomenon for Its Ecological and Physical Environment. DEM can measure the topographic condition of an area.
25. Ibid, Pp. 24
26. Topography of a Apecific Area is the Most Important Phenomenon for Its Ecological and Physical Environment. DEM can measure the topographic condition of an area.



Impact of COVID-19 Pandemic on Adolescent Mental Health A Brief Review

Dr. Mrinal Mukherjee

Abstract

The present Covid-19 pandemic crisis has no precedent and affected almost every sphere of life severely and mental health of adolescent probably worst affected which might have sustained impact, if not addressed with immediacy, considering the collective vulnerability of the community as a whole especially adolescent. Mental health matters as it affects our relationships and our wellbeing and it determines how we learn and our productivity. Adolescent Mental Health was already fragile and susceptible globally even before COVID-19 pandemic triggered. The COVID-19 is making the population including adolescent nervous and pushing them into a state of high stress leading to depression, anxiety, panic, disappointment and the people are showing weakness, fatigue, poor sleep. Evidence has suggested that the current level of behavioral and emotional problems in teenagers during pandemic is higher than in the past. There is no doubt that amplification of misinformation created of 'infodemic' and became a causal factor in intensifying the mental trauma and stress. COVID-19 has been found to be associated with adolescents' mental health changes, especially the fear of COVID-19. Though there is a growing body of literature particularly on the issues of adolescents' mental health in prolonged COVID-19 caused pandemic, but it demands more research attention. Research studies show the demands of extensive empirical studies to provide evidence-based, age-appropriate services for long-term capacity building of mental health services for adolescents to develop a resilient community.

Dr. Mrinal Mukherjee

Assistant Professor

Department of Teacher Education

The West Bengal University of

Teachers' Training Education

Planning and Administration (WBUTTEPA)

West Bengal, India

e-mail: dr.mmrinal@gmail.com

Keywords

Covid-19 pandemic, Mental health, Adolescent, Resilient Community

Introduction

Mental health of people severely impacted by the COVID-19 caused pandemic has not been sufficiently addressed,¹ and it is furthermore serious issues for children and adolescent. Any mass tragedies, like extreme probability of infection and death from diseases outbreak may stimulate waves of panic heightened fear and anxiety that are supposed to provoke extreme disruptions to the behavioral pattern and psychological well-being of too many members of the population.^{2,3} COVID-19 is making the population especially nervous and pushing them into a state of high stress because of the excessive rate of infection and mortality leading to depression, anxiety, panic, disappointment and the people are showing weakness, fatigue, poor sleep. These psychosomatic and behavioral responses to stress are a psychological mechanism for self-defense.⁴ Considering the expert observation, we assume that up to 70% of the world's population immediately need psychological care along with medical treatment with their COVID-19 infections.⁵ Recent survey on Chinese population showed that the prevalence rate of traumatic stress was at an alarming 73.4%, depression was at

50.7%, generalized anxiety was at 44.7%, and 36.1% case of insomnia.⁶ During the COVID-19 outbreak, along with healthcare workers, younger members of the population were in high-risk group exhibiting alarming symptoms of psychological stress.⁷ The differential impact of the disaster on the society needs to be recognized and addressed. There are tremendous possibilities that a substantial number of children and adolescent would emerge as victims of such disaster as posed by pandemic COVID-19.

Adolescent Mental Health was already fragile and susceptible globally even before COVID-19 pandemic triggered. Mental health conditions handle 16% of the disease and injury for the people aged 10-19 years and suicide is the third leading cause of death in 15-19-year-olds. Deviation of an individual's mental well-being can adversely compromise the capacities and choices, leading not only to diminish functioning at the individual level but also broader welfare losses at the household and societal level.⁸ Mental health is an essential part of holistic wellbeing. The general well-being of adolescents has been considerable debate in recent years.⁹ Evidence has suggested that the current level of behavioral and

emotional problems in teenagers during the pandemic is higher than in the past. Though there is a growing body of literature particularly on the issues of adolescents' mental health in prolonged COVID-19 caused pandemic, but it demands more research attention and public debate. Therefore, a brief review of the context of adolescents' mental health is pertinent.

Pandemic Context of Mental Health of Adolescent

UNESCO (2020)¹⁰ in its report has been apprehending with a projection that nearly 24 million children may not return to education estimating including 180 countries of the world after 2020 because of social disaster caused by COVID-19 pandemic. In an unprecedented situation, 188 countries have imposed countrywide closures, affecting over 1.5 billion children and youth. Thus school closures have affected over 90 percent of total enrolled learners, or about 1.6 billion students. Many schools have moved online with distance learning, but nearly half the world has no access to the Internet, leaving many students even further behind. Besides education benefits, schools provide critical social protection resources for children and their families. School closure thus raises many concerns around vulnerability. While it may limit

fallout from schooling disruption for most children, this may not be true for those in poor households and in areas most intensively hit by COVID-19. Evidence about child labour rising as schools close during the global shutdown is gradually mounting.¹¹

In the same note, UNICEF cautioned and highlighted the factors that might contribute to violence towards children that might lead to mild to moderate mental health problem. Long-term isolation from society and quarantines posing the children and adolescent in conflict and violence at home, and most times, it has amplified the probability of sexual exploitation and rate of unlawful prior marriage increased rapidly. Sometimes, social stigma may lead to discrimination for individuals and groups suspected of being infected. There are many instances in south-east Asian context which shows such discrimination aggravates violence against children. The data shows even before COVID-19 caused pandemic in India there are 30 million out-of-school children and strikingly 40% of them were adolescent girls.¹² It has been projected that such an extension of school closure may cause 10 million secondary school girls to discontinue their education globally where India will have lion share of it. Child marriage is highest in India in terms of number and CHILDLINE India has

reported in mid-pandemic 17% increase in distress calls related to prior marriage in June to July 2020 than previous year.¹³ Such social disaster might have negatively impacted the children in several ways and majorly the psychological impact is most challenging. Kola (2020) in the article Published 'The Lancet'¹⁴ says, the psychosocial burden of Covid-19 will become increasingly clear and intensified as the effects of social measures such as physical distancing, loneliness, death of friends and family members, and job losses manifest. Besides worries and anxieties related to COVID-19, the economic situation has worsened with high and rising levels of unemployment in all affected countries. This has put a lot of pressure on children, adolescents and their families which could cause distress, mental health problems and violence.¹⁵ Ensuring child safety in terms of their mental health is an enormous challenge, but it is an urgency to restrict the long-term effects of the mental health of adolescent. So an urgent review demands understanding the immediate effect of pandemic and also to identify the risk and resilient factors that may protect the state of mental health of adolescent and need to document what kind of response has been adopted. In this context, it's prime time to identify the impact of COVID-19 caused pandemic on adolescent mental health.

Impact of COVID-19 Pandemic on Mental Health

The general pool of population had already been suffering from fragile mental health conditions, thus the COVID-19 pandemic, made people of Indian subcontinent the worst sufferers of mental health problems¹⁶ and United Nations¹⁷ (2020) in one of its report claimed that specific population groups are uniquely susceptible of the COVID-19-induced psychological distress while adolescent children could be most susceptible.

Adolescent is defined as individuals in the 10–19 years age group in which it is a vulnerable age group to develop negative mental health impairment because they are very sensitive to psychological and social transformation.¹⁸ Adolescent experiences higher peer interaction and social world than with their family, and even forms complex peer relationship compared to their younger counterparts such as babies and children.¹⁹ Most adolescents were exposed to physical distancing, lockdown, or quarantine during this pandemic of COVID-19. The adolescents' mental health changes can be variative based on their circumstances and motivation to obey physical distancing. And it has been found that prevalence of mild-to-severe depressive and anxiety symptoms in Chinese adolescents during

COVID-19 outbreak was 43.7% and 37.4% respectively.²⁰

UNICEF (2020) published a report entitled 'The impact of COVID-19 on the mental health of adolescents and youth' claims 27% reported feeling anxiety and 15% depression, 46% report having less motivation to do activities they usually enjoyed and 73% have felt the need to ask for help to concern their physical and mental well-being, despite this, 40% did not ask for help. Obsessive-compulsive disorder (OCD) was largely associated with adolescent symptoms of mental disorder and such behavioral changes might be due to fear of COVID-19.²¹ The reasoning behind it was because of the fear of this disease, adolescents will start a washing and hoarding obsession.

Sudden shutdown of school and continuation of such closure have reduced the access to mental health screening and care for already vulnerable adolescent community. Mental Health services are always difficult to access and not user friendly and it has become more challenging globally, especially for a marginal section in developing countries for adolescent in the COVID-19 context. There is a widespread tendency to confound psychological distress and its expression of sadness, anxiety, and anger and mental disorder and this is associated

with more individual vulnerabilities.

Prolonged confinement in home during extended phase-wise lockdown indulges for adolescent to engage with the internet in increasing magnitude, though parents are concerned about the effect of school closure and increased internet use on their children's mental health but it is difficult for parents to control this access. Such unsupervised internet use is associated with self-harm and suicidal behaviour in adolescents with psychological risk factors which are relevant in case of COVID-19 caused pandemic too. Research reported that pandemics cause stress, worry, helplessness, and social and risky behavioral problems among children and adolescents, for example, substance abuse, suicide, relationship problems, academic issues, and absenteeism from work.²² A recent study as reported in a review article by in Indian context, which claims that after speaking with 1,102 parents and primary caregivers, it was found that over 50 percent of children had experienced agitation and anxiety during the lockdown.²³ Media reports show that they may experience fears about the virus, worries over access to online classes, and stress and irritability from being unable to go out. Many have faced violence in their homes or have been victims of cyber bullying. Though medical impact of COVID-19 on adolescents is limited

but they are experiencing acute and chronic stress because of parental anxiety, disruption of daily routines, increased family violence, and home confinement with little or no access to peers, teachers, or physical activity.²⁴ Anxiety, lack of peer contact and reduced opportunities for stress regulation are major concerns in such extended school closure. Further concern is an increased risk for parental mental illness, domestic violence and child maltreatment. Especially for children and adolescents with special needs or disadvantages, such as disabilities, trauma experiences, existing mental health problems, migrant background and low socioeconomic status, this may be a challenging time.¹⁵ It has been showed that compared to adults, this pandemic may continue to have increased long term adverse consequences on the children's and adolescents' mental health. As the pandemic continues, it is important to monitor the impact on children's and adolescents' mental health status and how to help them improve their mental health outcomes in the time of the current or future pandemics.²²

UNICEF²⁵ (2020) summarized in the draft titled '**Technical Note on Covid-19 and Harmful Practices**' the impact of pandemic COVID-19 on mental health include:

1. Distress because of the death or illness of or separation from family members or caregivers.
2. Fear, panic and stress in the community.
3. Worsening of pre-existing mental health conditions aggravated by stress and violence in the household.
4. Increased substance use and risk taking by adolescents.
5. Pressure on or lack of access to mental health and psychosocial support services.

Discussion:

COVID-19 is an unprecedented infectious disease which has taken a massive toll on life in terms of deaths. Sudden changes in life practices in lockdown and sustained quarantine and in reality in physical distancing along with the loss of near ones, might have taken a toll on mental and emotional health. Although there has been several studies in the past trying to explain how quarantine and isolation affect mental health, the extent on how far adolescents' mental health is affected is insufficiently known.²⁶ There is no doubt that amplification of misinformation created of 'infodemic' and became a causal factor in intensifying the mental trauma and stress. COVID-19 has been found to be associated with adolescents' mental health

changes, especially the fear of COVID-19 in a population with adequate exposure of COVID-19 was proved to create adverse mental health conditions and adolescents are worst suffered.

In the darkness there are some rays of hope too. Some preventive and protective methods were found to instrumental for adolescents to stay away from any adverse impacts of mental health because of COVID-19. Physical-psychosocial support provision, adequate and accurate information from a credible source about COVID-19, and excellent motivation to obey physical distancing has shown to decrease the likelihood of negative mental health changes in adolescent. The body of research already accumulated in such context has favored the expectations that psychiatrist, pediatrician, parents, and others who take care of adolescents can raise awareness to detect changes in mental health in order to decrease adverse impacts in adolescent's future life. In countries of Indian subcontinents, especially for socioeconomically disadvantaged group, the school environment is more enriching than the home nutritionally, emotionally, and developmentally. Therefore, school closure has seriously disrupted adolescent lives in the countries of this region and deprivation from regular schooling making identifiable impacts on adolescent mental health.

The major issue related to the pandemic that has disrupted the delivery of mental health services in global scale also relevant for countries of Indian subcontinent. These low and middle-income countries, has a relatively weak infrastructure of mental healthcare. Massive caseloads of Covid-19 have further burdened the already fragile mental healthcare, and this explains why more and more people of this region are complaining of Covid-19-related anxiety in surveys. There are many mental health threats associated with the current pandemic and subsequent restrictions in near future. Psychiatrists, especially having expertise in addressing adolescent mental health, need to ensure continuity of care during all phases of the pandemic. COVID-19-related mental health risks will disproportionately affect adolescents who are already disadvantaged and marginalized. To identify and support the adolescents at risk of mental disorders, health support staff who are in frontline of COVID-19 community screening teams could be encouraged and empowered to identify the pattern of changes in behaviour, substance use, and excessive isolation among adolescents. Teachers and other staff of the schools along with the parents may be trained effectively to identify symptoms that show poor mental health, for example, sleep disturbances, excessive anger, and difficulty

concentrating. If the mental health needs of adolescent can be mitigated by mental health professionals, either visiting or interacting physically or using tele-mental health modalities have shown promising results in recent case studies. The entire episode of COVID-19 caused pandemic is unique in terms of experiment on mental health that demands research exploration to develop reciprocal strategies that are needed of the adolescent. The present re-reading of research studies shows the demands of extensive empirical studies to provide evidence-based, age-appropriate services for long-term capacity building of mental health services for adolescents.

Reference:

1. Sherman A. Lee (2020): Coronavirus Anxiety Scale: A Brief Mental Health Screener for COVID-19 Related Anxiety, *Death Studies*, DOI: 10.1080/07481187.2020.1748481 <https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1748481>
2. Balaratnasingam, S., &Janca, A. (2006). Mass Hysteria revisited. *Current Opinion in Psychiatry*, 19, 171–174.
3. Su, T. P., Lien, T. C., Yang, C. Y., SU, Y., WANG, J., TSAI, S., & YIN, J. (2007). Prevalence of Psychiatric Morbidity and Psychological Adaptation of the Nurses in a Structured SARS Caring Unit During Outbreak: A Prospective and Periodic Assessment Study in Taiwan. *Journal of Psychiatric Research*, 41(1–2), 119–130. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2005.12.006>
4. Yenan Wang, Yu Di, Junjie Ye & Wenbin Wei (2020): Study on the Public Psychological States and Its Related Factors During the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Some Regions of China, *Psychology, Health & Medicine*, DOI: 10.1080/13548506.2020.1746817 <https://doi.org/10.1080/13548506.2020.1746817>
5. Axelrod, J. (2020). Coronavirus May Infect up to 70% of World’s Population, Expert Warns. Retrieved from <https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-infection-outbreakworldwide-virus-expert-warning-today-2020-03-02/>
6. Liu, S., Yang, L., Zhang, C., Xiang, Y., Liu, Z., Hu, S., & Zhang, B. (2020). Online Mental Health Services in China During the COVID-19 Outbreak. *The Lancet Psychiatry*, 7(4), e17–e18. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30077-8](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30077-8)
7. Yeen Huang & Ning Zhao (2020): Mental Health Burden for the Public Affected by the COVID-19 Outbreak in China: Who will be the High-risk Group?, *Psychology, Health & Medicine*, DOI: 10.1080/13548506.2020.1754438 <https://doi.org/10.1080/13548506.2020.1754438>
8. WHO. (2012, August). Risks To Mental Health: An Overview of Vulnerabilities and Risk Factors. Background Paper by WHO Secretariat for The Development of

- A Comprehensive Mental Health Action Plan. Retrieved 12 May, 2020 from https://www.who.int/mental_health/mhgap/risks_to_mental_health_EN_27_08_12.pdf
9. Mukherjee, M. (2020) Challenges of Mental Wellbeing of Digital Native Adolescent: Promotion of Mental Health. *BL College Journal*. Volume -2, Issue-1, 2020. ISSN: 2664228X Published by Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh.
 10. UNICEF (2020). The Impact of COVID-19 on the Mental Health of Adolescents and Youth. <https://www.unicef.org/lac/en/impact-covid-19-mental-health-adolescents-and-youth>
 11. UNICEF, ILO, (2020), COVID-19 AND CHILD LABOUR: A TIME OF CRISIS, A TIME TO ACT
 12. MALALA FUND Report, 2020. <https://malala.org/countries/india>
 13. BBC NEWS. India (2020) India's Covid Crisis Sees Rise in Child Marriage and trafficking. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54186709#product-navigation-more-menu>
 14. Kola, L. (2020) Global Mental Health and COVID-19. *The Lancet Psychiatry*. *The Lancet Psychiatry*. VOLUME 7, ISSUE 8, P655-657 DOI: [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30235-2](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30235-2)
 15. Fegert JM, Vitiello B, Plener PL, Clemens V.(2020). Challenges and Burden of the Coronavirus 2019 (COVID-19) Pandemic for Child and Adolescent Mental Health: a Narrative Review to Highlight Clinical and Research Needs in the Acute Phase and the Long Return to Normality. *Child Adolesc Psychiatry Ment Health*. 12;14:20. doi: 10.1186/s13034-020-00329-3. PMID: 32419840; PMCID: PMC7216870
 16. Mukherjee, M & Maity, C. (2021): Influence of Media Engagement on the Post-traumatic Stress Disorder in Context of the COVID-19 Pandemic: an Empirical Reflection from India, *Journal of Human Behavior in the Social Environment*. <https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1833806>
 17. United Nations (2020) Policy Brief: COVID-19 and the Meed for Action on Mental Health. United Nations Sustainable Development Group. <https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/UNPolicy-Brief-COVID-19-and-mental-health.pdf>.
 18. Sawyer SM, Azzopardi PS, Wickremarathne D, Patton GC (2018) The age of Adolescence. *The Lancet Child & Adolescent Health*. 2(3):223–8. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(18\)30022-1](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(18)30022-1)
 19. Octavius, G. S. Silviani, F.R. Lesmandjaja, A. , Angelina and Juliansen, A. (2020) Impact of COVID-19 on Adolescents' Mental Health: a Systematic Review. *Middle East Current Psychiatry* 27:72 <https://doi.org/10.1186/s43045-020-00075-4>

20. Jiang S, Li Z, Zhang G, Lei L, Zhao W, Guo C et al (2020) Prevalence and Socio-Demographic Correlates of Psychological Health Problems in Chinese Adolescents During the Outbreak of COVID-19. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 29:749–758 Available from. <https://doi.org/10.1007/s00787-020-01541-4>
21. Seçer İ, Ulaş S (2020). An investigation of the Effect of COVID-19 on OCD in Youth in the Context of Emotional Reactivity, Experiential Avoidance, Depression and Anxiety. *Int J Ment Heal Addiction*:1–14. <https://doi.org/10.1007/s11469-020-00322-z>
22. Meherali S, Punjani N, Louie-Poon S, Abdul Rahim K, Das JK, Salam RA, Lassi ZS. (2021) Mental Health of Children and Adolescents Amidst COVID-19 and Past Pandemics: A Rapid Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 26;18(7):3432. doi: 10.3390/ijerph18073432. PMID: 33810225; PMCID: PMC8038056.
23. Balaji, M. and Patel, V. (2021). Mental Health and COVID-19 in India. <https://idronline.org/mental-health-and-covid-19-in>
24. Patra, S. and Patro, B.K. (2020). COVID-19 and Adolescent Mental Health in India. *The Lancet Psychiatry*. VOLUME 7, ISSUE 12, P1015. DOI:[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30461-2](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30461-2)
25. UNICEF (2020). For Every Child. TECHNICAL NOTE ON COVID-19 AND HARMFUL PRACTICES.
26. Imran N, Zeshan M, Pervaiz Z (2020). Mental Health Considerations for Children & Adolescents in COVID-19 Pandemic. *Pak J Med Sci*. 36:67–72



Sustainable Development Goals and Socially Excluded Groups: End of Poverty and Inequalities in Marginalised People

Dr. Dilip Kumar Bhuyan

Abstract

This paper is an attempt to understand the situation of poverty and inequalities that exists in the country in the context of economic, social, and political dimensions of social exclusion and poverty. The concept, social exclusion with the conventional notions of poverty and marginalization, social exclusion overlaps with poverty. It is shown that the concept has universal validity although it has not gained much attention in developing countries. More recently, the European debate on social exclusion and work undertaken at the International Institute of Labour Studies (IILS) suggest that social cohesion should also be regarded as one of the main dimensions of development. Social exclusion was originally developed in France by sociologists. In French Republican thought, it refers to a process of Social Disqualification (Paugam, 1993) or Social Disaffiliation (Castel, 1995) leading to a breakdown of the relationship between society and the individual. In this sense, social exclusion is deeply rooted in the Republican tradition of solidarity in which the State plays a major role. The French notion of social exclusion is linked to this tradition where integration is achieved by key state institutions (Ion, 1995). In recent years in particular, in the context of globalization and changing economic conditions, social exclusion is related to the deep economic restructuring necessitated by growing competition in the emerging global economy. In this paper, our primary task is thus to give an overview of the concept of social exclusion and to distinguish it from the more conventional notions of poverty and marginalization and the role of Sustainable Development Goals (SDGs) in ending poverty and inequalities in the state of socially excluded groups with special reference to the two marginalized groups i.e. Thengal Kachari and Kaibratra of Assam in India.

Dr. Dilip Kumar Bhuyan

Assistant Professor

Department of Sociology

Kherajkhata College

Lakhimpur, Assam, India

e-mail: dilipkrbhuyan67@gmail.com

Keywords

Social Exclusion, Poverty, SDGs, Thengal Kachari, Kaibratra, inequality

1. Introduction

In India, the current debate that dominates the Indian state is about whether the country will be given a member of the elite Nuclear Group or not. The Indian government, which considers itself to be the fastest economy in the world, is pushing through an agenda of growth that opens up all doors for private capital investment- both domestic and foreign. In the country, like many other economies, GDP rates and foreign direct investments are considered to be the magic mantras of development. The last couple of years has seen very disturbing events in the country where *hatred* and *divisive politics* have overshadowed the economic growth. The government has been trying to project a face of growth through numerous high-profile projects such as *Smart City*, *Digital India*, *Bullet Train*, *Interlinking of Rivers* so on and so forth. However, the fact remains that from villages to university campuses, from drought-prone areas to flood-affected zones, disparities, discrepancies, and disturbances are growing in number and spread. Because India, a country of stark contradictions and growing inequalities. Ironically, the government's social spending is gradually going down. However, subsidies to rich

corporate houses are on an increasing trend. Peace is an important one of aspects for growth to be humane, needs to be pursued by governments. According to the Global Peace Index, 2016 India has placed at 141 ranks out of 163 countries. It means that India is less peaceful than other countries like Burundi and Burkina Faso. For a government like India, both historic aspects like the *caste system* and current trends like *communal hatred* need to be eliminated if the country is serious about growth. It may be noted that Amartya Sen rightly said that the caste system in India is anti-national and that all such divisions need to be eliminated if a nation has to progress.

Social exclusion with the conventional notions of poverty and marginalization thereby the social exclusion overlaps with poverty. It is shown that the concept has universal validity although it has not gained much attention in developing countries. More recently, the European debate on social exclusion and work undertaken at the IILS suggest that social cohesion should also be regarded as one of the main dimensions of development. Thus 'what has been happening to social exclusion' is a fundamental question that needs to be asked about development

and its style and pattern, although the problems of marginalization, poverty, and exclusion have been on the agenda in developing countries like India. Therefore, it may be relevant to ask why developing countries have not considered the concept of social exclusion. Does it have something to do with different levels of development, and different perceptions of the relative weight which should be attached to economic, social, and political dimensions of poverty and deprivation? As the concept of poverty has been redefined to include not only economic but also social dimensions, can one say that social exclusion is simply an extension of the poverty concept?

It may be stated here that the economic aspects of exclusions are just as important as the sociological and the political aspects. In broadening the poverty and exclusion concepts, one has to consider whether such a multi-dimensional approach might have superior analytical power over the more conventional approaches to poverty and destitution. It will appear a quite number of questions: what is the difference between social exclusion and poverty? How are the two interrelated? Is social exclusion a European concept or does it have global relevance? Is it more a distributional than a relational issue? And finally, how

can the concept be used as a tool for policy-making and implementation? In this context, the relevance of the precariousness of employment as an indicator of social exclusion is examined. This series of questions is by no means easy to answer. Therefore, an attempt only to provide some tentative pointers to what may be plausible elements of an analytical and operational framework for studying exclusion regarding economic, social, and political dimensions. Social exclusion is a complex and multi-faceted notion. It refers to both individuals and societies, and disadvantage, alienation, and lack of freedom. Thus, we try to depict a theoretical content to the concept of social exclusion and to distinguish it from the more conventional notions of poverty and marginalization.

2. Objectives

The Paper Formulates Itself to the Following Objectives

(a) To look into the nature, extent, and implications of poverty and social exclusion among (1) Thengal Kachari (Tribal), and (2) Kaibatra (Scheduled Caste). In terms of accessibility to and utilization of (i) basic amenities, i.e. food and nutrition security, water, shelter (ii) health and sanitation, (iii) education and development, (iv) livelihood.

(b) To chalk out suggestive roles of sustainable development to the socially excluded groups in the perspective of SDGs.

3. Methodology

This paper based on primary data and analysis is an academic perspective. After giving a general background on exclusion and poverty, it focuses on two socially excluded groups of Assam in India. The paper intends to cover the tribal groups (Thengal Kachari), and Kaibratra (Scheduled Caste). Looking at the SDGs as an opportunity to fight exclusion and poverty for the groups, the paper makes some general recommendations of action that the organizations involved initiate.

4. Results and Discussion

4.1. Understanding Social Exclusion

Exclusion is a multi-dimensional process covering social, economic, cultural, and political domains. Exclusion is linked to the recognition of social identities, resource allocations, and power relations. Marshal Wolf talks about various kinds of social exclusion from livelihood, exclusion from social services, welfare and security networks, exclusion from political choice, exclusion from popular organization and solidarity, and exclusion from an understanding of what is happening (Wolf, 1995). Social exclusion

refers to both individual exclusion and group exclusion from society, other groups, or individuals. It results in the denial of access to opportunities, public goods, public offices and institutions, and self-respect in the public spheres. It is argued that “social exclusion is about the inability of our society to keep all groups and individuals within reach of what we expect as a society..... or to release their full potentials” (Power and Wilson, 2000). The socially excluded are deprived of social recognition, self-respect, and social values. The basis of exclusion can be race, gender, ethnicity, religion, language, region, or caste. Each form of exclusion has its nature and manifestation.

The current debatable issue of social exclusion is usually related to the problem of equal opportunity. On account of this, it may be noted here that though modern liberal democracies, such as India, formally recognize full citizenship, very often it creates unequal citizenship in actual practices as the structural accommodation through citizenship and affirmative action policies fail to bring about the desired change or transformation or development. By commenting Charles Tylor argues that there is an inbuilt tendency towards exclusion in liberal democratic states “arising from the fact that democracies work well when people know one another, trust one another, and

feel a sense of commitment toward one another” (Tylor, 1998). In this regard, it can be pointed out that human history is a history of struggle for an equal share in public resources and equal opportunity for occupying public institutions.

Social exclusion was originally developed in France by sociologists. In French Republican thought, it refers to a process of ‘Social Disqualification’ (Paugam, 1993) or ‘Social Disaffiliation’ (Castel, 1995) leading to a breakdown of the relationship between society and the individual. In this sense, social exclusion is deeply rooted in the Republican tradition of solidarity in which the State plays a major role. The French notion of social exclusion is linked to this tradition where integration is achieved by key state institutions (Ion, 1995, quoted from Bhalla, A and Lapeyre, F, 1997). The European Commission emphasizes the idea that each citizen has the right to a certain basic standard of living and the right to participate in the major social and occupational institutions of the society— employment, housing, health care, education, and so on. Social exclusion occurs when citizens suffer from disadvantages and are unable to secure these social rights. In recent years in particular, in the context of globalization and changing economic conditions, social exclusion is related to the deep economic restructuring necessitated by growing

competition in the emerging global economy. As such it can be summed up that social exclusion is a complex and multi-faceted notion. It is, therefore, not comprising that many people have used the term rather loosely. Despite this, we would try to give theoretical content to the concept of social exclusion and to distinguish it from the more conventional notions of poverty and marginalization in the context of economic, social, and political dimensions.

4.2. Conceptualizing Poverty

The concept of social exclusion is close to the concept of poverty. It is a concept that has evolved to include economic, social, and, to some extent, political aspects. Lipton and Maxwell (1992) clearly show how the new conceptualization of poverty also embraces such elements as the importance of civil society and security of livelihood: there has been significant change..... since the 1970s... less weight is put in the current literature on income and consumption and more on the complex, multi-dimensional concepts of livelihood and livelihood security...the perceptions of poor people themselves are also prominent in this definition.... This new perspective allows us to measure and evaluate the level of vulnerability....and freedom from bias by gender and age.... of individual’s access to privately and

publicly provided goods and services and to common property. Townsend (1993) defines poverty in terms of 'relative deprivation' as a state of observable and demonstrable disadvantage relative to the local community or the wider society or nation to which an individual, family or group belongs. He distinguishes between material deprivation (from food, clothing, housing, and so on) and social deprivation (family, recreational and educational).

Thus, poverty is covered both economic and social aspects of deprivation. Both aspects are very relevant to the notion of social exclusion. In this regard, commented by Room (1995) that poverty is primarily focused on distributional issues while social exclusion focuses primarily on relational issues.

The social problems associated with exclusion are partly income-determined. In a market economy, the abundance of basic needs, goods are not much consolation to those who do not have the means to buy them. Thus, the distributional dimension also reflects the opportunities to achieve valuable 'functioning' and should not be considered as dimensional. Adequate levels of income are necessary though not a sufficient means of ensuring access of people to basic human needs.

The idea of social exclusion has conceptual connection with well-established notions

in the literature on poverty and deprivation, and has antecedents that are far older than the specific history of the terminology might suggest. "The contribution made by the new literature on social exclusion by placing in the broader context of the old—very aged—idea of poverty as capability deprivation. The view of poverty as capability deprivation (that is, poverty is seen as the lack of the capability to live a minimally decent life). The capability perspective on poverty is inescapably multidimensional since there are distinct capabilities and functioning that we have reason to value." (Sen 2000) Therefore, Sen (1981) has stated that hunger and starvation relate to entitlement failure that can result from a variety of causes. To consider a few alternatives viz.

- (1) hunger caused by a crop failure that makes a peasant family lose its traditional food supply;
- (2) hunger resulting from unemployment through the loss of purchasing power;
- (3) hunger induced by a fall in real wages as a result of relative price changes, resulting from asymmetric increase in the economic power of, and increased food demand from, other groups; and
- (4) hunger precipitated by the removal of food subsidies to a particular group on which that group may standard rely.

These points can be summarized as being excluded from enjoying a normal crop; being excluded from employment; exclusion from the food market because of low purchasing power; exclusion from food subsidy arrangements.

4.3. Effects of Poverty

Sen (1997) has discussed some of the other effects other than the loss of income, with the help of the idea of social exclusion.

- a. Loss of current output:** Unemployment involves wasting productive power since a part of the potential national output is not realized because of unemployment. This magnitude can be quite large when unemployment rates are very high.
- b. Skill Loss and Long-run Damage:** People not only ‘learn by doing’, they also ‘unlearn by not doing’, but that is also by being out of work and out of practice. In addition to the depreciation of skill through non-practice, unemployment may generate a loss of cognitive abilities as a result of the unemployed person’s loss of confidence and sense of control. In so far as this leads to the emergence of a less skilled group— with merely a memory good skill— there is a phenomenon here that can lead to a future social exclusion from the job market.
- c. Loss of Freedom and Social Exclusion:** As a broader view of poverty, the nature of the deprivation of the unemployed includes the loss of freedom as a result of joblessness. Unemployment can be a major causal factor predisposing people to social exclusion. The exclusion applies not only to economic opportunities, such as job-related insurance, and to pension and medical entitlements, but also to social activities, such as participation in the life of the community, which may be quite for jobless people.
- d. Psychological Harm and Misery:** Unemployment can play havoc with the lives of the jobless, and cause intense suffering and mental agony. Indeed, high unemployment is often associated even with elevated rates of suicide, which is an indicator of the perception of unbearability that the victims experience. The effect of prolonged joblessness can be especially damaging for morale. Youth unemployment can take a high toll, leading to a long-run loss of self-esteem of young workers and would-be workers. Youth unemployment has become a problem of increasing seriousness in developing countries, and the present pattern of Indian joblessness is quite heavily biased in

the direction of the young. According to Sen the connection with the emergence of a problem of social exclusion is obvious enough.

- e. **Ill-health and Mortality:** Unemployment can also lead to clinically identifiable illness and higher rates of mortality.
- f. **Loss of Human Relations:** Unemployment can be very disruptive to social relations and family life. It may also weaken the general harmony and coherence within the family. The consequences are related to the decline of self-confidence, but the loss of organized working life can also generate problems of its own. And thus within the immediate domain of social exclusion.
- g. **Motivational Loss and Future Work:** The discouragement that is induced by unemployment can lead to a weakening of motivations and can make the long-term unemployed very dejected and passive.
- h. **Gender and Racial Inequality:** Unemployment can also be a significant causal influence in heightening ethnic tensions as well as gender divisions.
- I. **Weakening of Social Values:** There is also evidence that large-scale unemployment tends to

weaken some social values. People in continued unemployment can develop cynicism about the fairness of social arrangements, and also a perception of dependence on others. In general, social cohesion faces many difficulties in a society that is firmly divided between a majority of people with comfortable jobs and a minority— a large minority— of unemployed, wretched, and aggrieved human beings.

Multi-Dimensional Approach

Therefore, exclusion has associated with some dimensions viz. economic, social and political dimensions and to demonstrate the multi-dimensionality of social exclusion. It can be stated here that the economic and social aspects of poverty along with the political aspects such as civil and political rights and citizenship outline a relationship between individuals and the State as well as between society and the individual.

a. Economic Dimensions: The economic approach to exclusion is concerned with the income and production and access to goods and services (commodity bundles) from which some people are excluded and others are not. They may be excluded from income and livelihood, from employment, and the labour market and from the satisfaction of such basic needs

as housing, health, and education.

‘The employment concept in terms of three aspects: income, production, and recognition. It was implicitly assumed that employment is a means of alleviating poverty. The economic approach to exclusion seems to cover main aspects of income and production. The aspect of recognition refers to the idea that employment gives a person the recognition of being engaged in something worth his while.’ (Sen 1975:5)

Thus, it may be stated here that the recognition aspect of employment can be interpreted as providing a social dimension to the concept of exclusion. However, the concepts of entitlements and capabilities are primarily economic concepts that can be extended to the study of social and other non-economic aspects of exclusion such as social norms and moral values.

b. Social Dimensions: Gore (1993) examines the concept of entitlements and extends it to a moral economy of provisioning in times of hunger and famine. He argues that socially enforced moral rules can constrain or expand entitlement to food and its distribution in conditions of famine. According to Sen’s concept of employment demonstrates that lack of employment not only denies income and output to those who are

excluded; it also fails to recognize their productive role as human beings in society. In other words, employment provides social legitimacy and social status as well as access to income. Gore has pointed out that access to the labour market entitles individuals to awards and economic rights which are prerequisites for full citizenship. It brings with it human dignity which should alleviate the harmful effects of exclusion on human beings and increase the scope for social integration. Other social dimensions to be considered participation in the decision-making of certain social groups as well as the marginalization of such disadvantaged categories as women and ethnic groups. In this regard, a fruitful study has shown “considerable gender and caste bias to access to education. For all educational levels, access to education for men and higher castes is noted to be much higher than for women and lower castes. This social phenomenon is explained by both economic and cultural factors” (Tilak 1987). Therefore, it can be indicated that there are main categories of the social aspects of exclusion are: i) access to social services such as health and education; ii) access to the labor market such as precariousness of employment as distinct from low pay; and iii) the opportunity for social participation and its effects on the social fabric such as greater crime,

juvenile delinquency, homelessness and so on which is relational aspects: relations among individuals as well as between citizens and the State.

c. Political Dimensions: Despite the economic and social aspects of dimensions another concept of social exclusion is that it also embraces the political dimension. That is, it concerns the denial of particular human and political rights to certain groups of the population. The UNDP (1992) notes the political rights are: personal security, rule of law, freedom of expression, political participation, and equality of opportunity. After all, democracy provides conditions suitable for the fulfillment of political rights and freedoms. Marshall (1964) these rights can be grouped into three main categories of citizenship rights: (i) civil, i.e., freedom of expression, rule of law, or right to justice; (ii) political, i.e., right to participate in the exercise of political power; and (iii) socio-economic, i.e., personal security, and equality of opportunity, right to minimum health care and unemployment benefits and so on. However, these three sets of rights may not be offered to all citizens. The political dimension of exclusion involves the notion that the State, which grants basic rights and civil liberties, is not a neutral agency but a vehicle of the dominant classes in

a society. It may, therefore, discriminate between insiders and outsiders and may exclude some social groups and include others.

Global Relevance of Social Exclusion

In Europe, specific innovative approaches to combat social exclusion are at the heart of new social policies which are no longer primarily based on the broad welfare policies of the 1980s. These new policies assign a key role to civil society because the mobilization and support of individual and group initiatives are crucial for reinforcing the social ties between the individual and society. Since the 1930s the phenomena of unemployment and poverty have become common to both developed and developing countries. In the contemporary period, India is experiencing growing social problems and high rates of long-term unemployment. Therefore, the world economy is changing rapidly, which calls for major structural changes in both developed and developing countries. Today, the two main worldwide phenomena are: (a) the emergence of a global economy involving increasing interdependence between the countries (b) acceleration of the process of democratization in most developing societies. Faria (1995) stated that “a plea for making exclusion a global concept on the assumption that the analytical

concepts and categories are universal even if their operationalization in specific social and cultural contexts may be different. The protagonists of this global approach to exclusion suggest that it helps in organizing different, loosely-connected notions such as poverty, the lack of access to goods and services and the absence of social and political rights into a general framework.”

Indicators of Social Exclusion

However, the following sets of indicators may give relevant information on the economic, social, and political aspects of exclusion.

I

On the economic aspect, the GNP per capita is not an adequate indicator for evaluating the exclusion of individuals or social groups. As Sen (1983) argues, inhabitants of Harlem are much richer, in terms of income per capita, than people from Bangladesh; but the chances of a black living in Harlem reaching the age of 40 is lower than that of a starving Bangladeshi. Thus, to estimate the economic aspects of exclusion it may be more appropriate to give greater weight to the depth of poverty and income inequality. The Sen (1976) index or the Foster, Greer, and Thorbecke (1984) index can be useful because they identify different degrees of poverty, and

the distribution of households according to different degrees of poverty. The Gini index or household income shares per decile are also attractive as indicators since they give information on the unevenness in the distribution of economic assets which is one of the salient features of exclusion. Individuals or groups at the bottom of an income pyramid are usually excluded from benefits of growth and access to education, health, and a decent livelihood, etc. Improvement in the well-being of the most disadvantaged groups is generally weakly correlated with growth performance in the absence of proactive state policies to overcome unequal income distribution. Large income inequalities and extreme poverty are major sources of exclusion not captured by an aggregate measure like GDP per capita.

II

On the social aspects, there are three types of indicators: (i) indicators of access to public goods and services (access to education and health can be evaluated through life expectancy at birth, infant mortality rate, adult literacy rate, or secondary school enrolment); (ii) indicators of access to the labour market and especially to the ‘good’ segment of the labour market (rate of unemployment and long-term unemployment, vulnerability or

precariousness of employment measured by some yardstick of insecurity and risk, e.g. rates of job turnover, proportion of second jobs, assessment of people working in the informal sector, household income trends); (iii) indicators of social participation (defined, in terms of rates of membership of trade unions, local associations engaged in activities designed to integrate marginalized groups into the mainstream of civil society) or of the declining social fabric or fragmentation of society (e.g. crime and delinquency rates). Anand and Sen (1993) have suggested, countries can be divided into different groups corresponding to different levels of development. In the low-income group, a set of basic indicators can be used focusing principally on distributional aspects, whereas in the high-income group more complex indicators (pertaining to relational aspects) can be considered for evaluating the breakdown of the social fabric of society (homelessness, crime rates, drug addiction, and so on).

III

The political aspects are concerned with the political freedom indexes. In 1992, UNDP estimated a Political Freedom Index (PFI) as well as Human Development Index (HDI) for the first time discussed the relationships between PFI and HDI.

A composite index of political freedom is based on its five ingredients, viz. personal security, and rule of law, freedom of expression, political participation, and equality of opportunity. UNDP data suggest a positive correlation between (a) the human development index and the political development index; and (b) income levels and political freedoms. In fact, there is an integration of both the Human Development Indicator (HDI) and the Political Freedom Index (PFI) in terms of economic, social, and political aspects of exclusion.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Social exclusion is a multi-dimensional concept and varied dimensions in which people are excluded can be- livelihood, security, employment, income, property, housing, health, education, skills, and cultural capital, citizenship and legal equality, democratic participation, public goods, family and sociability, humanity, respect, fulfillment and understanding (Silver, 1995). Sustainable Development Goals is an 'Agenda 2030', are envisaged to address the inequality and crippling conditions existing in the society that put certain social groups into disadvantage and margins. It is a commitment to create an egalitarian society. The SDGs may be enlisted as:

- Goal 1: End poverty in all its forms everywhere.
- Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.
- Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.
- Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning opportunities for all.
- Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls.
- Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation.
- Goal 7: Ensure access to affordable, sustainable, reliable, and modern energy for all.
- Goal 8: Promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all.
- Goal 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation.
- Goal 10: Reduce inequality within and among countries.
- Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable.
- Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns.
- Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts.
- Goal 14: Conserve and sustain the use of oceans, seas, and marine resources for sustainable development.
- Goal 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.

Factsheet: 1: Thengal Kacharis

The North East Region of India is a land of diverse people, each with its cultural tradition and nature-linked celebration. The Thengal-Kacharis is one of the many small ethnic communities belonging to the Indo-Mongoloid race with mythical ancestry. They are a clan of the Bodo-Kachari ethnic group. Thengal-Kacharis is one of the ancient inhabitants of Assam and they have rich cultural history. It is

one of the small ethnic communities of the State having a rich cultural history of its own. They are a scheduled tribe community of Assam. However, they are not shown as a separate scheduled tribe group in the scheduled tribe list of Assam by the government of India till date. The early ethnographic account of the group is not found in any of the literature of the region. The average economic conditions of the Thengal Kacharis are not good. Agriculture is the main occupation of the people. The wet cultivation of paddy is the primary agricultural practice. The farmers generally have their agricultural land but those who have no land have to depend on others' land to work. They pay the revenue of the land to the government periodically. The use of the modern method of cultivation by the farmers is less. There are also natural hazards as flood, drought, etc in Assam. The Thengal Kacharis are also facing the same problems. Besides, the paddy cultivation, the Thengal Kacharis engage themselves in the cultivation of the other cash crops like pumpkin, ladies finger, cabbage, chilly, *jika* (a kind of vegetable), potato, pot herbs, and vegetables, etc. Some community members also do the cultivation of the sugarcane, *mati mah* (a kind of pulse), etc. The trend of cultivating the cash crop is growing in Assam. The society of Thengal Kachari is

male-dominated. Women are morally not disrespected in society. In many cases, the role of the Thengal Kachari women is immense like the other society as a whole; they are the bearer of tradition. In all aspects of day-to-day life, the Thengal Kachari women play an important role in society, but the socio-economic position of the Thengal Kachari women is not satisfactory. In many spheres, the positions of women were lower than the men in the Thengal Kachari society. In fact, the Thengal Kachari was deprived of social, economic, political, educational, and religious in the Thengal Kachari society. As a whole, they were deprived of some personal independence. Of late the situation has changed in the present time due to enacted some measurements by the government.

During the field investigation, it is found that the Thengal Kachari has been deprived of many development schemes which are undertaken in the nearby areas by the government. The educational level of women is very low in which proves that formal education systems are not working properly. Most of the Thengal Kacharis don't know about the progress achieved through different development programs or schemes in the villages as well as no opportunity are offered to them. Despite the government and other agencies have not able to motivate the Thengal Kacharis

to come forward to receive education and training in which would help their future to attain a higher standard of living. The fruits of success in terms of growth and poverty reduction have not been able to reach the Thengal Kachoris. Therefore, malnutrition among the Thengal Kacharis has remained a critical issue of concern, besides this, access to health care is poorer among the Thengal Kachoris.

Factsheet-2: The Kaibratra

Based on the Varna system, caste is a concept indigenous to India. The caste system continues to determine the political, social, and economic life of the people in Hindu societies. Kaibratras (lower caste in Assam) are typically considered low and impure based on their birth and traditional occupation, thus they face multiple forms of discrimination, violence, and exclusion from the rest of society. The caste system, in its worst manifestation, is reflected in the form of 'untouchability'. The lower caste Kaibratras are considered untouchables. Though outlawed by the Constitution of India, practicing untouchability is still a stark reality in many parts of the country. In this regard, it may be mentioned here that a study conducted in 565 villages of 11 states in India by Shah, Mander, Thorat, Deshpande, and Baviskar, 2006, demonstrate that in 38% of government

schools Dalit children are made to sit separately while having mid-day meals and in 20%, they are not even permitted to drink water from the same source. About one-third of public health workers refused to visit Dalit homes and nearly half of them were denied access to common water sources.

Like Dalits, the Kaibratras continue to live in extreme poverty, without land or opportunities for better employment or education, but few people have benefited from India's policy of quotas in education and government jobs. The repercussion of caste-based social discrimination is visible in the economic condition of the Kaibratra. Like education, on inaccessibility or restricted to health services among the Kaibratras villages. Thus, other than denial to rights to livelihood, education, health, decent living, Kaibratras also face raging discrimination in social interactions and violence. One of the biggest challenges that one foresees in the inclusion of Kaibratra is the caste norms. In addition, internalization of caste- inferiority is often seen among the Kaibratras, which creates hurdles in making them raise their voice injustice and exploitation.

Recommendations

We can summarize the following locating challenges and interventions for ending poverty and inequalities for

socially excluded communities like Thengal Kacharis (Tribal), and Kaibratra (Scheduled Caste) of Assam in India in perspective of SDGs:

Locating challenges

Suggestive interventions

SDGs

Extreme poverty, malnutrition, inefficient Healthcare facilities, Educational backwardness, state apathy towards developmental needs of the socially excluded groups.

Institutional reforms and administrative advocacy, increasing efficacy of service delivery systems, health, education, Awareness of general and specific programmes, Mobilization of Socially excluded communities to stand for their rights.

End poverty in all its forms everywhere, End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture, Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, Ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning opportunities for all.

Conclusion

In social exclusion have economic, social, and political dimensions, particularly in the vast literature on poverty in developing

countries. In poor societies, the economic exclusion is at the heart of the problem of exclusion. Any claim in these societies to income has a greater relative weight than a claim to political and civil rights. In a properly functioning democratic system, citizens need to devote some time and energy to democratic system. When a large part of the population is struggling for survival, however, the democratic system may be more apparent than real, since it is likely to be controlled by vested interest groups. When people are excluded from the sources of income, their priority is survival and a basic livelihood. Such notions as exclusion, well-being, and welfare are society-specific and cannot be considered independently of the social and cultural norms. Finally, in focusing on the theoretical understanding of the concept, it has been shown that appropriate indicators to capture the various dimensions of social exclusion do not exist. Therefore, research should be undertaken to develop methodologies and indicators for the measurement of social exclusion, and national databases on social exclusion need to be established.

References

Anand, S., and A.K.Sen (1993): Human Development Index: Methodology and Measurement, UNDP Occasional paper No 8, New York: UNDP.

Bhalla, A and Lapeyre, F (1997): Social Exclusion: Towards an Analytical and Operational Framework” in Development and Change Vol.28, 413-433, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, UK.

Charles Gore, Jose, B. Figueiredo (eds), Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses, Geneva: ILO, Pp. 81-101

Faria, V (1994): ‘Social Exclusion in Latin America: An Annotated Bibliography. Discussion Paper No 70, Geneva: International Institute for Labour Studies.

Foster, J.,J. Greer and E. Thorbecke (1984): A Class of Decomposable Poverty Measure, *Econometrica* 53(3), Pp. 761-766

Gore. C (1993): Entitlement Relations and “Unruly” Social Practices: A Comment on the Work of Amartya Sen, *Journal of Development Studies* 29 (3), Pp. 429-460

Lipton, M and N, Maxwell (1992): The New Poverty Agenda: An Overview, IDS Discussion Paper No. 306. Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex.

Marshall, T.H (1964): *Class, Citizenship and Social Development*, New York: Doubleday.

Room, G (1995): Poverty in Europe: Competing Paradigms of Analysis, Policy and Politics 23(2), Pp.103-13.

Power, A and W.J, Wilson (2000): *Social Exclusion and the Future of Cities*, London: Centre for Analysis of Social Exclusion,

School of Economics.

Sen, A.K. (1975): *Employment, Technology and Development*, Oxford: Clarendon Press.

Sen, A.K. (1976): Poverty: An Ordinal Approach to Measurement, *Econometrica* 44(2), Pp. 219-31

Sen, A.K.(1983): Development: Which Way Now?, *Economic Journal*, 93 (372), Pp. 745-62

Sen, A.K (1997): *Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny*, ADB, Manila, Philippines.

Tilak, J.B.G (1987): *The Economics of Inequality in Education*, New Delhi: Sage Publications.

Townsend, P (1993): *The International Analysis of Poverty*, London: Harvester Wheatsheaf.

Tylor, Charles (1998): “The Dynamics of Democratic Exclusion”, *Journal of Democracy*, Vol.9 (4), Pp. 143-156

UNDP (1992): *Human Development Report 1992*, New York: Oxford University Press.

Wolf, Marshall (1995): “Globalization and Social Exclusion: Some Paradoxes” in Gerry Rodgers,

BL College Journal Vol-III, Issue-I, July 2021 Subscription : BDT 300/- [\$ 5 Outside Bangladesh]



Published by
Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna, Bangladesh